শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের

শ্রেষ্ঠ গল্প

বেঙ্গল পাবলিশার্স (প্রাঃ) লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

চতুর্থ মুদ্রণ : ডিসেম্বর, ১৯৬৫

প্রকাশক :
ময়ূখ বসু
বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাঃ লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

মুদ্রাকর :
ভোলানাথ পাল
তনুশ্রী প্রিন্টার্স
৮/১ই, বিডন রো
কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রচ্ছদ : প্রণবেশ মাইতি

সূচীপত্র

ভূমিকা

১

কথাসাহিত্য মানুষের অতি প্রাচীন সম্পদ। আর আমাদের ভারতভূমি এ সাহিত্যের অন্যতম আদি-জন্মস্থান। ভারতের প্রথম গল্প ঋগ্বেদে সংকলিত পুরুরবা ও উর্বশীর উপাখ্যান, এখন থেকে অন্তত সাড়ে তিন হাজার বছরের পুরোনো। তারপর বৌদ্ধজাতক, পঞ্চতন্ত্র, বৃহৎকথা ও তার পরবর্তী সংস্করণ কথাসরিৎসাগর, প্রাচীন ভারতে পালি, প্রাকৃত ও সংস্কৃত সাহিত্যের গৌরব। আমাদের মহাকাব্য দুখানি তো গল্পের বৃহদরণ্যবিশেষ। কাব্য পুরাণাদিতেও আখ্যান-উপাখ্যানের ছড়াছড়ি। পৃথিবীর প্রাচীন কথাসাহিত্যের ভাণ্ডারে ভারতের এই বিপুল সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে স্বভাবতই মনে পড়ে—প্রাচীন গ্রীস ও রোমের পৌরাণিক উপকথা, ঈশপের কথামালা এবং পশ্চিম এশিয়ার পারস্য ও আরব্য দেশের গল্প—বিশেষ ক'রে আরব্যোপন্যাসের মণিমাণিক্যখচিত একাধিক সহস্র-রজনীর কথা। মধ্যযুগে কথাসাহিত্যের বাজার মন্দা। কবিকল্পনাই তখন প্রধান হয়ে উঠেছে। গল্পের মাধ্যমে বক্তা ও শ্রোতায় মিলে যে সহিতত্ব (যা থেকে সাহিত্য-নামের অন্যতম সার্থকতা) তার স্থান নিয়েছে বাক্‌শিল্পে প্রতিভাশালী কলাকুশল ব্যক্তি-বিশেষের কবিকর্ম বা কাব্য। হয়তো প্রাচীন উপকথা বা আখ্যান-উপাখ্যান কিংবা পুরাণের গল্পগাথা নিয়েই সে কাব্য গড়ে উঠেছে, কিন্তু বিশুদ্ধ গল্পরসের চেয়ে তাতে প্রাধান্য পেয়েছে বাক্যরস। রসাত্মক বাক্যই তখনকার দিনে শ্রেষ্ঠ কাব্য। অর্থাৎ কবিত্বের উৎকর্ষেই তার উৎকর্ষ, গল্প সেখানে মুখ্য নয় গৌণ। আধুনিককালে আবার ফিরে এসেছে কথাসাহিত্যের যুগ। কিন্তু আধুনিক কথাসাহিত্য প্রাচীনের সগোত্র নয়। কথাসাহিত্যে এই আধুনিকতার যাত্রারম্ভ খ্রীষ্টিয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে। তার আগে য়ুরোপের পুনরভ্যুত্থান যুগে একটি মাত্র বিচ্ছিন্ন কিন্তু অতি-বিশিষ্ট উদাহরণ পাওয়া যায়। চিত্রশিল্পের দেশ ইটালীর কথাশিল্পী বোকাচ্চিও চতুর্দশ শতাব্দীতে তাঁর 'ডেকামেরনে'র গল্পমালায় রক্তমাংসের মানুষের দেহমানস-লীলাকে নিয়েই প্রথম গল্পচিত্র রচনা করেন। মহাকবি দান্তের দিব্যাবদানের পাশে মানুষ-নামধারী জীবের জৈবলীলার এই বিচিত্র সংকলন পুনরভ্যুদিত য়ুরোপে বিপুল আলোড়নের সৃষ্টি করে। আধুনিকতার বীজ প্রথম সেখানেই উপ্ত হয়। 'ডেকামেরনে'র পর অর্ধ-সহস্রাব্দী অতিক্রান্ত হয়ে এল খ্রীষ্টিয় উনবিংশ শতাব্দী—যাকে গল্প-উপন্যাসের নব স্বর্ণযুগ বলা যেতে পারে। ইংলণ্ডে স্কট, ডিকেন্স, থ্যাকারে, জর্জ এলিয়ট, হার্ডি; ফ্রান্সে বালজাক, ভিক্টর হ্যুগো, ডুমা, জোলা, আনাতোল ফ্রাঁস এবং মোপাসাঁ; পূর্ব-য়ুরোপে গোগোল টুর্গেনিভ ডস্টয়েভ্স্কি, টলস্টয়, শেখভ;—উনবিংশ শতাব্দী আধুনিক কথাসাহিত্যের বসন্ত ঋতু। পূর্বেই বলেছি, এ সাহিত্য প্রাচীনের সগোত্র নয়। প্রাচীন যুগে গল্পরসই ছিল প্রধান; জীবনের ওপর তার প্রভাব ছিল তির্যক। গল্প যখন গল্পমাত্র না হয়ে জীবন-ভাষ্য হয়ে উঠেছে, তখন হিতকথাকে মনোহারী ক'রে বলার জন্যে কুখ্যাত উদাহরণ

হিসাবেই তার অবতারণা। মধ্যযুগের মানুষের প্রধান আবিষ্কার তার মধুস্বাদী ভাষাশিল্প। ফলে তার সাহিত্যসৃষ্টিতে কাব্যরসই হ'ল প্রধান। জৈবসত্যকে কবি-কল্পনার সৌন্দর্য-লোকে প্রতিবিম্বিত ক'রে সে আবিষ্কার করল জীবনের সুধাস্নাত রূপ। তার স্বাদ ব্রহ্মস্বাদ-সহোদর। আধুনিক সাহিত্যে গল্পরস বা কাব্যরস মুখ্য নয়, এ সাহিত্য প্রত্যক্ষ জীবনেরই রসে পরিপুষ্ট। এতে আছে চলিষ্ণু জীবনের তপ্তস্বাদ। প্রত্যহের কুশাঙ্কুরবিদ্ধ জীবলীলাই এর উপজীব্য। বর্তমান-কালের গন্ডীতে অতিপরিচিত পরিবেশের মধ্যে সামাজিক অর্থে জীবন্ত হয়ে ওঠাই এর প্রধান ধর্ম। ফলে এ সাহিত্যে প্রত্যক্ষ বাস্তবতারই জয়গান। উনবিংশ শতাব্দীতে তবু স্বপ্নের রেশটুকু অবশিষ্ট ছিল। কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে জীবনের খরপ্রবাহমুখে স্বপ্নাবিষ্ট হবার অবকাশটুকুও যেন নিঃশেষিত হয়েছে।

আমাদের দেশে এই নতুন কথাসাহিত্যের আমদানি য়ুরোপ থেকে। আধুনিক বাংলা গল্প-উপন্যাসে এই বাস্তবধর্মী জীবনালেখ্য-রচনারীতিই মুখ্য হয়ে উঠেছে। এবং প্রাচীন কথাসাহিত্যে ভারতবর্ষের যেমন একটি গৌরবময় আসন ছিল, এই নবতন্ত্রের আধুনিক কথাসাহিত্যেও—বিশেষ ক'রে আধুনিক ছোটগল্পে বাংলার কথাসাহিত্যিকগণ পৃথিবীর যে-কোন দেশের অগ্রগণ্য সাহিত্যিক গোষ্ঠীর সমান মর্যাদা দাবি করতে পারেন। বাংলাদেশ গীতিকবিতার জন্মভূমি। জয়দেব থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বাংলার সারস্বত সাধনা মুখ্যত সংগীতময় কাব্যে বাণীমূর্তি লাভ করেছে। এই গীতিকবিতা দেশের পুনরভ্যুদিত সৃজনী-প্রতিভা ছোটগল্পের মধ্যে আত্মপ্রকাশের এক বিচিত্র পন্থা আবিষ্কার করেছে। রবীন্দ্রনাথের পরেই আধুনিক বাংলা ছোটগল্প ভারত-সাহিত্যের নতুন সম্পদ। আর এই নতুন সম্পদ-সৃষ্টি একক ব্যক্তিসাধনায় সম্ভব হয়নি, হয়েছে অনেকের সাধনা পুঞ্জীভূত হয়ে। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় এই অনেকের মধ্যে একজন। অনেকের মধ্যে একজন হ'লেও তাঁর পরিচয় দশজনের ভিড়ে হারিয়ে যাবার মত নয়। বরং একদিক দিয়ে তিনি এ যুগের গল্প-সাহিত্যে একেবারেই অনন্য-পরতন্ত্র এবং সেখানেই তাঁর বিশিষ্টতা। শরদিন্দুবাবু মুখ্যত কবি, রহস্যরসিক কবি। ফলে তাঁর গল্পগুলিতে জীবনের স্বাদ যেমন পাওয়া যায়, তেমনি পাওয়া যায় উৎকৃষ্ট কাব্যের রস। এদিক দিয়ে তিনি এ যুগে বোধহয় একলাই সংস্কৃত সাহিত্যের ঐতিহ্যকে রক্ষা ক'রে চলেছেন। কথাটা আর একটু স্পষ্ট করা প্রয়োজন। আধুনিক কথাসাহিত্য প্রত্যক্ষ বাস্তবের উপর প্রতিষ্ঠিত। এ যুগের সাহিত্যদৃষ্টি সোজাসুজি জীবনের উপর প্রতিফলিত হয়ে সৌরকিরণের মত সাদা আলোয় তার সত্য রূপকে উদ্‌ঘাটিত ক'রে তুলেছে। শরদিন্দুবাবুও জীবনের ওপর আলোকপাত করেছেন। কিন্তু তাঁর দৃষ্টির আলো কবিকল্পনার চন্দ্রলোকে প্রতিবিম্বিত হয়ে মর্ত্যলোকে কৌমুদীরাগ বিস্তার করেছে। ফলে জীবনসত্য হয়ে উঠেছে কাব্য-সুন্দর। একে আধুনিক দৃষ্টিতে রোম্যান্টিক স্বপ্নাবিষ্টতা ব'লে অবজ্ঞা করা সহজ। কিন্তু জীবনস্বপ্ন যেখানে রুগ্ন বিলাসিতামাত্রই নয়, পরিকল্পনা যেখানে প্রত্যক্ষ-বর্তমানের অতি ক্ষুদ্র কালের গন্ডীকে অতিক্রম ক'রে অতীতের বিস্মরণীর তীরে-তীরে নরনারীর চিরন্তন জীবনরহস্য সন্ধানে তৎপর, সেখানে অব্যভিচারী কবিস্বপ্ন চিরকালই রসিকসমাজের সমাদর লাভ করেছে। এ যুগের বাস্তবতার হাটে তার যে মূল্যই নিরূপিত হোক না কেন, সহৃদয়ের অন্তরে তার আকর্ষণ কোনদিনই ক্ষুন্ন

হবার নয়। বরং সাহিত্যের আঙিনায় যখন ফ্রয়েড ও মার্কসের দৌরাত্ম্য মারাত্মক হয়ে ওঠে, অসুস্থ যৌনবিকার এবং শ্রেণী-সংঘাতের উগ্রচেতনায় সাহিত্যের পরিবেশ কলুষিক ও ভারাক্রান্ত হয়, তখন অসংখ্য সমস্যাভারে জর্জরিত পাঠকের শ্রান্ত ক্লান্ত মন রোমান্সের স্বপ্নস্বর্গে একটু শান্তি পাবার আশায় আকুল হয়ে ওঠে। মানুষের এই স্বপ্নসাধকে তার পলায়নী মনোবৃত্তির পরিচায়ক ব'লে ভৎসনা করা সহজ হ'লেও এই স্বপ্নই জীবনকে সুস্থ ও বলিষ্ঠ ক'রে রাখতে পারে। শরদিন্দুবাবু আধুনিক বাংলা সাহিত্যের এই স্বাস্থ্যময় রোমান্সের-রসকে অক্ষুণ্ণ রেখে পাঠক-মহলের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হয়েছেন।

বস্তুত আধুনিক যুগে যখন সামাজিক জীবন ব্যক্তিমানসকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে অনুক্ষণ বন্দী ক'রে রেখেছে, তখন এই প্রত্যক্ষ বাস্তবতার বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া শক্তিমত্তারই পরিচায়ক। বরং এ যুগে বাস্তবতার ভক্ত হওয়া মোটেই শক্ত নয়, কিন্তু বর্তমানের রাহুগ্রাস থেকে শিল্পমানসকে মুক্তি দিয়ে তার আলোকে আবহমান কালের জীবন প্রবাহকে আলোকিত করা খুবই দুঃসাধ্য কাজ। শরদিন্দুবাবুর কবিকল্পনাই এ ক্ষেত্রে তাঁর শিল্পের মুক্তি ঘটিয়েছে। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে আরম্ভ ক'রে ইতিহাসের ধাপে-ধাপে আধুনিক কাল পর্যন্ত মানব-ভাগ্যাকাশে তিনি অবাধে সঞ্চরণ ক'রে ফিরেছেন! দূর ও দুর্জ্ঞেয়ের প্রতি রহস্যময় আকর্ষণই এ পরিক্রমায় তাঁর সঙ্গী হয়েছে, কিন্তু তাঁর যাত্রাপথ আলোকিত করেছে তাঁর ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি। এদিক দিয়ে তিনি প্রাচীন ও মধ্যযুগের কবিদের মত একেবারে নিরঙ্কুশ হতে চান নি। তখনকার দিনের কবিরা তাঁদের কাব্যনাটকের উপজীব্য হিসেবে গল্প বাছাই করার বেলা সত্যাসত্য বিচারের প্রয়োজন বোধ করেন নি, গ্রাম্যকথাকোবিদের কণ্ঠোচ্চারিত রূপকথা থেকে পৌরাণিক উপাখ্যান পর্যন্ত অনায়াসেই গ্রহণ করেছেন, তা সে উদয়ন-বাসবদত্তার কিংবা বিক্রমোর্বশীর গল্পই হোক, অথবা অভিজ্ঞান-শকুন্তল কিংবা কাদম্বরী-মহাশ্বেতা-চন্দ্রাপীড়ের কাহিনীই হোক। ক্বচিৎ কখনো হয়তো ইতিহাসের পঞ্জরাস্থি থেকে মুদ্রারাক্ষস কিংবা সমাজ-জীবনের প্রত্যন্ত প্রদেশ থেকে মৃচ্ছকটিকের গল্প আমদানি হয়েছে, কিন্তু সেগুলো নিতান্তই নিয়মের ব্যতিক্রম। শরদিন্দুবাবু কিন্তু ইতিহাসকে সাক্ষী রেখেই গল্পের সত্যাসত্য যাচাই ক'রে নিয়েছেন। ফলে তাঁর রচনা নিতান্তই গালগল্প হয় নি, মানবের জীবনেতিহাসও হয়ে উঠেছে। তাঁর রচনা সাহিত্যিক অর্থে সত্য এবং ঐতিহাসিক অর্থে বাস্তব। এজন্যেই তিনি রোমান্স-রসিক হয়েও রূপকথার লেখক নন, ছোটগল্পের পরিবেশক।

উদাহরণ হিসেবে বর্তমান সংকলনের সর্বশেষ গল্প 'অমিতাভের' উল্লেখ করা যেতে পারে। কালানুক্রমিক বিচারে 'অমিতাভ' শরদিন্দুবাবুর সর্বপ্রথম গল্প-সংকলন 'জাতিস্মরে'র প্রথমতম গল্প। সামান্য একটুখানি পৌরাণিক কিংবদন্তীই এ গল্পের ভিত্তি। কিন্তু অতীত ইতিহাসের মধ্যে মহত্তম মানব সত্যের সন্ধানে তাঁর কল্পনা এখানে জীবনের গভীরতম রহস্যোন্মেষী কবিদৃষ্টি লাভ করেছে। পৃথিবীতে খ্রীষ্টাবির্ভাবেরও বহুপূর্বে যে মহামানব ভারতভূমিতে পদার্পণ ক'রে তাঁর দিব্য-নয়নের অমৃতবর্ষী আলোকে হিংসা-জিঘাংসা-কলুষিত মানবজীবনকে নবমহিমায় উদ্ভাসিত ক'রে তুলেছিলেন তাঁরই জীবন সত্যের কাব্যরূপ এই গল্পটি। ঐতিহাসিক ভারতের অতীত মহিমার এক অপূর্ব শিল্পরূপায়ণ। এ গল্পে তথাগত বুদ্ধের

মৈত্রী-করুণা প্রেমোচ্ছলিত নয়নের ক্ষেমংকর দৃষ্টিপাতে শুধু দুর্ধর্ষ নিষ্করুণ অসুরপ্রকৃতি দিঙ্‌নাগ এবং শ্রেণিনায়ক কুমারদত্তেরই জীবনের আমূল পরিবর্তন হয়নি, সঙ্গে সঙ্গে পাঠকমনেও সার্ধদ্বিসহস্রবৎসর পূর্বেই সেই মহাবির্ভাব প্রত্যক্ষবৎ হয়ে উঠেছে। রোমান্সের স্বপ্ন-প্রদীপ এখানে শিবসুন্দরের তৃতীয় নয়নের জ্যোতিঃ-সংগমে জীবনসত্যের ওপর অমিতাভ দীপ্তি বিচ্ছুরিত করেছে।

২

যারা শরদিন্দুবাবুর 'ব্যোমকেশের গল্প' 'ব্যোমকেশের কাহিনী' এবং 'ব্যোমকেশের ডায়েরি'র সঙ্গে সমধিক পরিচিত, তাঁরা হয়তো ডিটেকটিভ গল্পের লেখক ব'লে তাঁর ব্যাজস্তুতি করে থাকেন। বস্তুত আমাদের সাহিত্যে গোয়েন্দা-কাহিনীগুলো খুবই নিকৃষ্ট পর্যায়ের। সাহিত্যিক মূল্য তাদের নেই বললেই চলে, কোনোপ্রকারে রোমাঞ্চকর হয়ে ওঠাতেই সেগুলোর চরম সার্থকতা। কিন্তু গত 'একশ' বছরের মধ্যে পাশ্চাত্য দেশসমূহে গোয়েন্দাগল্পের বিস্ময়কর উন্নতি পরিলক্ষিত হয়েছে; এবং মনস্তত্ত্ব, প্রকৃতি-বিজ্ঞান ও সমাজ-বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নিত্যনূতন আর নব-নব সম্ভাবনার দ্বারও উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে। গোয়েন্দা-গল্পের লেখক হিসেবে প্রথমেই মনে পড়ে মার্কিন কথা-সাহিত্যিক এডগার এলান পো'র কথা। গত শতাব্দীর প্রথমার্ধে তিনিই প্রথম এ শ্রেণীর গল্পকে অন্ত্যজ-দশা থেকে উদ্ধার করেন। মাত্র চল্লিশ বৎসর বয়সে লোকান্তরিত না হলে তাঁর হাতে সাহিত্যের এ দিক্‌টা আরো অনেকদূর এগিয়ে যেতে পারত। পো-র পরে বিখ্যাত ইংরেজ লেখক আর্থার কনান ডয়েলই পাশ্চাত্ত্য দেশের গোয়েন্দা-গল্পের পাঠকগণকে মন্ত্র-মুগ্ধ করে রেখেছিলেন। তাঁর প্রধান বৈশিষ্ট্য তাঁর গোয়েন্দানায়ক শার্লক্ হোম্‌সের ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র-সৃষ্টিতে। সার্ আর্থারের পরে শার্লকের কত অনুকরণই না সারা য়ুরোপে হয়েছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনো গোয়েন্দা-চরিত্রই শার্লকের সর্বচিত্তজয়ী ব্যক্তিত্বকে অতিক্রম ক'রে যেতে পারেনি। যুদ্ধোত্তর ইংরেজি সাহিত্যে অবশ্য গোয়েন্দা-গল্প সাহিত্যের মর্যাদায় আরো অনেকদূর উন্নীত হয়েছে, এবং এ যুগে শ্রীমতী আগাথা ক্রিষ্টির নামই সর্বাধিক পরিচিত। আজকাল এ সাহিত্যকে অন্ত্যজ ব'লে অবজ্ঞা করার মত মনোভাব পাঠকসমাজ থেকে ক্রমশ তিরোহিত হয়ে যাচ্ছে। এবং অসুস্থ যৌনবিকারের গল্পপাঠে ক্লান্ত সাধারণ পাঠকমহলের কাছে এর আকর্ষণ দুর্বার হয়ে উঠেছে। উৎকৃষ্ট গোয়েন্দা-গল্পের পাঠকগণকে বলাই বাহুল্য যে, লোমহর্ষক হত্যাকাণ্ড কিংবা চাঞ্চল্যকর ডাকাতির চমকপ্রদ বর্ণনাতেই গোয়েন্দাগল্প পর্যবসিত নয়। একটি মারাত্মক অপরাধকে কেন্দ্র করেই অবশ্য গল্পটি গড়ে ওঠে, কিন্তু কোন্ পরিস্থিতি ও পরিবেশে সে অপরাধ অনুষ্ঠিত হয়েছে, অপরাধী কি উপায় অবলম্বন করে তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করেছে এবং এই মারাত্মক ক্রিয়া সম্পাদনের পশ্চাতে তার কি নিগূঢ় উদ্দেশ্য নিহিত আছে, একটি ছিন্নসূত্র ও আপাত-বিভ্রান্তিকর ঘটনারাজি অবলম্বন করে সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক উপায়ে তার কার্য-কারণ-সম্পর্কের রহস্য উন্মোচনই শ্রেষ্ঠ গোয়েন্দা গল্পের উপজীব্য। প্রকৃতি বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে মানুষের হাতে এসেছে নতুন নতুন নরঘাতী অস্ত্র, মানুষের অপরাধ-প্রবণতা ব্যক্তিগত সার্থসিদ্ধির জন্যে সেসব অস্ত্রকে প্রতিনিয়ত কাজে লাগাচ্ছে; মানুষের মনে শয়তানের অধিকার দিনদিন ব্যাপকতর হয়ে জটিল ও দুর্বোধ্য করে

তুলেছে তার আচার আচরণকে। আদালতে কার্যকারণের সূত্র-সন্ধানই হয়ে থাকে, অপরাধ-বিজ্ঞান মনস্তত্ত্বকে নিয়েই মাথা ঘামায়, কিন্তু সাহিত্যিক নিয়তিনিয়মবদ্ধ মানুষের জীবন-রহস্যকে সঙ্গে সঙ্গে উদ্ভাসিত করেন। এবং এখানেই উচ্চশ্রেণীর গোয়েন্দাগল্পের সাহিত্যিক সার্থকতা।

শরদিন্দুবাবুর রহস্যরসিক মনই তাঁকে ব্যোমকেশের গল্প, কাহিনী ও ডায়েরী রচনায় প্রেরণা জুগিয়েছে। গল্প সাজানোর ক্ষমতা তাঁর অসাধারণ, জটপাকানো সূত্রের গ্রন্থিমোচনে তিনি সুদক্ষ, তদুপরি তাঁর হাতে আছে সাহিত্যিকের কলম ;—একথা কুণ্ঠাহীন ভাবেই বলা যায় যে, শরদিন্দুবাবু বাংলার গোয়েন্দা-কাহিনীকে অন্ত্যজ দশা থেকে মুক্ত করে আমাদের সাহিত্যের দীনতা দূর করেছেন। বর্তমান সংকলনে তাঁর দুটি গোয়েন্দা গল্প স্থান পেয়েছে ;—'মাকড়সার রস' আর 'অগ্নিবাণ'। লেখক শুধু অপরাধমূলক কাহিনীর গ্রন্থিমোচনের দিকেই পাঠকের কৌতূহল উদ্রিক্ত ক'রে রাখেন নি, সঙ্গে সঙ্গে অপরাধী মানুষের শোকাবহ পরিণামের দিকেও তার দৃষ্টি আকৃষ্ট করেছেন। 'অগ্নিবাণ' গল্পটিতে আধুনিক যুগের শয়তানী লীলা অধিকতর ব্যাপক, বাস্তব ও জীবন্ত। এ গল্পের ভিলেন (এবং ভিলেনরাই গোয়েন্দা-গল্পের নায়ক হয়ে থাকে) দেবকুমারবাবু একজন প্রতিভাশালী বৈজ্ঞানিক। অপ্রত্যাশিতভাবে তিনি এক মরণাস্ত্র আবিষ্কার করেছিলেন। কিন্তু এমনি অদৃষ্টের খেলা, শত্রুর বিরুদ্ধে প্রযুক্ত অগ্নিবাণ দু'বারই লাগল গিয়ে তাঁর প্রাণাধিক প্রিয় পুত্রকন্যার বুকে। এ কাহিনী শুধু দেবকুমারের ব্যক্তিজীবনের ট্রাজেডিকেই উদ্ঘাটিত করছে না, মানবজীবনের একটি সাধারণ নিয়তির প্রতিও ইঙ্গিত করেছে। গল্পশেষে ব্যোমকেশ বলছে, "মানুষ যেদিন প্রথম অন্যকে হত্যা করবার অস্ত্র আবিষ্কার করেছিল, সেদিন সে নিজেরই মৃত্যুবাণ নির্মাণ করেছিল, আজ সারা পৃথিবী জুড়ে গোপনে গোপনে এই যে হিংসার কুটিল বিষ তৈরী হচ্ছে এও মানুষ জাতটাকে একদিন নিঃশেষে ধ্বংস ক'রে ফেলবে—ব্রহ্মার ধ্যান-উদ্ভূত দৈত্যের মত সে স্রষ্টাকেও রেয়াৎ করবে না।" এ দার্শনিক কল্পনা গল্পের প্রক্ষিপ্ত অংশ নয়। দেবকুমারের ব্যক্তি-জীবনের অপরাধ সর্বসাধারণের অপরাধ-প্রবণতার অনিবার্য পরিণামের ইঙ্গিত ক'রে যেন মানবমাত্রেরই জীবন-রহস্যের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েছে, এবং এখানেই এর সাহিত্যায়ম সার্থক।

গোয়েন্দা গল্পের মত শরদিন্দুবাবু ভূতের গল্প রচনায়ও সিদ্ধহস্ত। ভূতের ভয় মানুষের সংস্কারগ্রস্ত মনকে আদিম যুগ থেকে অধিকার ক'রে আছে। ভয় যেমন প্রবল, আকর্ষণও তেমনি দুর্বার। কিন্তু ভৌতিক রহস্য চিরদিনই অন্ধকারে আবৃত। এ যুগের মানুষের বৈজ্ঞানিক কৌতূহল এই অন্ধকারকে আলোকিত করবার জন্যে অলৌকিক লোকেও তার বুদ্ধির আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করছে। ভৌতিক রহস্যলোকে কবিকল্পনা চিরকালই প্রসারিত হয়েছে। আমাদের ত্রৈলোক্য মুখুজ্জের ভূতুড়ে গল্প থেকে পরশুরামের 'ভুশণ্ডীর মাঠে'র রসিকতা পর্যন্ত বিচিত্র রসের অনেক ভৌতিক কাহিনী লিখিত হয়েছে। শরদিন্দুবাবুর ভূতের গল্পে ভয়ের চেয়ে বিস্ময়ের উপাদানই বেশি। ফলে সেগুলোতে ভয়ানক-রসের চেয়ে অদ্ভুত-রসেরই পরিবেশন। শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত বলেছিল, "মৃত্যুর পরপারের ইতিহাসটা যদি কোন উপায়ে শুনিয়া লইতে পারা যায়, তবে তার চেয়ে লাভ আর কি আছে? তা সে যে-ই বলুক এবং

যেমন করিয়াই বলুক না।" শরদিন্দুবাবু জন্মজন্মান্তরের জীবনধারাকে সাহিত্যে গ্রথিত ক'রে রেখেছেন। মৃত্যু এবং পুনর্জন্মের মধ্যেকার তমসাবৃত জীবনরহস্য স্বভাবতই তাঁকে আকর্ষণ করেছে। এখানেই তাঁর ভূতের গল্পের উৎপত্তি। 'বহুরূপী' গল্পে তিনি ভূতের মুখেই ভৌতিক কাহিনী বর্ণনা করেছেন।

৩

কিন্তু 'এহ বাহ্য'। শরদিন্দুবাবুর সাহিত্যধর্মের স্বরূপ নির্ণয়ের চেষ্টা এখনো অসমাপ্ত রয়েছে। তাঁর সাহিত্যকে মহৎ অর্থে রোমান্টিক বলতে আপত্তি নেই, কিন্তু যে রোমান্টিক দৃষ্টি তুচ্ছতার মধ্যেও অসামান্যের সন্ধান পায় সে দৃষ্টি তাঁর নয়। তাঁর কল্পনা সুদূরাভিসারী, তাঁর রোমান্টিকতা অতীতাশ্রয়ী, তাঁর প্রতিভা জাতিস্মর। ইতিহাসের কোন্ বিস্মৃত ধ্বংসস্তূপের মধ্যে হয়তো প'ড়ে আছে একটা মৃৎপ্রদীপ। লেখক তাকে সযত্নে কুড়িয়ে এনে স্বপ্নের গোধূলিলগ্নে তাঁর নির্জন ঘরে মধুমিশ্রিত গব্যঘৃত দিয়ে জ্বেলে দিলেন সেই দীপশিখা। আর অমনি তার আলোকে উজ্জ্বল হয়ে উঠল দূর-দূরান্তের বিস্মৃত অতীতের ইতিকথা। শুধু তাই নয়, তাঁর দৃষ্টিতে অতীত-বর্তমান এক অবিচ্ছেদ্য সূত্রে গ্রথিত। বিংশ শতাব্দীর কলিকাতার বুকে কসাইয়ের দোকানে গোমাংস বিক্রেতা গোলাম কাদের কর্তৃক গোয়া নগরের পর্তুগীজ ফিরিঙ্গীর হত্যালীলাকে তিনি অনায়াসে কয়েক শতাব্দী পূর্বের কালিকট বন্দরের মূর-বণিক মির্জা দাউদ ও পর্তুগীজ জলদস্যু ভাস্কো-ডা-গামার প্রতিহিংসালীলার সঙ্গে জড়িত করে দিতে পারেন। ছিয়াত্তর টাকা বেতনের এন্ট্রান্স-পাস কলম-পেষা রেলের কেরানির জীবন গ্রথিত হয়ে যায় যুগ-যুগান্তরের জন্ম-জন্মান্তরের কত বিচিত্র কাহিনীর সঙ্গে। ভেসে আসে প্রাগৈতিহাসিক অন্ধকার, আসে অতীত ইতিহাসের আলোকোজ্জ্বল দিন-রাত্রিগুলো, আসে শূরসেন, মগধ, লিচ্ছবি, কৌশল, পৌণ্ড্রবর্ধন, প্রাগ্জ্যোতিষপুর, বৈশালী, উজ্জয়িনী, পাটলিপুত্র—কত রাজ্য, কত রাজধানী! মহাকালের অনিরুদ্ধ স্রোতঃপথে চিরন্তন যাত্রীর মত ভেসে চলেছে মানুষ; শরদিন্দুবাবু মানুষের সেই চিরন্তন যাত্রার কাহিনীকার। মানুষ কি ছিল, আর কালে-কালে বিবর্তিত পরিবর্তিত হয়ে আজ কি হয়েছে, তার গল্পমালায় সে সত্যও ধরা পড়েছে। তাঁর গল্পের জাতিস্মর বক্তা বলছে, "মনে হয় যেন, তখন মানুষ বেশি নিষ্ঠুর ছিল, জীবনের বড় একটা মূল্য ছিল না। অতি তুচ্ছ কারণে একজন আরেকজনকে হত্যা করিত এবং সেই জন্যই বোধ করি মানুষের প্রাণের ভয়ও কম ছিল। আর মানুষের মধ্যে ক্রূরতা, চাতুরী, কুটিলতা ছিল বটে, কিন্তু ক্ষুদ্রতা ছিল না। একালের মানুষ যেন সবদিক দিয়াই ছোট হইয়া গিয়াছে। দেহের, মনের, হৃদয়-ধর্মের সে প্রসার আর নাই। যেন মানুষ তখন তরুণ ছিল, এখন বৃদ্ধ হইয়া গিয়াছে।" জীববিজ্ঞানীরা এ কথা মেনে নেবেন কি না সে প্রশ্ন অবান্তর, নৃতত্ত্ববিদ্যার বিশ্লেষণে এ সত্য ধরা পড়েছে কি না সে কথা জানারও কোনো প্রয়োজন নেই। শরদিন্দুবাবুর দৃষ্টিতে জীবনের এই রূপই ধরা পড়েছে এবং তাঁর সৃষ্টির সঙ্গে পরিচিত হ'লে মানব ইতিহাসের এই সত্য সম্বন্ধে পাঠকের মনে সংশয়ের আর লেশমাত্রও অবকাশ থাকে না। জীবন সম্বন্ধে এই কবি-প্রতীতি তিনি পাঠকের মনে সঞ্চারিত ক'রে দিতে পেরেছেন। আসলে, জাতিস্মরের ভাষায়, মানুষ যখন তরুণ ছিল, জগৎ তার কাছে ছিল খেলার মাঠ, যুদ্ধ একটা সরস কৌতুক, প্রেম একটা মাদক উত্তেজনা; শরদিন্দুবাবু সেই তরুণ

মানুষের সুস্থ বলিষ্ঠ মন নিয়েই বিংশ শতাব্দীতে আবির্ভূত হয়েছেন। তাঁর সাহিত্যে আছে পূর্ণ যৌবনের চিরতারুণ্যের দৃষ্টি। জীবন-সম্ভোগের কবি তিনি। প্রেমে হিংসায়, অনুরাগে ঘৃণায়, দুর্দমনীয় হৃদয়াবেগের রসে অভিসিঞ্চিত তাঁর সাহিত্য। দুর্নিবার আবেগে আকাঙ্ক্ষা যখন উদ্দাম, তখন সম্মুখের সমস্ত দুর্লঙ্ঘ্য বাধা ও ব্যবধান অতিক্রম ক'রে বাসনা চরিতার্থ করার যে আনন্দ, অমৃত পান করতে গিয়ে হলাহলের পাত্র মুখে তুলে ধ'রে যে পরিতৃপ্তি, বীরভোগ্য জীবনের আস্বাদন লাভের জন্য অবলীলাভরে মৃত্যুবরণে যে জিজীবিষা, ভাগ্যকে জয় করতে গিয়ে অনিবার্য নিয়তির অমোঘ বিধানের হাতে আত্মসমর্পণের যে মর্মান্তিক আত্মাভিমান, শরদিন্দুবাবুর সাহিত্যে মানুষের সেই যৌবনলীলা, সেই প্রাণোচ্ছলতার কথাই উজ্জ্বল হয়ে আছে।

আর এই প্রাণবন্ত যৌবনলীলার কেন্দ্রভূমিতে আছে নরনারীর চিরপুরাতন বিরহ-মিলন-কথা। মিথুনলীলার শিল্পে তিনি, রতিই তাঁর গল্পের স্থায়ীভাব। তাঁর বেশির ভাগ গল্পেরই মূলে আছে প্রেম। আর সে প্রেম জীবের নিয়তিই হোক, কিংবা মীনকেতুর উপাদেয় কৌতুকমাত্রই হোক, তাঁর দৃষ্টিতে মানুষের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণে তার স্থান সর্বাগ্রে। তাই চিত্র পরিবেশে, বিচিত্র রূপে ও স্বাদে প্রেমই তার গল্পের মুখ্য উপজীব্য। সে প্রেম কখনো এসেছে মৃত্যুর অগ্রদূতী হয়ে বিষকন্যা'র রূপ ধ'রে; জীবনকে করে তুলেছে সুধাবিষজর্জর। কখনো তার আবির্ভাব দেহের মধ্যে নিষ্পাপ কৌতুহলের ছদ্মবেশে; 'কালকূটে'র তীব্র জ্বালায় জীবনকে বিষাক্ত ক'রে দিয়ে গেছে; কখনো আবার একটি 'গোপন কথা'ই আনন্দ-কণিকা হয়ে মর্মমঞ্জুষার মহার্ঘ সম্পদ হয়ে রয়েছে; কখনো 'উল্কার আলো'য় চোখ ধাঁধিয়ে অনুরাগের প্রকাশকেও দিয়েছে বিদ্বেষের রূপ। এই প্রেমের স্পর্শে কখনো হৃদয়-সমুদ্র মন্থন ক'রে উঠেছে স্মরগরল; কখনো অমৃতসঞ্জীবনী। যুগে যুগে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে তার রূপ; তার প্রকাশ; তার আস্বাদন যে কত বিচিত্র, সেই কথাই সুব্যক্ত হয়েছে শরদিন্দুবাবুর সাহিত্যে। এক কথায় প্রেমায়ণই তাঁর দৃষ্টিতে জীবনায়ন। এবং এই জন্যেই সংস্কৃত সাহিত্যের মত, তাঁর সাহিত্যেও আদিরসই উজ্জ্বলতম রস।

তাঁর যাত্রারম্ভ একেবারে প্রাগৈতিহাসিক যুগে। যখন পুরুষ নারীর জন্যে যুদ্ধ করত, হিংস্র শ্বাপদের মত নারীর অধিকার নিয়ে করত পরস্পরের মধ্যে লড়াই। বীযশুল্কা বীরভোগ্যা নারীও ছিল অহির মত তীব্র দুর্জ্ঞেয়। আরণ্য অশ্বিনীর মতই তাকে বশ করতে হ'ত। 'প্রাগ্‌জ্যোতিষ' গল্পটিতে সেই আদিম যুগের 'অরুগ্ন বলিষ্ঠ হিংস্র নগ্ন বর্বরতা'ই প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু সেখানেও আছে মীনকেতুর কৌতুক আর তাকে আশ্রয় ক'রে নিয়তির রহস্যময় পরিহাস। 'সেতু' গল্পের পটভূমি প্রাচীন ভারতের বিলাস নগরী উজ্জয়িনী। পুষ্পধন্বা কন্দর্পের মর্মর দেউল মদন-মহোৎসবের লীলাক্ষেত্রে পরকীয়া প্রেমের উন্মাদক আকর্ষণ ও তার ট্যাজিক পরিণামই গল্পটির উপজীব্য। উজ্জয়িনীর প্রসিদ্ধ বস্ত্র-শিল্পী তন্তু ও তার লালসা-ময়ী কুহকিনী পত্নী রল্লা আর রল্লার রূপমুগ্ধ শকবাহিনীর পত্তিনায়ক অহিদত্ত রঞ্জুলই এই গল্পের কুশীলব। রূপমুগ্ধ পুরুষের দৃষ্টিতে নারীর যে বর্ণনা শরদিন্দুবাবু দিয়েছেন, তার তুলনা একমাত্র সংস্কৃত সাহিত্যেই পাওয়া সম্ভব। তপ্তকাঞ্চনবর্ণা লোলযৌবনা তন্বী, কবরীতে মল্লীমুকুলের মালা জড়িত, মুখে চূর্ণ

মনঃশিলার প্রলেপ, কিংশুকফুল ওষ্ঠাধর হইতে যেন রতি-মাদকতায় মধু ক্ষরিয়া পড়িতেছে। কর্ণে কর্ণিকার করি গণ্ডের উত্তাপে ম্লান হইয়া গিয়াছে। পত্রলেখা-চিত্রিত উরসে লতাজালের ন্যায় সূক্ষ্ম কঞ্চুকী, তদুপরি স্বচ্ছতর উত্তরীয় যেন কাশ্মীরবর্ণ কুহেলী দ্বারা অপূর্ণ চন্দ্রকলাকে আচ্ছাদন করিয়া রাখিয়াছে। নাভিতটে আকুঞ্চিত নিচোল ; চরণ দু'টি লাক্ষারসনির্ষিক্ত।" এই বিমোহিনী মূর্তির কুটিল কটাক্ষে যে বিযাক্ত পুষ্পশর নিক্ষিপ্ত হয় চিরকালই তার আঘাতে পুরুষকে প্রাণ দিতে হয়েছে। এ ক্ষেত্রেও তস্করের হাতে পত্তিনায়ককে প্রাণ দিতে হ'ল, কিন্তু শরদিন্দু-বাবুর লেখনীতে সে মৃত্যু অবিস্মরণীয় হয়ে রইল। 'চুয়াচন্দন' গল্পে কামমোহিত মানুষের ইতিহাস আরো কয়েক শতাব্দী অগ্রসর হয়েছে। একেবারে পঞ্চদশ শতাব্দীর বাংলাদেশ। অধঃপতিত বামাচারী পুরুষ, ধর্মের ছদ্মবেশে সহজিয়া সাধনার নামে উচ্ছৃংখল অনাচারে লিপ্ত। তারই হাতে বন্দিনী এক ষোড়শীর বন্ধন-মোচনের পূর্বরাগরঞ্জিত কাহিনী এর উপজীব্য। মধুর প্রেমের গল্পরচনায় শরদিন্দু-বাবুর লিপিকুশলতার পূর্ণ পরিচয় বহন ক'রে এনেছে সেই অমৃতবর্ষী গল্পটি। বর্তমান সংকলনের 'মন্দলোক' ও 'আঙটি' গল্প দুটি আধুনিক নরনারীর বিচিত্র জীবনের দুটি দিক উদ্ঘাটিত করেছে। চলতি জীবনের চিত্র শরদিন্দুবাবুর 'কালকূট,' 'বুমেরাং', 'কাঁচামিঠে', 'গোপন কথা,' 'দন্তরুচি' প্রভৃতি গল্প সংকলন গ্রন্থে বিধৃত হয়েছে। তাদের প্রতিনিধি হিসেবে আরো কয়েকটি রচনা এ গ্রন্থেও স্থানলাভ করেছে। আধুনিক জীবনের জটিলতা, তার ব্যাভিচার ও অভিশাপকে শরদিন্দুবাবু সহানুভূতির সঙ্গেই বুঝতে চেষ্টা করেছেন। প্রেমের ক্ষেত্রে পূর্বরাগ-অনুরাগের চিত্রগুলোও স্বভাবতই তাঁর হাতে সুন্দর হয়ে উঠেছে। কিন্তু এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে, তাঁর চলতি জীবনের গল্পগুলো প্রাচীন যুগের গল্পের তুলনায় নিষ্প্রভ। এ প্রসঙ্গে আবার তাঁর গল্পের জাতিস্মর বক্তার কথা স্মরণ করতে হবে। 'এ কালের মানুষ যেন সবদিক দিয়াই ছোট হইয়া গিয়াছে। দেহের, মনের, হৃদয়ধর্মের সে প্রসার আর নাই। যেন মানুষ তখন তরুণ ছিল ; এখন বৃদ্ধ হইয়াছে।' হয়তো সত্যসত্যই এ যুগের জীবন রোগজীর্ণ, জরাজর্জর, পঙ্কলিপ্ত। হয়তো দেহের, মনের, হৃদয়ধর্মের অকুণ্ঠ বলিষ্ঠ প্রকাশ এই জটিল-কুটিল জীবনে সম্ভব নয়। অথবা এ কথাও হয়তো মিথ্যা নয় যে, পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য ও বলিষ্ঠতা যাঁর দেহমনের মহৎ সম্পদ তাঁর পক্ষে এই জরাব্যাধি-জীর্ণ জীবনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে ওঠা দুঃসাধ্য।

কিন্তু তার জন্যে শরদিন্দুবাবুর পাঠকগণের আপসোস করবার বিন্দুমাত্র কারণ নেই। তাঁর স্বাধিষ্ঠান-ক্ষেত্রে ব'সে তিনি তাঁর শক্তির পূর্ণ ব্যবহারই করতে পেরেছেন। 'জাতিস্মর' 'চুয়াচন্দন' 'বিষকন্যা' প্রভৃতি সংকলন গ্রন্থে তাঁর ঐশ্বর্য অজস্র দাক্ষিণ্যে বর্ষিত হয়েছে। তাঁর পরিকল্পনায় মানুষের বিস্মৃত অতীত জীবন্ত হয়ে উঠেছে। তাঁর পরিবেশ রচনার যাদুতে পরোক্ষ জীবনের কথা ও কাহিনী যেন প্রত্যক্ষ সত্যে রূপান্তরিত হয়েছে। তাঁর অসামান্য বর্ণনাশক্তি, তাঁর সংস্কৃত বচনবিন্যাস, তাঁর সুকর্ষিত শিল্পিমানস, সর্বোপরি তাঁর দূরাভিসারী জীবনস্বপ্ন এ যুগের সাহিত্যে রোমান্সের রুদ্ধদ্বারের অর্গলমুক্ত ক'রে রসিকমাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছে।

বঙ্গবাসী
ভাদ্র, ১৩৫৫

জগদীশ ভট্টাচার্য

প্রাগ্‌জ্যোতিষ

১

আর্য দ্রাবিড় হূণ মোঙ্গল—প্রত্যেক মৌলিক জাতির জীবনেই একটা সময় আসে যেটাকে তাহার নবীন যৌবন বলা চলে ; যখন তপ্ত যৌবনের দুর্দমনীয় অপরিণামদর্শিতায় তাহারা বহু অসম্ভব ও হাস্যকর প্রতিজ্ঞা করিয়া বসে এবং শেষ পর্যন্ত সেই প্রতিজ্ঞা পালন করিয়া ছাড়ে।

যাহাদের আমরা আর্যজাতি বলিয়া জানি, তাহাদের জীবনের এই নবীন যৌবন আসিয়াছিল বোধহয় কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধেরও আগে। পাঁজিপুঁথি তখনও জন্মগ্রহণ করে নাই ; আকাশের গ্রহ নক্ষত্র চন্দ্র সূর্য স্বেচ্ছামত নিশ্চিন্ত মনে স্ব-স্ব কক্ষায় পরিভ্রমণ করিত—মানুষ তাহাদের গতিবিধি ও কার্যকলাপের উপর কড়া নজর রাখিতে আরম্ভ করে নাই।

আর্য বীরপুরুষগণ ভারতভূমিতে পদার্পণ করিয়া আদিম অনার্যদিগকে বিন্ধ্যাচলের পরপারে খেদাইয়া দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, উপরন্তু তাহাদের রাক্ষস পিশাচ দস্যু প্রভৃতি নাম দিয়া কটূক্তি করিতেছিলেন। মনে হয়, সে যুগেও শত্রুর বিরুদ্ধে দুর্নাম রটাইবার প্রথা পুরাদস্তুর প্রচলিত ছিল।

তারপর একদা অগস্ত্য মুনি কতিপয় সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়া দক্ষিণাপথে অগস্ত্যযাত্রা করিলেন, আর ফিরিলেন না। রাক্ষস ও পিশাচগণ তাঁহাকে কাঁচা ভক্ষণ করিল কি না, পুরাণে তাহার উল্লেখ নাই। যা হোক, তদাবধি অন্যান্য আর্য বীরগণও বিন্ধ্যপর্বতের দক্ষিণদিকে উঁকিঝুঁকি মারিতে লাগিলেন।

দুইজন নবীন আর্য যোদ্ধা সৈন্যসামন্ত লইয়া দক্ষিণাপথে বহুদূরে অগ্রসর হইয়া গিয়াছিলেন এবং দেখিয়া-শুনিয়া খানিকটা উর্বর ভূভাগ হইতে কৃষ্ণকায় দস্যু-তস্করদের তাড়াইয়া স্বরাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। এই আর্য বীরপুরুষ দুটির নাম—প্রদ্যুম্ন এবং মঘবা। উভয়ের মধ্যে প্রচণ্ড বন্ধুত্ব।

আজকাল বন্ধুত্ব বস্তুটার তেমন তেজ নাই ; ইয়ার্কি দিবার জন্যই বন্ধুকে প্রয়োজন হয়। সেকালে দস্যু ও রাক্ষস দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া বন্ধুত্ব পুরামাত্রায় বিস্ফুরিত হইবার অবকাশ পাইত।

দুই বন্ধুর যৌথ বাহুবলে রাজ্য স্থাপিত হইল। কিন্তু প্রশ্ন উঠিল—রাজা হইবে কে?

প্রদ্যুম্ন কহিলেন, 'মঘবা, তুই রাজা হ, আমি সেনাপতি হইব।'

মঘবা কহিলেন, উঁহু, তুই রাজা হ—আমি সেনাপতি—।'

সমস্যার সমাধান হইল না ; বন্ধুকে বঞ্চিত করিয়া রাজা হইতে কেহই ব্যগ্র নয়। এদিকে নবলব্ধ রাজ্যটি এতই ক্ষুদ্র যে ভাগাভাগি করিতে গেলে কিছুই থাকে না, চটকস্য মাংসম্ হইয়া যায়। প্রজা ভাগাভাগি করিলেও শক্তিক্ষয় অনিবার্য—

চারিদিকে শত্রু ওৎ পাতিয়া আছে। বন্ধুযুগল বড়ই ভাবিত হইয়া পড়িলেন।

একদিন রাত্রিকালে আকাশে গোলাকৃতি চন্দ্র শোভা পাইতেছিল—অর্থাৎ পূর্ণিমার রাত্রি। প্রস্তরনির্মিত উচ্চ দুর্গের চূড়ায় দুই বন্ধু চিন্তাকুঞ্চিত ললাটে অবস্থান করিতেছিলেন। দুর্গটা অবশ্য বিতাড়িত অনার্য দস্যুদের নির্মিত; আর্যেরা আদৌ দুর্গ নির্মাণ করিতে জানিতেন না। রামচন্দ্র লঙ্কায় রাবণের দুর্গ দেখিয়া একেবারে নির্বাক হইয়া গিয়াছিলেন।

মঘবা তাঁহার পিঙ্গলবর্ণ দাড়ির মধ্যে ঘন ঘন অঙ্গুলি চালনা করিতে করিতে মুক্ত ছাদে পায়চারি করিতেছিলেন। প্রকান্ড ষন্ডা চেহারা, নীল চক্ষু, মুদ্গারের মত দৃঢ় ও নিরেট দেহ। চিন্তা করার অভ্যাস তাঁহার বিশেষ ছিল না, তাই দুশ্চিন্তা উপস্থিত হইলেই তিনি নিজের দাড়ি ধরিয়া টানাটানি করিতেন।

প্রদ্যুম্নের চেহারাখানা অপেক্ষাকৃত লঘু কিন্তু সমধিক নিরেট ও দৃঢ়। মাথায় সোনালী চুল, চোখের মণি গাঢ় নীল। দাড়ি নাই; গলা চুলকাইত বলিয়া তিনি তরবারির অগ্রভাগ দিয়া দাড়ি কামাইয়া ফেলিতেন। কেবল একজোড়া সূক্ষ্ম গোঁফ ছিল। এই গোঁফে অঙ্গুলি বুলাইতে বুলাইতে প্রদ্যুম্ন প্রাচীর-বেষ্টনীতে ঠেস দিয়া চাঁদের পানে ভ্রূকুটি করিতেছিলেন।

চাঁদ কিন্তু হাসিতেছিল। তাহার যে গুরুতর বিপদ আসন্ন হইয়াছে, পঞ্জিকা না থাকায় সে তার পূর্বাভাস পায় নাই।

সহসা মঘবা বলিলেন, 'একটা মতলব মাথায় আসিয়াছে। প্রদ্যুম্ন, আয় পাঞ্জা লড়ি—যে হারিবে তাহাকেই রাজা হইতে হইবে।'

প্রদ্যুম্ন গোঁফের আড়ালে শ্লেষহাস্য করিলেন, 'জচ্চুরির মতলব! গত যুদ্ধে আমার কব্জি মচকাইয়া গিয়াছে জানিস কিনা।'

ব্যর্থ হইয়া মঘবা আবার দাড়ি টানিতে লাগিলেন। শেষে বলিলেন, 'দুজনে রাজা হইলে দোষ কি?'

প্রদ্যুম্ন বলিলেন, 'দু-জনে রাজা হইলে কে কাহার হুকুম মানিবে? কে প্রজাদের হুকুম দিবে?'

'তা বটে।'

'তবে দু-জনে রাজা হওয়া যায়। পর পর।'

'সে কি রকম?'

'তুই কিছুদিন রাজা হইলি, আমি সেনাপতি। তারপর আমি রাজা হইলাম। এই আর কি।'

মঘবা ভাবিয়া বলিলেন, 'মন্দ কথা নয়। একদিন তুই রাজা আর একদিন আমি।'

'উঁহু, অত তাড়াতাড়ি রাজা বদল করিলে গন্ডগোল বাধিবে।'

'গন্ডগোল কিসের?'

'মনে কর, আমি রাজা হইয়া তোকে হুকুম দিলাম—সেনাপতি, শুনিয়াছি দক্ষিণে লম্বোদর নামক রাক্ষসের রাজ্যে রসাল নামক একপ্রকার অতি সুন্দর ফল পাওয়া যায়, তুমি দ্রুত গিয়া ঐ ফল আহরণ করিয়া আন—আমার খাইবার ইচ্ছা হইয়াছে।—তুই ফল লইয়া ফিরিতে ফিরিতে দিন কাবার হইয়া গেল, তুই রাজা

হইলি, আমি সেনাপতি বনিয়া গেলাম। তখন কে ফল খাইবে?'

মঘবা বলিলেন, 'তাই ত। বড়ই ফ্যাসাদ দেখিতেছি।'

মনে রাখিতে হইবে, আর্যগণ তখনও স্থির হইয়া বসিয়া জ্ঞান-বিজ্ঞানের গবেষণা আরম্ভ করেন নাই; দু-একজন ঋষি হঠাৎ মন্ত্রদ্রষ্টা হইয়া চকিতে বিদ্যুৎরেখাবৎ এক-আধটা সূত্র উচ্চারণ করিয়া ফেলিতেন, এ পর্যন্ত। শীত গ্রীষ্ম বর্ষা—এইরূপ ঋতু পরিবর্তনের কথা মোটামুটি জানা থাকিলেও, সময়কে সপ্তাহ মাস বৎসরে বিভাজিত করিবার বুদ্ধি তখনও গজায় নাই।

সুতরাং প্রদ্যুম্ন ও মঘবা বড়ই ফাঁপরে পড়িয়া গেলেন।

ওদিকে আকাশে চন্দ্রও ফাঁপরে পড়িয়াছিল। প্রদ্যুম্ন তাহার প্রতি ভ্রূকুটি করিবার জন্য চোখ তুলিয়াই সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, 'আরে আরে, একি!'

মঘবাও দৃষ্টি উৎক্ষিপ্ত করিলেন। দেখিলেন, আকাশ নির্মেঘ, কিন্তু চন্দ্রের শুভ্র মুখের ওপর ধূম্রবর্ণ ছায়া পড়িয়াছে; করাল ছায়া ধীরে ধীরে চন্দ্রকে গ্রাস করিবার উপক্রম করিতেছে।

দুই বন্ধুর মনে সশঙ্ক উত্তেজনার উৎপত্তি হইল। ব্যাপারটা পূর্বে কয়েকবার দেখা থাকিলেও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক একটা প্রাকৃতিক ঘটনা বলিয়া সাব্যস্ত হয় নাই, ভূকম্পের মত অপ্রত্যাশিত একটা মহাদুর্যোগ বলিয়াই বিবেচিত হইত। মঘবা দ্রুত আসিয়া প্রদ্যুম্নের হাত চাপিয়া ধরিলেন, গাঢ় স্বরে ফিসফিস করিয়া বলিলেন, 'চন্দ্রগ্রহণ!'

প্রদ্যুম্ন পাংশু মুখে বন্ধুকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, 'হাঁ, কিন্তু ভয় নাই। চাঁদ আবার মুক্ত হইবে।—ছেলেবেলায় বুড়ো অঙ্গিরা ঋষির কাছে বিদ্যা শিখিতে কয়েকবার গিয়াছিলাম, বুড়ো একদিন বলিয়াছিল আকাশে রাহু নামে একটা অদৃশ্য রাক্ষস আছে, সে মাঝে মাঝে চন্দ্র সূর্যকে ধরিয়া গিলিয়া ফেলে। কিন্তু বেশিক্ষণ চাপিয়া রাখিতে পারে না।'

'হ্যাঁ, আমিও চার-পাঁচবার দেখিয়াছি।'

'আমিও। মাঝে মাঝে এরূপ ঘটিয়া থাকে।'

দুই বন্ধু হাত-ধরাধরি করিয়া দেখিতে লাগিলেন, বিপন্ন ম্রিয়মাণ চন্দ্র যেন একটা তাম্রবর্ণ অর্ধস্বচ্ছ অজগরের পেটের ভিতর দিয়া পশ্চাদভিমুখে চলিয়াছে। দুর্গের নিচে ভয়ার্ত জনগণ সমবেত হইয়া চীৎকার ও নানা প্রকার বাদ্যধ্বনি করিতে লাগিল। দুষ্ট রাক্ষসগণ নাকি এইরূপ বিকট শব্দ শুনিলে ভয় পাইয়া পলায়ন করে।

দীর্ঘকাল পরে চাঁদের একটি চক্‌চকে কোণ বাহির হইয়া পড়িল। তারপর দেখিতে দেখিতে চন্দ্র সম্পূর্ণ অক্ষত দেহে সহাস্য মুখে রাক্ষসের কবল হইতে নির্গত হইয়া আসিলেন।

সকলে উর্ধ্বস্বরে মহা আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিল। মঘবা প্রদ্যুম্নের হাত ছাড়িয়া দিয়া সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, 'যাক, বাঁচা গেল।'

প্রদ্যুম্ন বলিলেন, 'শুধু তাই নয়, আমাদের সমস্যারও সমাধান হইয়াছে।

'কিরূপ?'

'শুন। আজ হইতে তুমি রাজা হইলে। আবার যখন চন্দ্রগ্রহণ লাগিবে তখন

তোমার রাজত্বকাল শেষ হইবে, আমি রাজা হইব। এইভাবে চলিতে থাকিবে।

মঘবা ভাবিয়া বলিলেন, 'মন্দ কথা নয়।—কিন্তু প্রথমে আমি রাজা হইব কেন?'

'যেহেতু বুদ্ধিটা আমি বাহির করিয়াছি। এখন চলিলাম, কাল সকালে সৈন্য-সামন্ত লইয়া যুদ্ধযাত্রা করিব—সেনাপতির আর কাজ কি? মহারাজ ইতিমধ্যে অপত্যনির্বিশেষে প্রজাপালন করিতে থাকুন। মহারাজের জয় হোক।'

মুচকি হাসিয়া প্রদ্যুম্ন দুর্গশিখর হইতে নামিবার উপক্রম করিলেন। মঘবা অত্যন্ত মুষড়িয়া পড়িয়া নিজের দাড়ি টানিতে লাগিলেন।

মঘবার মাথায় বড় বেশি বুদ্ধি খেলে না, কিন্তু এখন সহসা তাঁহার মস্তিষ্করন্ধ্রে রাজবুদ্ধির উদয় হইল। তিনি গম্ভীর স্বরে ডাকিলেন, 'সেনাপতি প্রদ্যুম্ন!'

প্রদ্যুম্ন ফিরিয়া আসিয়া করজোড়ে দাঁড়াইলেন।

'আজ্ঞা করুন মহারাজ।'

মহারাজ মঘবা মেঘমন্দ্র স্বরে বলিলেন, 'আজ্ঞা করিতেছি, কল্য প্রাতে আমি সৈন্যসামন্ত লইয়া যুদ্ধযাত্রা করিব। যতদিন না ফিরি, তুমি অপত্যনির্বিশেষে প্রজাপালন করিতে থাক। রাত্রি গভীর হইয়াছে, এবার আমি রাজশয্যায় শয়ন করিতে চলিলাম।

মুচকি হাসি হাসিতে মঘবা অভ্যস্ত নহেন, প্রদ্যুম্নের প্রতি একবার চোখ টিপিয়া অট্টহাস্য করিতে করিতে তিনি প্রস্থান করিলেন।

বোকা বনিয়া গিয়া প্রদ্যুম্ন বাম কর্ণের পশ্চাদ্ভাগ চুলকাইতে লাগিলেন।

২

নবযৌবনের প্রধান ধর্ম এই যে, সে জীবনটাকে গাম্ভীর্যের চশমার ভিতর দিয়া দেখে না, জগৎ তাহার কাছে খেলার মাঠ; যুদ্ধ একটা সরস কৌতুক, প্রেম একটা মাদক উত্তেজনা।

মহারাজ মঘবা মহানন্দে অর্ধেক সৈন্য লইয়া যুদ্ধ করিতে চলিয়া গেলেন। রাজ্যের দক্ষিণ সীমান্তে কোদণ্ড নামে এক অনার্য জাতি আছে, উদ্দেশ্য—তাহাদের উৎপীড়ন করা।

আধুনিক গণনায় যে-সময়টাকে তিন মাস বলা চলে, অনুমান ততদিন পরে মঘবা যুদ্ধযাত্রা হইতে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার পিঙ্গল কেশ রুক্ষ, দেহে পশুচর্মের আবরণ ছিন্নভিন্ন, মুখে পরিতৃপ্ত বাসনার হাসি।

আসিয়াই তিনি প্রদ্যুম্নের পৃষ্ঠে বজ্রসম চপেটাঘাত করিলেন; বলিলেন, 'কি রে, কেমন আছিস?'

দুই বন্ধু নিবিড়ভাবে আলিঙ্গনাবদ্ধ হইলেন। প্রদ্যুম্ন বলিলেন, 'রোগা হইয়া গিয়াছিস দেখিতেছি; রাক্ষসদের মুল্লুকে কিছু খাইতে পাস নাই বুঝি। তারপর আত্মসম্বরণ করিয়া কহিলেন, 'মহারাজের জয় হউক। আর্যের সমস্ত সংবাদ শুভ?'

মঘবা বলিলেন, 'মন্দ নয়। কোদণ্ড বেটাদের খুব ঠুকিয়াছি। শুধু তাই নয়, একটা মজার জিনিস আনিয়াছি, দেখাইব চল।'

বিজিত জাতির নিকট হইতে অপহৃত বহু বিচিত্র বস্তু একদল সৈনিকের রক্ষণায় ছিল, মঘবা তাহাদের ইঙ্গিত করিয়া রাজভবন অভিমুখে চলিলেন। যাইতে যাইতে

প্রদ্যুম্নকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তারপর, রাজ্য কেমন চলিতেছে? প্রজারা আনন্দে আছে?'

'প্রজাদের আনন্দ সম্প্রতি বিলক্ষণ বাড়িয়া গিয়াছে?'

'কিরূপ?'

'আর্য যোদ্ধৃগণের প্রাণে রসের সঞ্চার হইয়াছে। তাহারা অনার্য মেয়ে ধরিয়া আনিয়া পটাপট বিবাহ করিয়া ফেলিতেছে।'

মঘবা উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিলেন, 'তাই নাকি?—রোগ ছোঁয়াচে দেখিতেছি।'

প্রদ্যুম্ন মঘবার প্রতি বক্র কটাক্ষ করিলেন। মঘবা বলিলেন, 'কিন্তু উপায় কি? এই দেশেই যখন বসবাস করিতে হইবে, তখন আর্য রক্ত নিষ্কলুষ রাখা অসম্ভব। আর্যাবর্ত হইতে এত মেয়ে আমদানি করা চলে না, অথচ বংশরক্ষাও না করিলে নয়। এই যে রাজ্য জয় করিলাম—কাহাদের জন্য?'

প্রদ্যুম্ন শুধু বলিলেন, 'হুঁ।'

রাজা ও সেনাপতি মন্ত্রণাগৃহে গিয়া বসিলেন। সামন্ত সচিব শ্রেষ্ঠী বিদূষক কিছুই নাই, সুতরাং মন্ত্রণাগৃহ শূন্য। চারিজন সৈনিক একটা বৃহৎ বেত্রনির্মিত পেটারি ধরাধরি করিয়া তাঁহাদের সম্মুখে রাখিল। পেটারির মুখ ঢাকা, ভিতরে গুরুভার কোনও দ্রব্য আছে মনে হয়।

বিস্মিত প্রদ্যুম্ন বলিলেন, 'কি আছে ইহার মধ্যে? অজগর সাপ নাকি?'

মঘবা হস্তসঞ্চালনে সৈনিকদের বিদায় করিয়া, হাসিতে হাসিতে পেটারির ঢাকা খুলিয়া দিলেন।

সাপুড়ের ঝাঁপি খোলা পাইয়া কৃষ্ণকায় সর্পী যেমন ফণা তুলিয়া দাঁড়ায় তেমনই একটি নারী পেটারির মধ্যে উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার নীলাঞ্জন চোখে ধিকি ধিকি বিদ্যুৎ।

প্রদ্যুম্ন হতভম্ব হইয়া গেলেন। তাঁহার ব্যাদিত মুখ হইতে বাহির হইল, 'আরে এ কি! এ যে একটি মেয়ে!'

মঘবা অট্টহাস্য করিলেন; তারপর বলিলেন, 'কেমন মেয়ে? সুন্দর নয়?'

প্রদ্যুম্ন নীরবে বন্দিনীকে নিরীক্ষণ করিলেন। মার্জিত তাম্রফলের ন্যায় দেহের বর্ণ; দলিতাঞ্জন দুইটি চোখ, দলিতাঞ্জন চুল। বস্ত্র-অলংকারের বাহুল্য নাই; গলায় একটি বীজের মালা, বাহুতে শঙ্খের অঙ্গদ; কবরী ও কর্ণে পুষ্পভূষা শুকাইয়া গিয়াছে। কটি হইতে জানু পর্যন্ত একটি বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত পট্টাংশু। কৃশাঙ্গী যুবতীর যৌবন-মেদুর দেহের অভ্যন্তর হইতে যেন কৃশানুর দীপ্তি বিচ্ছুরিত হইতেছে।

মঘবা পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি মনে হয়? সুন্দর নয়?'

প্রদ্যুম্ন চমকিয়া মঘবার দিকে ফিরলেন, তারপর ভর্ৎসনাপূর্ণ স্বরে বলিলেন, 'তুই একটা আস্ত গোঁয়ার। যুদ্ধ করিতে গিয়া মেয়ে ধরিয়া আনিলি! এখন ইহাকে লইয়া কি করিবি?'

ইহাকে দিয়া যে দাসীকিংকরীর কাজ চলিবে না, তাহা একবার দৃষ্টিপাত করিয়াই আর সংশয় থাকে না।

মঘবা বলিলেন, 'ঠিক করিয়াছি, বিবাহ করিব।'

প্রদ্যুম্ন সচকিতে বলিলেন, 'বিবাহ !'

'হাঁ। ও কে জানিস ? কোদণ্ডরাজার মেয়ে।'

প্রদ্যুম্নের মুখ সহসা গম্ভীর হইল। মঘবা বলিতে লাগিলেন, কোদণ্ডদের রাজপুরী দখল করিয়া দেখিলাম, সকলে পলাইয়াছে, কেবল মেয়েটা একা দাঁড়াইয়া আছে। ভারি ভাল লাগিল। ওকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলাম, কিন্তু বিন্দু-বিসর্গও বুঝিতে পারিল না। তাই পেটারি বন্ধ করিয়া সঙ্গে আনিয়াছি। আর্য রাজার মহিষী হইবার যোগ্য মেয়ে বটে ; কিন্তু উহাকে আগে আর্য ভাষা শিখাইতে হইবে। তারপর আমার পট্টমহিষী করিব।'

প্রদ্যুম্ন আর একবার যুবতীর পানে ফিরিয়া দেখিলেন। সে তাহাদের কথাবার্তার মর্ম কিছুই বুঝিতে পারে নাই ; কেবল তাহার চোখ দুটি একের মুখ হইতে অন্যের মুখে যাতায়াত করিতেছে। তাহার মুখে ভয় বা আশঙ্কার চিহ্ন কিছুই নাই ; আছে কেবল এই বর্বরদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে ঘৃণাপূর্ণ গর্বিত জিজ্ঞাসা।

ভ্রূযুগল ঈষৎ কুঞ্চিত করিয়া প্রদ্যুম্ন মঘবার দিকে ফিরিলেন, অন্যায় করিয়াছ মঘবা। হাজার হোক রাজার মেয়ে, তাহাকে এ ভাবে ধরিয়া আনা আর্য শিষ্টতা হয় নাই।'

মঘবা বলিলেন, 'বিবাহ করিবার জন্য কন্যা হরণ করিলে আর্য শিষ্টতা লঙ্ঘন হয় না।'

'হয়। অরক্ষিতা মেয়েকে ধরিয়া আনা তস্করের কাজ। এই দণ্ডে এই কন্যাকে ফেরত পাঠানো উচিত।'

তপ্তকণ্ঠে মঘবা বলিলেন,'কখন না—' তারপর আত্মসম্বরণ করিয়া অপেক্ষাকৃত শান্তস্বরে বলিলেন, 'আমি মহারাজ মঘবা, তোমাকে আদেশ করিতেছি, সেনাপতি প্রদ্যুম্ন, তুমি এই কন্যার যথাযোগ্য বাসস্থানের ব্যবস্থা কর—যাতে সুখে থাকে, অথচ পলাইতে না পারে। মনে থাকে যেন, কন্যা পলাইলে দায়িত্ব তোমার।'

প্রদ্যুম্ন একবার কয়েক মুহূর্তের জন্য বন্ধুর পানে চাহিয়া রহিলেন, তারপর যুক্তকরে মস্তক অবনত করিয়া শুষ্কস্বরে কহিলেন, 'মহারাজের যেরূপ অভিরুচি।'

দুর্গচূড়ার কূটকক্ষে ভাবী রাজমহিষীর বাসস্থান নির্দিষ্ট হইল। কোদণ্ডকন্যা দৃঢ়বদ্ধ ওষ্ঠাধরে অকম্পিত পদে দুর্গ শীর্ষের কারাগারে প্রবেশ করিলেন। কার্যত কারাগার হইলেও স্থানটি প্রশস্ত অলিন্দযুক্ত একটি মহল। সকল সুবিধাই আছে, শুধু পলাইবার অসুবিধা।

মঘবা সহর্ষে প্রদ্যুম্নের পৃষ্ঠে একটি মুষ্ট্যাঘাত করিয়া বলিলেন, 'রাণীর মত রাণী পাওয়া গিয়াছে—কি বলিস ?'

প্রদ্যুম্ন বলিলেন, 'হুঁ।'

৩

পরদিন প্রাতঃকালে কিন্তু গুরুতর সংবাদ আসিল। কোদণ্ডদেশ হইতে সদ্য-প্রত্যাগত নিরতিশয় নির্জীব একটি ভগ্নদূত জানাইল যে, রাজকন্যা হরণের কথা জানিতে পারিয়া পলাতক কোদণ্ড জাতি আবার কাতারে কাতারে ফিরিয়া আসিয়াছে এবং একেবারে ক্ষেপিয়া গিয়াছে। মঘবা যে অল্পসংখ্যক আর্যকটক থানা দিবার জন্য রাখিয়া আসিয়াছিলেন, শত্রুর অতর্কিত ক্ষিপ্রতায় তাহারা কুচুকাটা হইয়াছে—

কেবল ভগ্নদূত পদদ্বয়ের ক্ষিপ্রতাবশত প্রাণ বাঁচাইতে সমর্থ হইয়াছে। পরিস্থিতি অতিশয় ভয়াবহ।

শুনিয়া প্রদ্যুম্ন চঞ্চল হইয়া উঠিলেন, 'মহারাজ, অনুমতি দিন, শ্যালকদের টিট করিয়া আসি।'

মঘবা কিন্তু রাজী হইলেন না, বলিলেন, 'তাহা হয় না। টিট করিতে হয় আমি করিব।'

সৈন্য সাজাইয়া আবার মঘবা বাহির হইলেন। কিছুদূর গিয়া ফিরিয়া আসিয়া প্রদ্যুম্নকে বলিলেন, 'ইতিমধ্যে মেয়েটাকে তুই আর্যভাষা শেখাস।'

মনের ক্ষুব্ধতা গোপন করিয়া প্রদ্যুম্ন বলিলেন, 'আচ্ছা।'

দুই-এক দিনের মধ্যেই বুঝিতে পারিলেন, অনার্য মেয়েটি অতিশয় মেধাবিনী। অষ্টাহমধ্যে সে ভাঙ্গা ভাঙ্গা কথা কহিতে আরম্ভ করিল। তাহার নাম এলা। অনার্য নাম বটে, কিন্তু শুনিতে ও বলিতে বড় মিষ্ট। প্রদ্যুম্ন কয়েকবার উচ্চারণ করিলেন, 'এলা। এলা। বাঃ! বেশ তো।'

কথা কহিতে শিখিয়াই এলা প্রথম প্রশ্ন করিল, 'ও লোকটা কে? যে আমাকে আনিয়াছে?'

প্রদ্যুম্ন বলিলেন, আমার বন্ধু।'

বন্ধু শব্দের ভাবার্থ বুঝিতে এবার কিছু বিলম্ব হইল। অবশেষে বুঝিতে পারিয়া সে নাক সিঁটকাইল; তীব্র অবজ্ঞার কণ্ঠে বলিল, 'তোমরা বর্বর।'

প্রদ্যুম্ন অবাক হইয়া গেলেন; ভাবিলেন, কি আশ্চর্য, আমরা বর্বর!

ক্রমশ এলা আর্যভাষায় কহিতে লাগিল—কোনও কথা বলিতে বা বুঝিতে তাহার বাধে না। একদিন জিজ্ঞাসা করিল, 'আমাকে এখানে ধরিয়া রাখিয়াছ কেন?'

প্রদ্যুম্ন ঢোক গিলিয়া বলিলেন, 'আর্যভাষা শিখাইবার জন্য।'

এলা বলিল, 'ছাই ভাষা। এই শিখিয়া কি হবে?'

প্রদ্যুম্ন একটু রসিকতা করিয়া বলিলেন, 'প্রেমালাপ করিবার সুবিধা হইবে। মহারাজ মঘবা তোমাকে বিবাহ করিবেন স্থির করিয়াছেন!'

এলা বসিয়াছিল, ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল; কিছুক্ষণ অপলক নেত্রে প্রদ্যুম্নের পানে চাহিয়া রহিল। তারপর আবার বসিয়া পড়িয়া নিশ্চিন্ত স্বরে বলিল, উহাকে আমি বিবাহ করিব না। বর্বর!

প্রদ্যুম্ন স্তোক দিবার জন্য বলিলেন, 'মঘবা দাড়ি রাখে বটে, কিন্তু লোক খারাপ নয়।'

এলা শুধু বলিল 'বর্বর।'

এমনি ভাবে দিন কাটিতে লাগিল। কিন্তু মঘবার দেখা নাই—তিনি কোদণ্ডদের টিট করিলেন অথবা কোদণ্ডেরা তাঁহাকে টিট করিল, কোনও সংবাদ নাই। প্রদ্যুম্ন উতলা হইয়া উঠিলেন।

দেখিতে দেখিতে তিন মাস অতীত হইয়া গেল।

একদিন প্রাতঃকালে প্রদ্যুম্ন এলার কুটগৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, এলা বাতায়নপার্শ্বে দাঁড়াইয়া বেণী উন্মোচন করিতেছে। প্রদ্যুম্নকে দেখিয়া সে একবার ঘাড় ফিরাইল, তারপর আবার বাহিরের দূর দৃশ্যের পানে তাকাইয়া বেণীর

বিসর্পিল বয়ন মোচন করিতে লাগিল।

প্রদ্যুম্ন গলা ঝাড়া দিলেন, কিন্তু কোনও ফল হইল না। তখন তিনি বাতায়ন-সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন ; আকাশের দিকে তাকাইলেন, নিম্নে উঁকিঝুঁকি মারিলেন, তারপর পুনশ্চ গলা খাঁকারি দিয়া বলিলেন, 'শীত আর নাই ; দিব্য গরম পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে।'

উৎসাহ পাইয়া এলা বলিল, 'হুঁ।' প্রদ্যুম্ন বলিলেন, 'আজকাল দক্ষিণ হইতে যে হাওয়া বহিতেছে, তাহাকেই বুঝি তোমরা মলয় সমীরণ বলিয়া থাক ? আর্যাবর্তে এ হাওয়া নাই।'

এলা তাঁহার দিকে গম্ভীর চক্ষু তুলিয়া প্রশ্ন করিল, 'দুই দিন আসা হয় নাই কেন ?'

প্রদ্যুম্ন থতমত খাইয়া বলিলেন, 'ব্যস্ত ছিলাম'—একটু থামিয়া—'তোমার তো আর আর্যভাষা শিখিবার প্রয়োজন নাই। যাহা শিখিয়াছ তাহাতেই আমাদের সকলের কান কাটিয়া লইতে পার।'

কিছুক্ষণ কোনও কথা হইল না ; এলা নতনেত্রে মুক্ত বেণী আবার বিনাইতে লাগিল। শেষে প্রদ্যুম্ন পূর্ব কথার জের টানিয়া বলিতে লাগিলেন, 'মঘবা আসিয়া পড়িলে বাঁচা যায়। অনেক দিন হইয়া গেল, এখনও তাহার কোনও খবর নাই।—দুর্ভাবনা হইতেছে।'

এলা তিলমাত্র সহানুভূতি না দেখাইয়া নির্দয়ভাবে হাসিল, বলিল, 'তোমার মঘবা আর ফিরিবে না, আমার স্বজাতিরা তাহাকে শেষ করিয়াছে।'

ক্রুদ্ধ চক্ষে চাহিয়া প্রদ্যুম্ন বলিলেন, 'মঘবাকে শেষ করিতে পারে এমন মানুষ দাক্ষিণাত্যে নাই। সে মহাবীর।'

তাচ্ছিল্যভরে এলা বলিল, 'বর্বর।'

অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া প্রদ্যুম্ন বলিলেন, 'ঐ বর্বরকেই তোমাকে বিবাহ করিতে হইবে।'

ভ্রূভঙ্গী করিয়া এলা বলিল, 'তাই নাকি ! আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ?'

'তুমি তো বন্দিনী। তোমার আবার ইচ্ছা কি ?'

প্রত্যেকটি শব্দ কাটিয়া এলা উত্তর দিল, 'ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাকে বিবাহ করিতে পারে এমন পুরুষ তোমাদের আর্যাবর্তে জন্মে নাই। এই বীজের মালা দেখিতেছ ? এলা দুই আঙ্গুলে নিজ কণ্ঠের বীজমালা তুলিয়া দেখাইল, 'একটি বীজ দাঁতে চিবাইতে যেটুকু দেরি—আর আমাকে পাইবে না।'

প্রদ্যুম্ন সভয়ে বলিয়া উঠিলেন, 'কি সর্বনাশ—বিষ ! দাও, শীঘ্র মালা আমায় দাও।'

এলা দূরে সরিয়া গিয়া বলিল, এত দিন তোমাদের বন্দিনী হইয়া আছি, ভাবিয়াছ, আমি অসহায়া ? তোমাদের খেলার পুতুল ? তাহা নহে। যখন ইচ্ছা আমি মুক্তি লইতে পারি।'

প্রদ্যুম্ন মূঢ়ের মত তাকাইয়া থাকিয়া বলিলেন, 'তবে লও নাই কেন ?'

এলা ক্ষণেক চুপ করিয়া রহিল ; তারপর গর্বিত স্বরে বলিল, 'সে আমার ইচ্ছা।'

এই সময় বাতায়নের বাহিরে দূরে উপত্যকায় শঙ্খের গভীর নির্ঘোষ হইল।

চমকিয়া প্রদ্যুম্ন সেই দিকে দৃষ্টি প্রেরণ করিলেন। সীমান্তের বনানীর ভিতর হইতে ধ্বজাকেতনধারী আর্যসেনা ফিরিয়া আসিতেছে। ললাটের উপর করতলের আচ্ছাদন দিয়া প্রদ্যুম্ন সেই দিক চাহিয়া কহিলেন, তারপর গভীর নিশ্বাস মোচন করিয়া বলিলেন, 'বাঁচা গেল—মঘবা ফিরিয়াছেন।'

প্রদ্যুম্ন তাড়াতাড়ি চলিয়া যাইবার উপক্রম করিলেন। পিছন হইতে এলার শান্ত কণ্ঠস্বর আসিল, আমিও বাঁচিলাম, মুক্তির আর দেরী নাই।'

প্রদ্যুম্ন চকিতে ফিরিয়া দাঁড়াইলেন; এলা তেমনি দাঁড়াইয়া বেণী বয়ন করিতেছে। তাহার মুখে সূচীবিদ্ধ মৃত প্রজাপতির মত একটুখানি হাসি।

প্রদ্যুম্ন তাহার কাছে ফিরিয়া গিয়া অনুনয়ের কণ্ঠে বলিলেন, 'এলা, ছেলেমানুষি করিও না। মঘবাকে বুঝিতে সময় লাগে, বিবাহের পর বুঝিতে পারিবে, তাহার মত মানুষ হয় না। মিনতি করিতেছি, ঝোঁকের মাথায় হঠাৎ একটা কিছু করিয়া বসিও না।'

এলা বলিল, 'হঠাৎ কোনও কাজ করা আমার অভ্যাস নয়; আমি কোদণ্ডকন্যা, বর্বর নহি। যদি মঘবা বলপূর্বক আমাকে বিবাহ করিবার চেষ্টা করে, বিবাহের সভায় আমি মুক্তি লইব।'

মঘবা বলিলেন, কোদণ্ডদের ভাল রকম কাবু করিতে পারিলাম না। ক্ষেপিয়া গেলে ব্যাটারা ভীষণ লড়ে। যা হোক শেষ পর্যন্ত সন্ধি করিয়াছে।'

প্রদ্যুম্ন প্রশ্ন করিলেন, 'সন্ধির শর্ত কিরূপ?'

মঘবা উচ্চৈস্বরে হাসিলেন, 'চমৎকার। অদ্ভুত জাত এই কোদণ্ড, আশ্চর্য তাহাদের রীতিনীতি।—জানিস, ওদের জাতে মেয়ে বাপের উত্তরাধিকারিণী হয়, ছেলে মামার সম্পত্তি পায়? শুনিয়াছিস কখন?'

মাথা নাড়িয়া প্রদ্যুম্ন বলিলেন, 'না। কিন্তু সন্ধির শর্ত কিরূপ?'

'শর্ত এই—কোদণ্ডের রাজকন্যা অপহরণ করাতে তাহাদের মর্যাদায় বড় আঘাত হানিয়াছে; এই কলঙ্ক-মোচনের একমাত্র উপায় কন্যাকে বিবাহ করা। বিবাহ না করিলে তাহারা যুদ্ধ করিবে, কিছুতেই শুনিবে না। আর যদি বিবাহ করি, তবে উত্তরাধিকারসূত্রে কোদণ্ডদের রাজা হইব। গুরুতর শর্ত নয়?' বলিয়া মঘবা গলা ছাড়িয়া হাসিতে লাগিলেন।

প্রদ্যুম্ন কিয়ৎকাল হেঁটমুখে রহিলেন, তারপর ঈষৎ হাসিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, 'গুরুতর বটে।'

মঘবা বলিলেন, 'সুতরাং আর বিলম্ব নয়, তাড়াতাড়ি কোদণ্ডকন্যাকে বিবাহ করিয়া ফেলা দরকার।—মেয়েটা ঠিক আছে তো?'

'ঠিক আছে।'

'আর্যভাষা কেমন শিখিল?'

'বেশ!'

'তবে কালই বিবাহ করিব।'

কিছুকাল নীরব থাকিয়া প্রদ্যুম্ন বলিলেন, কন্যার মতামত জানিবার প্রয়োজন নাই?'

'কিছুমাত্র না। এ রাজকীয় ব্যাপার, কথার নড়চড় চলিবে না। সন্ধির শর্ত

পালন করিতেই হইবে।'

* * * *

সেই দিন গভীর রাত্রে প্রদ্যুম্ন চোরের মত এলার মহলে প্রবেশ করিলেন। আকাশে প্রায়-পূর্ণাবয়ব চন্দ্র গবাক্ষপথে কিরণস্রোত ঢালিয়া দিতেছে। সেই জ্যোৎস্নার তলে মাটিতে পড়িয়া এলা ঘুমাইতেছে। ঘরে প্রদীপ নাই।

নিঃশব্দে প্রদ্যুম্ন তাহার কাছে গেলেন। হাঁটু গাড়িয়া তাহার পাশে বসিলেন। নিঃশ্বাস রোধ করিয়া তাহার মুখের কাছে মুখ লইয়া গেলেন।

এলা ঘুমাইতেছে, কিন্তু তাহার চক্ষের কোণ বাহিয়া বিন্দু বিন্দু অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছে। স্বপ্নে এলা গদগদ অবরুদ্ধ কণ্ঠে বলিতেছে—'প্রদ্যুম্ন! প্রদ্যুম্ন! প্রদ্যুম্ন! আমি মরিতে চাহি না! তুমি কেমন মানুষ, কিছু বুঝিতে পার না বর্বর! আমাকে উদ্ধার কর প্রদ্যুম্ন! প্রদ্যুম্ন! প্রদ্যুম্ন!'

যে কার্য করিতে আসিয়াছিলেন তাহা করা হইল না, বীজের মালা এলার কণ্ঠেই রহিল। প্রদ্যুম্ন চোরের মত নিঃশব্দে ফিরিয়া গেলেন।

* * * *

পরদিন সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে পূর্বাকাশে চন্দ্রোদয় হইল। মঘবা রাত্রির জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, বলিলেন, 'প্রদ্যুম্ন, এবার বিবাহের আয়োজন কর।'

রাজভবনের সম্মুখস্থ উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে ধুনীর মত অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল; অগ্নি সাক্ষী করিয়া বিবাহ হইবে। হোমাগ্নির পুরোভাগে বরবধূর কাষ্ঠাসন-পীঠিকা সন্নিবেশিত হইল।

বিবাহের সংবাদ পূর্বাহ্ণেই প্রচারিত হইয়াছিল; উৎসুক জনমণ্ডলী প্রাঙ্গণে সমবেত হইতে লাগিল।

বক্ষ বাহুবদ্ধ করিয়া প্রদ্যুম্ন একদৃষ্টে অগ্নির পানে তাকাইয়া আছেন; একবার বক্ষপঞ্জর ভেদ করিয়া একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস বাহির হইল।

মঘবা আসিয়া স্কন্ধে হাত রাখিতে তাঁহার চমক ভাঙিল, অগ্নি হইতে চক্ষু তুলিয়া সম্মুখে চাহিলেন। সম্মুখেই চন্দ্র; বৃক্ষশাখার অন্তরাল ছাড়াইয়া এইমাত্র ঊর্ধ্বে উঠিয়াছে। প্রদ্যুম্ন সেই দিকে তাকাইয়া রহিলেন।

মঘবা বলিলেন, রাত্রি হইয়াছে, বিবাহের সময় উপস্থিত। তুই এবার গিয়া বধূকে লইয়া আয়।'

প্রদ্যুম্ন ধীরে ধীরে মঘবার দিকে ফিরিলেন, গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন, 'সেনাপতি মঘবা।'

মঘবা ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া গেলেন। রাজা হওয়ার অভ্যাস তাঁহার প্রাণে এমনই বসিয়া গিয়াছিল যে, প্রথমটা কিছু বুঝিতেই পারিলেন না। তারপর প্রদ্যুম্নের দৃষ্টি অনুসরণ করিতেই চাঁদের প্রতি চক্ষু পড়িল।

আকাশ নির্মেঘ, কিন্তু চন্দ্রের শুভ্র মুখের উপর ধূম্রবর্ণ ছায়া পড়িয়াছে। করাল ছায়া ধীরে ধীরে গ্রাস করিবার উপক্রম করিতেছে।

প্রদ্যুম্ন বলিলেন, 'সেনাপতি মঘবা, আমি বধূকে আনিতে যাইতেছি; সন্ধির শর্ত রক্ষার জন্য আমিই তাহাকে বিবাহ করিব। ইতিমধ্যে তুমি প্রজামণ্ডলকে ব্যাপারটা বুঝাইয়া দাও।'

মঘবা কিয়ৎকাল স্তম্ভের মত নিশ্চল হইয়া রহিলেন। তারপর তাঁহার প্রচণ্ড অট্টাহাস্যে আকাশ বিদীর্ণ হইয়া গেল।

সহসা হাস্য থামাইয়া মঘবা করজোড়ে বলিলেন, 'যে আজ্ঞা মহারাজ।'

এলা বাতায়নের পাশে বসিয়া ছিল, প্রদ্যুম্ন প্রবেশ করিতেই উঠিয়া দাঁড়াইল।

'আমাকে লইতে আসিয়াছ?'

'হ্যাঁ. রাজকুমারী। কোদণ্ডদের সহিত আমাদের সন্ধি হইয়াছে; তাহার শর্ত এই যে আর্যরাজা কোদণ্ড-কন্যাকে বিবাহ করিবেন। আমরা ধর্মত এই শর্ত পালন করিতে বাধ্য।'

'আর কিছু বলিবার আছে?'

'সামান্য। ঘটনাক্রমে আমি এখন আর্যরাজা, মঘবা আমার সেনাপতি। সুতরাং বিবাহ করিতে হইলে আমাকেই বিবাহ করিতে হইবে।'

এলা দীর্ঘকাল বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া স্থির রহিল; শেষে ক্ষীণকণ্ঠে উচ্চারণ করিল, 'কি বলিলে?'

প্রদ্যুম্ন রাজকীয় গাম্ভীর্যের সহিত বলিলেন, 'আমাকে বিবাহ করিতে হইবে। এখন চট্ করিয়া স্থির করিয়া ফেল. বিবাহ করিবে, না বীজ ভক্ষণ করিবে।'

স্বপ্নের অবরুদ্ধ আকুলতা এতক্ষণে বন্যার মত নামিয়া আসিল, দলিতাঞ্জন চক্ষু দুইটি ছাপাইয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

প্রদ্যুম্ন বাতায়নের উপর উঠিয়া বসিয়া রহিলেন, 'গ্রহণ ছাড়িতে এখনও বিলম্ব আছে। ততক্ষণ তোমাকে বিবেচনা করিবার সময় দিলাম।'

বর্ষণের ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ-চমকের মত হাসি হাসিয়া এলা বলিল, 'বর্বর।'

সেতু

হঠাৎ সদ্যোজাত শিশুকণ্ঠের কান্নার শব্দে ঘুম ভাঙিয়া গেল। পাশের ঘর হইতে কে যেন জলদমন্দ্র স্বরে বলিল, 'লিখে রাখ, ৩রা চৈত্র রাত্রি ১টা ১৭ মিনিটে জন্ম'...

রাত্রে এক স্বপ্ন দেখিয়াছি। কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছি না; এত স্পষ্ট, এত অদ্ভুত। আমার সমস্ত চেতনাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। অহিদত্ত রঞ্জুল, বৃদ্ধ অসিধারক তন্ডু, লালসাময়ী রল্লা—

এ কি স্বপ্ন? না আমারই মগ্নচৈতন্যের স্মৃতিকন্দর হইতে বাহির হইয়া আসিল আমার পূর্বতন জীবনের ইতিবৃত্ত? পূর্বতন জীবন বলিয়া কিছু কি আছে? মৃত্যু হয় জানি, কিন্তু সেইখানেই তো সব শেষ। আবার সেই শেষটাকে শুরু ধরিয়া নূতন কোনও জীবন আরম্ভ হয় নাকি?

আমার স্বপ্নটা যেন তাহারই ইঙ্গিত দিয়া গেল। একটা মানুষের জীবন—সে মানুষটা কি আমি?—উল্টা দিক দিয়া দেখিতে পাইলাম, এক মৃত্যু হইতে অন্য জন্ম পর্যন্ত। বীজ হইতে অঙ্কুর, অঙ্কুর হইতে ফুল ফল আবার বীজ—ইহাই জীব-জগতের পূর্ণ চক্র। কিন্তু এই চক্র পরিপূর্ণ ভাবে আমাদের দৃশ্যমান নয় মাঝখানে, চক্রাংশ খানিকটা অব্যক্ত—। মৃত্যুর পর আবার জন্ম—মাঝ দিয়া বিস্মরণের বৈতরণী বহিয়া গিয়াছে। আমার স্বপ্ন যেন সেই বৈতরণীর উপর সেতু বাঁধিয়া দিল।

সত্যই কি সেতু আছে? আমি বৈজ্ঞানিক. অলীক কল্পনার ধার ধারি না। আলোকরশ্মি ঋজু রেখায় চলে কি না, এই বিষয় লইয়া গত তিন বৎসর গবেষণা করিতেছি। কঠিন পরিশ্রম করিতে হইয়াছে; কিন্তু শেষ পর্যন্ত বোধ হয় সত্য সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি। কাল আমার কাজ শেষ হইয়াছে। হাল্কা মন ও হাল্কা মস্তিষ্ক লইয়া শয়ন করিতে গিয়াছিলাম। তারপর ঐ স্বপ্ন! ভাবিতেছি, এ স্বপ্ন যদি অলীক কল্পনাই হয়, তবে সে এই সকল অদ্ভুত উপাদান সংগ্রহ করিল কোথা হইতে? আমার জাগ্রত চেতনার মধ্যে তো এ সকল অভিজ্ঞতা ছিল না! কল্পনা কি কেবল শূন্যকে আশ্রয় করিয়া পল্লবিত হয়? রক্তের মধ্যে সামান্য একটু কার্বন-ডায়ক্সাইডের আধিক্য কি নিরবয়ব নাস্তি'কে মূর্ত বাস্তব করিয়া তুলিতে পারে?

জানি না। আমার যুক্তি-বিধিবদ্ধ বুদ্ধি এই স্বপ্নের আঘাতে বিপর্যস্ত হইয়া গিয়াছে?

যে শিশু কাঁদিয়া উঠিল, সে কে? আমি? আর সেই জলদমন্দ্র কণ্ঠস্বর!—পুরাতন ডায়েরি খুলিয়া দেখিতেছি, ৩৫ বৎসর পূর্বে ৩রা চৈত্র রাত্রি ১টা ১৭ মিনিটে আমার জন্ম হইয়াছিল।

* * * *

দেখিতেছি, আমার সম্মুখে অত্যুজ্জ্বল অঙ্গার-পিণ্ড জ্বলিতেছে! বৃহৎ অঙ্গার-চুল্লী, ভস্ত্রার ফুৎকারে উগ্র নির্ধূম প্রভায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছে, আবার ভস্ত্রার বিরামকালে অপেক্ষাকৃত নিস্তেজ রক্তিমবর্ণ ধারণ করিতেছে। এই অগ্নির মধ্যস্থলে প্রোথিত রহিয়াছে আমার অসি-ফলক।

কক্ষ ঈষদন্ধকার, চারিদিকে নানা আকৃতির লৌহ-ফলক বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। কোনটি খড়্গের আকার ধারণ করিতে সহসা থামিয়া গিয়াছে; কোনটি দণ্ডের আকারে শূল অথবা মুদ্গরে পরিণত হইবার আশায় অপেক্ষা করিতেছে। প্রাচীর-গাত্রে সুসম্পূর্ণ ভল্ল অসি লৌহজালিক সজ্জিত রহিয়াছে। অঙ্গার-পিণ্ডের আলোকে ইহারা ঝলসিয়া উঠিতেছে, পুনরায় ম্লান অস্পষ্ট হইয়া যাইতেছে।

এই দৃশ্য দেখিতে দেখিতে স্বপ্নালোকে জাগিয়া উঠিলাম। জ্বলন্ত চুল্লীর অদূরে বেত্রাসনে বসিয়া আমি করলগ্ন কপোলে দেখিতেছি, আর অসিধাবক তণ্ডু অগ্নির সম্মুখে বসিয়া ভস্ত্রা চালাইতেছে।

এই দৃশ্য আমার কাছে একান্ত পরিচিত, তাই বিস্মিত হইতেছি না। চেতনার মধ্যে ইহার সমস্ত পূর্ব-সংযোগ নিষ্ক্রিয়ভাবে সঞ্চিত রহিয়াছে। এই ছায়ান্ধকার কক্ষটি উজ্জয়িনীর প্রসিদ্ধ বস্ত্র-শিল্পী তণ্ডুর যন্ত্রাগার। আমি দক্ষিণ মণ্ডলে উপনিবিষ্ট, শকবাহিনীর একজন পত্তিনায়ক—আমার নাম অহিদত্ত রঞ্জুল। আমি তণ্ডুর যন্ত্রাগারে বসিয়া আছি কেন? অসি সংস্কার করিবার জন্য? তণ্ডুর মত এত বড় অসি-শিল্পী শুনিয়াছি শকমণ্ডলে আর নাই, সে অসিতে এমন ধার দিতে পারে যে, নিপুণ শস্ত্রী তাহার দ্বারা আকাশে ভাসমান কাশ-পুষ্পকে দ্বিখণ্ডিত করিতে পারে। কিন্তু এইজন্যই কি গত বসন্তোৎসবের পর হইতে বার বার তাহার গৃহে আসিতেছি?

চুল্লীর আলোকে তণ্ডুল মুখের প্রত্যেক রেখাটি দেখিতে পাইতেছি। শীর্ণ, রক্তহীন মুখ; গুম্ফ ও ভ্রূর রোম চুল্লীর দাহে দগ্ধ হইয়া গিয়াছে, গণ্ডের চর্ম

কুঞ্চিত হইয়া হনু-অস্থিকে প্রকট করিয়া তুলিয়াছে। ললাটের দুই প্রান্ত নিম্ন। অস্থির বক্র নাসিকা এই জরাবিধ্বস্ত মুখের চর্মাবরণ ভেদ করিয়া বাহির হইবার প্রয়াস করিতেছে। মুখখানা দেখিলে মনে হয় মৃতের মুখ, শুধু সেই মৃত মুখের মধ্যে কোটরপ্রবিষ্ট চক্ষু দুইটা অস্বাভাবিকরকম জীবিত,—ভগ্নমেরু মুমূর্ষু সর্পের চক্ষুর মত যেন একটা বিষাক্ত জিঘাংসা বিকীর্ণ করিতেছে।

তণ্ডু যন্ত্রচালিতের মত কাজ করিতেছে। আমার অসি ফলক অঙ্গার হইতে বাহির করিয়া রসায়ন-মিশ্র জলে ডুবাইতেছে, সন্তর্পণে ফলকের ধার পরীক্ষা করিতেছে, আবার তাহা অঙ্গার মধ্যে প্রোথিত করিতেছে। তাহার মুখে কথা নাই, কখনও সেই সর্পচক্ষু আমার দিকে ফিরাইয়া অতর্কিতে আমাকে দেখিয়া লইতেছে, তাহার পীত-দন্ত-মুখ ঈষৎ বিভক্ত হইয়া যাইতেছে, অধরোষ্ঠ একটু নড়িতেছে—যেন সে নিজ মনে কথা কহিল—তারপর আবার কর্মে মন দিতেছে।

আমিও তাহার পানে চাহিয়া বসিয়া আছি, কিন্তু আমার মন তাহাকে দেখিতেছে না। মন দেখিতেছে—কাহাকে?—রল্লা। লালসাময়ী কুহকিনী রল্লা! আমার ঐ উত্তপ্ত অসি-ফলকের ন্যায় কামনার শিখারূপিণী রল্লা!

একটা তীক্ষ্ন বেদনা সূচীর মত হৃদয়যন্ত্রকে বিদ্ধ করিল। তণ্ডুর দেহ ভাল করিয়া আপাদমস্তক দেখিলাম। এই জরাগলিত দেহ বৃদ্ধ রল্লার ভর্তা। রল্লা আর তণ্ডু! বুকের মধ্যে একটা ঈর্ষা-ফেনিল হাসি তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিল—ইহাদের দাম্পত্য জীবন কিরূপ? নিজের দেহের দিকে দৃষ্টি ফিরাইলাম। বক্ষে বাহুতে উদ্ধত পেশী আস্ফালন করিতেছে—পঁচিশ বৎসরের দর্পিত যৌবন। তপ্ত শক-রক্ত যেন শুভ্র চর্ম ফাটিয়া বাহির হইতে চাহিতেছে। আমি লোলুপ চোরের মত নানা ছলে তণ্ডুর গৃহে যাতায়াত করিতেছি, আর তণ্ডু—রল্লার স্বামী!

রল্লা কি কুহক জানে? নারী তো অনেক দেখিয়াছি,—তীব্রনয়না গর্বিতা শক-দুহিতা, মদালসনেত্রা স্ফুরিতাধরা, অবন্তিকা, বিলাসভঙ্গিমগতি রতিকুশলা হাস্যময়ী লাট-ললনা। কিন্তু রল্লা—রল্লার জাতি নাই। তাহার তাম্রকাঞ্চন দেহে নারীত্ব ছাড়া আর কিছু নাই। সে নারী। আমার সমস্ত সত্তাকে সে তাহার নারীত্বের কুহকে জয় করিয়াছে।

একবার মাত্র তাহাকে দেখিয়াছি, মদনোৎসবের কুঙ্কুম-অরুণিত সায়াহ্নে। উজ্জয়িনীর নগর-উদ্যানে মদনোৎসবে যোগ দিয়াছিলাম। একদিনের জন্য প্রবীণতার শাসন শিথিল হইয়া গিয়াছে। অবরোধ নাই, অবগুণ্ঠন নাই—লজ্জা নাই। যৌবনের মহোৎসব, উদ্যানের গাছে গাছে হিন্দোলা দুলিতেছে, গুল্মে গুল্মে চটুলচরণা নাগরিকার মঞ্জীর বাজিতেছে, অসম্বৃত অঞ্চল উড়িতেছে, আসব-তরুণ নেত্র ঢুলুঢুলু হইয়া নিমীলিত হইয়া আসিতেছে, কলহাস্য করিয়া কুঙ্কুমপ্রলিপ্তদেহা নাগরী এক তরুগুল্ম হইতে গুল্মান্তরে ছুটিয়া পলাইতেছে, মধ্যপথে থমকিয়া দাঁড়াইয়া পিছু ফিরিয়া দেখিতেছে, আবার পলাইতেছে। পশ্চাতে পুষ্পের ক্রীড়াধনু হস্তে শবরবেশী নায়ক তাহার অনুসরণ করিতেছে। নিভৃত লতানিকুঞ্জে প্রণয়ী মিথুন কানে কানে কথা কহিতেছে। কোনও মৃগনয়না বিভ্রমচ্ছলে নিজ চক্ষু মার্জনা করিয়া কহিতেছে—তুমি আমার চক্ষে কুঙ্কুম দিয়াছ! প্রণয়ী তরুণ সযত্নে তাহার চিবুক ধরিয়া তুলিয়া অরুণাভ নয়নের মধ্যে দৃষ্টি প্রেরণ করিতেছে, তারপর ফুৎকার দিবার

ছলে গূঢ়-হাস্যমুকুলিত রক্তাধর সহসা চুম্বন করিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে মিলিত কণ্ঠের হাস্য-লতামণ্ডপের সুগন্ধি বায়ুতে শিহরণ তুলিতেছে।

শত শত নাগর নাগরিকা এইরূপ প্রমোদে মত্ত—নিজের সুখে সকলেই নিমজ্জিত, অন্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবার অবসর নাই। যৌবন চঞ্চল—বসন্ত ক্ষণস্থায়ী; এই স্বল্পকাল মধ্যে বৎসরের আনন্দ ভরিয়া লইতে হইবে। বৃহৎ কিংশুক বৃক্ষমূলে বেদীর উপর স্নিগ্ধ সুরভিত আসব বিক্রয় হইতেছে—পৈষ্ঠী গৌড়ী মাধ্বক—নাগরিক নাগরিকা নির্বিচারে তাহা পান করিতেছে; অবসন্ন উদ্দীপনাকে প্রজ্বলিত করিয়া আবার উৎসবে মাতিতেছে। কঙ্কণ, নূপুর, কেয়ূরের ঝনৎকার, মাদলের নিক্কণ, লাস্য-আবর্তিত নিচোলের বর্ণচ্ছটা, স্খলিত কণ্ঠের হাস্য-বিজড়িত সঙ্গীত;—নির্লজ্জ উন্মুক্তভাবে কন্দর্পের পূজা চলিয়াছে।

নগর-উপবনের বীথিপথে আমি একাকী ইতস্তত ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম। মনের মধ্যে একটা নির্লিপ্ত সুখাবেশ ক্রীড়া করিতেছিল। এইসব রসোন্মত্ত নরনারী—ইহারা যেন নট-নটী; আমি দর্শক। সুরাপান করিয়াছিলাম, কিন্তু অধিক নয়। বসন্তের লঘু-আতপ্ত বাতাসের স্পর্শে বারুণী-জনিত উল্লাস যেন আমার চিত্তকে আত্মসুখলিপ্সার ঊর্ধ্বে ভাসাইয়া লইয়া চলিয়াছিল। চারিদিকে অধীর আনন্দবিহ্বলতা দেখিতেছিলাম ? মনে আনন্দের স্পর্শ লাগিতেছিল, আপনা আপনি উচ্চকণ্ঠে হাসিতেছিলাম কিন্তু তবু এই ফেনোচ্ছল নর্ম-স্রোতে ঝাঁপাইয়া পড়িতে পারিতেছিলাম না। আমি সৈনিক, নাগরিক সাধারণ আমাকে কেহ চিনে না; তাই অপরিচয়ের সঙ্কোচও ছিল; উপরন্তু এই অপরূপ মধু-বাসরে বোধ করি নিজের অজ্ঞাতসারেই গাঢ়তর রসোপলব্ধির আকাঙ্ক্ষা করিতেছিলাম।

উপবনের মধ্যস্থলে কন্দর্পের মর্মর-দেউল। স্মরবীথিকারা দেউল ঘিরিয়া নৃত্য করিতেছে, বাহুতে বাহু শৃঙ্খলিত করিয়া লীলায়িত ভঙ্গিমায় উপাস্য দেবতার অর্চনা করিতেছে। তাহাদের স্বল্পবাস দেহের মদালস গতির সঙ্গে সঙ্গে বেণী-বিসর্পিত কুন্তল দুলিতেছে, চপল মেখলা নাচিতেছে। চোখে চোখে মদসিক্ত হাসির গূঢ় ইঙ্গিত, বিদ্যুৎস্ফুরণের ন্যায় অতর্কিত ভ্রূবিলাস, যেন মদন পূজার উপচাররূপে উৎসৃষ্ট হইতেছে।

আমি তাহাদের মধ্যে গিয়া দাঁড়াইলাম। পুষ্পধন্বা মদনবিগ্রহকে প্রণাম করিয়া মদনের কিঙ্করীদের প্রতি সহাস্য দৃষ্টি ফিরাইলাম। আমাকে দেখিয়া তাহাদের নৃত্য বন্ধ হইল, তাহারা পুষ্প-শৃঙ্খলের মত আমাকে আবেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল। তারপর তাহাদের মধ্যে একটি বিম্বাধরা যুবতী দ্বিধা-মন্থর পদে আমার সম্মুখে আসিল। আমার মুখের পানে চাহিয়া সে চক্ষু নত করিল, তারপর আবার চক্ষু তুলিয়া একটি চম্পক-অঙ্গুলি দিয়া আমার উন্মুক্ত বক্ষ স্পর্শ করিল। দেখিলাম, তাহার কালো নয়নে কোন অজ্ঞাত আকাঙ্ক্ষার ছায়া পড়িয়াছে।

আমি কৌতুকভরে আমার কুঞ্চিত কেশ-বন্ধন হইতে একটি অশোক-পুষ্প লইয়া তাহার চূড়া-পাশে পরাইয়া দিলাম,—তারপর হাসিতে হাসিতে নগর বধূদের বাহুরচিত নিগড় ভিন্ন করিয়া প্রস্থান করিলাম।

ক্ষণকালের জন্য সকলেই মূক হইয়া রহিল। তারপর আমার পশ্চাতে বহু কলকণ্ঠের হাস্য বিচ্ছুরিত হইয়া উঠিল। আমিও হাসিলাম, কিন্তু পিছু ফিরিয়া

দেখিলাম না।

ক্রমে দিবা নিঃশেষ হইয়া আসিল। পশ্চিম গগনে আবীর-কুঙ্কুমের খেলা আরম্ভ হইল। দিগ্বধূরাও যেন মদনমহোৎসবে মাতিয়াছে।

উদ্যানের এক প্রান্তে একটি মাধবী-বিতানতলে প্রস্তরবেদীর উপর গিয়া বসিলাম। স্থান নির্জন; অদূরে একটি কৃত্রিম প্রস্রবণ হইতে বৃত্তাকার আকারে জল ঝরিয়া পড়িতেছে। মণি-মেখলাধৃত জলরাশি সায়াহ্নের স্বর্ণাভ আলোকে টলমল করিতেছে, কখনও রবিরশ্মিবিদ্ধ চূর্ণ জলকণা ইন্দ্রধনুর বর্ণ বিকীর্ণ করিতেছে। যেন সুন্দরী রমণীর অধীর চঞ্চল যৌবন।

আলস্যস্তিমিত অন্যমনে আলোকের এই জলক্রীড়া দেখিতেছি, এমন সময় সহসা একটি কুঙ্কুম-গোলক আমার বক্ষে আসিয়া লাগিল; অভ্র-আবরণ ফাটিয়া সুগন্ধি-চূর্ণ দেহে লিপ্ত হইল। সচকিতে মুখ তুলিয়া দেখিলাম, একটি নারী লতাবিতানের দ্বারে দাঁড়াইয়া আছে।

তাহাকে দেখিয়া ক্ষণকালের জন্য রুদ্ধ বাক্ হইয়া গেলাম, বোধ করি হৃদযন্ত্রের স্পন্দনও কয়েক মুহূর্তের জন্য থামিয়া গেল। তারপর হৃদয় উন্মত্তবেগে আবার স্পন্দিত হইতে লাগিল। চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম। বিস্ফারিত নেত্র তাহার দেহের উপর নিবদ্ধ রাখিয়া তাহার সম্মুখীন হইলাম।

তাম্রকাঞ্চনবর্ণা লোলযৌবনা তন্বী কবরীতে মল্লীমুকুলের মালা জড়িত, মুখে চূর্ণ মনঃশিলার প্রলেপ, কিংশুক-ফুল্ল ওষ্ঠাধর হইতে যেন রতি-মাদকতার মধু ক্ষরিয়া পড়িতেছে। কর্ণে কর্ণিকার কলি গন্ডের উত্তাপে ম্লান হইয়া গিয়াছে। পত্রলেখা-চিত্রিত উরসে লতাজালের ন্যায় সূক্ষ্ম কঞ্চুকী, তদুপরি স্বচ্ছতর উত্তরীয় যেন কাশ্মীরবর্ণ কুহেলী দ্বারা অপূর্ণ চন্দ্রকলাকে আচ্ছাদন করিয়া রাখিয়াছে। নাভিতটে আকুঞ্চিত নিচোল, চরণ দু'টি লাক্ষারসনিষিক্ত।

এই বিমোহিনী মূর্তি কুটিল অপাঙ্গে চাহিয়া নিঃশব্দে মৃদু মৃদু হাসিতেছে। তাহাকে আপাদমস্তক দেখিয়া আমার বুকের মধ্যে ভয়ের মত একটা অনুভূতি দুরুদুরু করিতে লাগিল। সহসা আমার এ কি হইল? এই তো কিছুকাল পূর্বে মদন-পূজারিণীদের নীরব সঙ্কেত হাসিমুখে উপেক্ষা করিয়া আসিয়াছি। কিন্তু এখন?

অবরুদ্ধ অস্পষ্ট স্বরে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তুমি কে?'

তাহার অধরোষ্ঠ ঈষৎ বিভক্ত হইল, দংশন পংক্তিতে বিজলী খেলিয়া গেল। বঙ্কিম কটাক্ষে ভ্রূ-ধনু বিলসিত করিয়া সে বলিল, 'আমি রল্লা।'

রল্লা! তাহার কণ্ঠস্বর ও নামোচ্চারণের ভঙ্গিতে আমার দেহে তীব্র বেদনার মত একটা নিপীড়ন অনুভব করিলাম। আমি তাহার দিকে আর এক পদ অগ্রসর হইয়া গেলাম। ইচ্ছা হইল—কি ইচ্ছা হইল জানি না। হাসিতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু হাসি আসিল না।

মদনোৎসবে অপরিচিত তরুণ-তরুণীর সাক্ষাৎকার ঘটিলে তাহারা কি করে? হাসিয়া পরস্পরের দেহে কুঙ্কুম নিক্ষেপ করে, দুই-চারিটা রঙ্গ-কৌতুকের কথা বলে, তারপর নিজ পথে চলিয়া যায়। কিন্তু আমি—মূঢ় গ্রাম্যিকের মত তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিলাম। শেষে আবার প্রশ্ন করিলাম, 'কে তুমি?'

এবার সে ভঙ্গুর কণ্ঠে কৌতুক ভরিয়া হাসিল, হাসিতে হাসিতে বেদীর উপর

আসিয়া বসিল, অধর, নয়ন এবং ভ্রূর একটি অপূর্ব চটুল ভঙ্গিমা করিয়া বলিল, দেখিয়াও বুঝিতে পারিতেছ না ? আমি নারী।'

কথাগুলি যেন দৈহিক আঘাতের মত আমার বুকে আসিয়া লাগিল। নারী—হাঁ নারীই বটে। ইহা ভিন্ন তাহার অন্য পরিচয় নাই। পুরুষের অন্তর-গুহায় যে অনির্বাণ নারী-ক্ষুধা জ্বলিতেছে, এই নারী বুঝি তাহাতে পূর্ণাহুতি দান করিতে পারে।

তারপর কতক্ষণ এই লতাবিতানতলে কাটিয়া গেল জানি না। রল্লার লালসাময় যৌবনশ্রী, তাহার মাদক দেহসৌরভ অগ্নিময় সুরার মত আমার রক্তে সঞ্চারিত হইল। আমি উন্মত্ত হইয়া গেলাম। কিন্তু তবু—তাহাকে ধরিতে পারিলাম না। ধনুকের গুণ যেমন বাণকে নিজ বক্ষে টানিয়া লইয়াই দূরে নিক্ষেপ করে, রল্লা, তেমনি তাহার দেহের কুহকে বার বার আমাকে কাছে টানিয়া আবার দূরে ঠেলিয়া দিল। আমি তাহাকে স্পর্শ করিতে গেলাম, সে চপল চরণে সরিয়া গেল—

বলিল, 'তুমি বুঝি ব্যাধ ? কিন্তু সুন্দর ব্যাধ, বল হরিণকে কি এত শীঘ্র ধরা যায় ?'

তপ্তস্বরে বলিলাম, 'আমি ব্যাধ নই, তুমি নিষ্ঠুরা শবরী—আমাকে বধ করিয়াছ ? তবু কাছে আসিতেছ না কেন ?'

এবার সে কাছে আসিল। আমার স্পন্দমান বক্ষের উপর একটি উষ্ণ রক্তিম করতল রাখিয়া ছদ্ম গাম্ভীর্যে বলিল, 'দেখি।' তারপর যেন ত্রস্তভাবে দ্রুত সরিয়া গিয়া কহিল, 'কই, বধ করিতে তো পারি নাই! বোধহয় সামান্য আহত হইয়াছ মাত্র। তোমার কাছে যাইব না, শুনিয়াছি আহত ব্যাঘ্রের নিকটে যাইতে নাই।'

এই চটুলতার সম্মুখে আমি ব্যর্থ হইয়া রহিলাম।

তখন সে আবার আমার কাছে আসিল। কজ্জল-দূষিত চক্ষে আমার সর্বাঙ্গ লেহন করিয়া একটা অর্ধ-নিশ্বাস ত্যাগ করিল। অস্ফুট স্বরে কহিল, 'তুমি বোধহয় ছদ্মবেশী কন্দর্প !'

আমি তাহার দুই বাহু চাপিয়া ধরিলাম। শরীরের ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ শিহরিয়া গেল। তাহাকে নিজের দিকে আকর্ষণ করিয়া গাঢ় স্বরে বলিলাম, 'রল্লা—'

এই সময় যেন আমার কথার প্রতিধ্বনি করিয়া লতাবিতানের বাহিরে কিয়দ্দূরে কর্কশ কণ্ঠে আহ্বান আসিল, 'রল্লা—। রল্লা—!'

উৎকণ্ঠ হইয়া রল্লা শুনিল, তারপর হাত ছাড়াইয়া লইল। আমার মুখের দিকে এক অদ্ভুত হাসি তাহার কিংশুকফুল্ল অধরে খেলিয়া গেল। সে বলিল, 'আমার মদনোৎসব শেষ হইয়াছে। আমি গৃহে চলিলাম !'

'গৃহে চলিলে! যে ডাকিল, সে কে ?'

রল্লা আবার নিদাঘ-বিদ্যুতের মত হাসিল, 'আমার ভর্তা।'

অকস্মাৎ মুদ্গরাঘাতের মত প্রচণ্ড আঘাত পাইয়া যেন বিমূঢ় হইয়া গেলাম—'ভর্তা!'

রল্লা লতাবিতানের দ্বারের দিকে চলিল। যাইতে যাইতে গ্রীবা ফিরাইয়া বলিল, 'আমার ভর্তাকে দেখিবে ? লতার অন্তরালে লুকাইয়া দেখিতে পার। তীক্ষ্ম বঙ্কিম

হাসির রল্লা সহসা অদৃশ্য হইয়া গেল।

মূঢ়বৎ কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলাম ; তারপর লতামণ্ডপের পত্রান্তরাল সরাইয়া বাহিরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম।

রল্লা আর তণ্ডু মুখোমুখী দাঁড়াইয়া আছে। বৃদ্ধা তন্ডুর সর্পচক্ষু সন্দেহে প্রখর ; রল্লার রক্তাধরে বিচিত্র হাসি।

তণ্ডু কর্কশ কণ্ঠে বলিল, 'উৎসব শেষ হইয়াছে, গৃহে চল।'

রল্লা ক্লান্তি বিজড়িত ভঙ্গীতে দুই বাহু ঊর্ধ্বে তুলিয়া দেহের আলস্য দূর করিল, তারপর বৃদ্ধকে বলিল, 'চল।'

তণ্ডু একবার লতাবিতানের দিকে কুটিল দৃষ্টিপাত করিল, একবার যেন একটু দ্বিধা করিল, তারপর বৃদ্ধ ভল্লুকের মত বিপরীত মুখে চলিতে আরম্ভ করিল। রল্লা মন্থর পদে, পশ্চাতে চলিল।

যাইতে যাইতে রল্লা একবার নিজের কবরীতে হাত দিল ; কবরী হইতে একটি রক্ত কুরুবক খসিয়া মাটিতে পড়িল।

আমি বাহিরে আসিয়া কুরুবকটি তুলিয়া লইলাম। রল্লা তখন দূরে চলিয়া গিয়াছে, দূর হইতে ফিরিয়া চাহিল। প্রদোষের ছায়াম্লান অলোকে যেন তাহার সর্বাঙ্গ নিঃশব্দ সংকেত করিয়া আমাকে ডাকিল।

আমি দূরে থাকিয়া তাহার অনুসরণ করিলাম। জনাকীর্ণ নগরীর বহু সংকীর্ণ পথ অতিক্রম করিয়া অবশেষে রল্লা নগরপ্রান্তে এক দীন গৃহের অভ্যন্তরে অদৃশ্য হইয়া গেল। দেখিলাম, গৃহের প্রাচীরে দুইটি অসি চিত্রিত রহিয়াছে।

তারপর নানা ছুতা করিয়া অসিধাবক তণ্ডুর গৃহে আসিয়াছি। অধীর দুর্নিবার অন্তরে স্থির হইয়া বসিয়া সুযোগের প্রতীক্ষা করিয়াছি। তুণ্ডুর যন্ত্রাগারের পশ্চাতে তাহার বাসগৃহে ; সেখানে রল্লা আছে, দূর হইতে ক্বচিৎ তাহার নূপুরশিঞ্জন শুনিয়া চমকিয়া উঠিয়াছি ; চোখে মুখে উগ্র কামনা হয়তো প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। তণ্ডু কুটিল বক্র কটাক্ষে আমাকে নিরীক্ষণ করিয়াছে। কিন্তু রল্লাকে দেখিতে পাই নাই—একটা তুচ্ছ সংকেত পর্যন্ত না।

তণ্ডুর কর্কশ নীরস কণ্ঠস্বরে স্মৃতিতন্দ্রা ভাঙিয়া গেল। সচেতন হইয়া দেখিলাম, সে শীর্ণ অঙ্গুলির প্রান্তে আমার অসির ধার পরীক্ষা করিতেছে, আর কেশহীন ভ্রূ উত্থিত করিয়া শুষ্ক স্বরে কহিতেছে, 'অসির ধার আর বনিতার লজ্জা পরের জন্য, কি বলেন পত্তি-নায়ক?'

বলিলাম, 'অসির ধার বটে। বনিতার লজ্জার কথা বলিতে পারি না, আমি অনূঢ়!'

'আমি বলিতে পারি, আমি, অনূঢ় নহি—হা-হা—' তণ্ডুর ওষ্ঠাধর তৃষ্ণার্ত বায়সের মত বিভক্ত হইয়া গেল—'কিন্তু আপনি যদি অনূঢ়, তবে এত তন্ময় হইয়া কাহার ধ্যান করিতেছিলেন? পরস্ত্রীর?'

আকস্মিক প্রশ্নে নির্বাক হইয়া গেলাম, সহসা উত্তর জোগাইল না। তণ্ডু কি সত্যই আমার মনের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়াছে? আত্মসম্বরণ করিয়া তাচ্ছিল্যভরে বলিলাম, 'কাহারও ধ্যান করি না নাই, তোমার শিল্পনৈপুণ্য দেখিতেছিলাম।'

বিকৃত হাস্য করিয়া তণ্ডু পুনশ্চ অসি অঙ্গার মধ্যে প্রোথিত করিল, বলিল, 'অহিদত্ত রঞ্জুল, আপনি সুন্দর যুবাপুরুষ, এই দীন অসিধাবকের কারুনৈপুণ্য দেখিয়া আপনার কি লাভ হইবে? বরং নগর-উদ্যানে গমন করুন, সেখানে বহু রসিকা নগর-নায়িকার কলা-নৈপুণ্য উপভোগ করিতে পারিবেন।'

আমার মনে একটু ক্রোধের সঞ্চার হইল। এই হীনজাত বৃদ্ধ আমাকে ব্যঙ্গ করিতেছে। ঈষৎ রুক্ষ স্বরে বলিলাম, 'আমি কোথায় যাইব না-যাইব তাহা আমার ইচ্ছাধীন। তুমি সেজন্য ব্যস্ত হইও না।'

তণ্ডু আমার পানে একটা চকিত-গুপ্ত চাহনি হানিয়া আবার কার্যে মন দিল।

কিয়ৎকাল পরে বলিল, 'ভাল কথা, পত্তি-নায়ক, আপনি তো যোদ্ধা; শত্রুর উপর অসির ধার নিশ্চয় পরীক্ষা করিয়াছেন?'

গম্ভীর হাসিয়া বলিলাম, 'তা করিয়াছি। দুই বৎসর পূর্বে দেবপাদ বাসুদেব কণিষ্ক যখন তোমাদের উজ্জয়িনী নগর অধিকার করেন তখন নাগরিক কণ্ঠে আমার অসির ধার পরীক্ষা করিয়াছি।'

তণ্ডুর চক্ষু দুটা ক্ষণেক আমার মুখের উপর নিষ্পলক হইয়া রহিল। তারপর শীতকারের মত স্বর তাহার কণ্ঠ হইতে বাহির হইল, 'পত্তি-নায়ক, আপনি বীর বটে। কিন্তু সেজন্য কৃতিত্ব কাহার?'

'কাহার?'

'আমার—এই হীনজন্মা অসিধাবকের। কে আপনার অসিতে ধার দিয়াছে? আমারই মার্জিত অস্ত্রের সাহায্যে আপনারা আমার ভ্রাতাপুত্রকে হত্যা করিয়াছেন, স্ত্রী-কন্যাকে অরহরণ করিয়াছেন।'

আমার মুখ উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। বলিলাম, 'শক-জাতি বর্বর নয়। তাহারা যুদ্ধ করিয়াছে, কিন্তু নারীহরণ কদাপি করে নাই।'

তণ্ডু কণ্ঠে খলতার বিষ মিশাইয়া বলিল, 'বটে! তবে বোধ হয় শকজাতি পরস্ত্রীকে চুরি করিতেই পটু।'

ক্রোধের শিখা আমার মাথায় জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তণ্ডুর অভিপ্রায়ও বুঝিতে পারিলাম; সে আমার সহিত কলহ করিতে চাহে—যাহাতে আমি আর না আসি। রল্লার লালসায় আমি তাহার গৃহে আসি— ইহা সে বুঝিয়াছে। কিন্তু বুঝিল কি করিয়া?

কষ্টে ক্রোধ দমন করিয়া বলিলাম,—'তণ্ডু, তুমি বৃদ্ধ, তোমার সহিত বাগ্‌-বিতণ্ডা করিতে চাহি না। আমার অসি যদি তৈয়ার হইয়া থাকে, দাও।'

সে অসি জলে ডুবাইয়া আবার অঙ্গুলির সাহায্যে ধার পরীক্ষা করিল। বলিল, অসি তৈয়ারী হইয়াছে।'

তণ্ডুর সহিত কলহ করিয়া আমার লাভ নাই। তাহাকে তুষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে আমি পাঁচটি স্বর্ণমুদ্রা তাহার সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া বলিলাম, 'এই লও পঞ্চ নাণক—তোমার পুরস্কার।

তণ্ডুর চক্ষু সহসা তাহার অঙ্গারকুণ্ডের মতই জ্বলিয়া উঠিয়া আবার নিবিয়া গেল। সে চেষ্টাকৃত ধীর স্বরে বলিল, আমায় পরিশ্রমের মূল্যে এক নাণক মাত্র। বাকি চার নাণক আপনি রাখুন, অন্যত্র প্রমোদ ক্রয় করিতে পারিবেন!—কিন্তু অসির

ধার পরীক্ষা করিবেন না ?'

উদ্গত ক্রোধ গলাধঃকরণ করিয়া আমি বলিলাম, 'করিব দাও।' বলিয়া হাত বাড়াইলাম।

তণ্ডু কিন্তু অসি দিবার কোনও চেষ্টাই করিল না, তির্যক চক্ষে চাহিয়া বলিল, 'পত্তি-নায়ক, নিজের উপর কখনও নিজের অসির ধার পরখ করিয়াছেন ? করেন নাই। তবে এইবার করুন।'

বৃদ্ধের হস্তে আমার অসি একবার বিদ্যুতের মত ঝলসিয়া উঠিল। আমার শিরস্ত্রাণের উপর একটি শিখিপুচ্ছ রোপিত ছিল, দ্বিখণ্ডিত হইয়া তাহা ভূতলে পড়িল।

এইবার আমার অবরুদ্ধ ক্রোধ একেবারে ফাটিয়া পড়িল। এক লম্ফে প্রাচীর হইতে খড়্গ তুলিয়া লইয়া বলিলাম, 'তণ্ডু, বৃদ্ধ শৃগাল, আজ তোর কর্ণচ্ছেদন করিব।' জ্বলন্ত ক্রোধের মধ্যে একটা চিন্তা অকস্মাৎ সূক্ষ্ম সূচীর মত মস্তিষ্ককে বিদ্ধ করিল—তণ্ডুকে যদি হত্যা করি তাহাতেই বা দোষ কি ? বরং আমার পথ পরিষ্কার হইবে।

কিন্তু তাহাকে আক্রমণ করিতে গিয়া দেখিলাম—কঠিন ব্যাপার। বিস্ময়ে আমার ক্রোধ ডুবিয়া গেল। জরা-শীর্ণ তণ্ডুর হস্তে অসি ঘুরিতেছে রথ নেমির মত, অসি দেখা যাইতেছে না, কেবল একটা ঘূর্ণমান প্রভা তাহাকে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে। আমি হটিয়া গেলাম।

গরলভরা সুরে তণ্ডু বলিল, 'পত্তি-নায়ক অহি দত্ত রঞ্জুল, লতামণ্ডপে লুকাইয়া চপলা পরস্ত্রীর অঙ্গস্পর্শ করা সহজ, পুরুষের অঙ্গস্পর্শ করা তত সহজ নয়।'

আবার তাহাকে আক্রমণ করিলাম। বুঝিতে বাকি রইল না, তণ্ডু আরম্ভ হইতেই আমার অভিপ্রায় জানে। লতাবিতানে চুরি করিয়া আমাদের দেখিয়াছিল। কিন্তু এতদিন প্রকাশ করে নাই কেন ? আমাকে লইয়া খেলা করিতেছিল ?

অসিতে অসি লাগিয়া স্ফুলিঙ্গ ঠিকরাইয়া পড়িতে লাগিল। কিন্তু আশ্চর্য বৃদ্ধের কৌশল, সে একপদ হটিল না। আমি যোদ্ধা, অসিচালনাই আমার জীবন, আমি তাহার অসি-নৈপুণ্যের সম্মুখে বিষহীন উরগের ন্যায় নিবীর্য হইয়া পড়িলাম। অপ্রত্যাশিতের বিস্ময় আমাকে আরও অভিভূত করিয়া ফেলিল।

অকস্মাৎ বজ্র-নির্ঘোষের মত তণ্ডুর স্বর আমার কর্ণে আসিল, 'অহিদত্ত রঞ্জুল, শক-লম্পট, এইবার নিজ অসির ধার নিজবক্ষে পরীক্ষা কর—'

তারপর—কি যেন ঘটিয়া গেল।

অবাক হইয়া নিজের দিকে তাকাইলাম। দেখিলাম, অসির ফলক আমার বক্ষ-পঞ্জরে প্রোথিত হইয়া আছে।

তণ্ডু আমার পঞ্জর হইতে অসি টানিয়া বাহির করিয়া লইল। আমি মাটিতে পড়িয়া গেলাম। একটা তীব্র দৈহিক যন্ত্রণা যেন আমার চেতনাকে দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিল। আর কোনও ক্লেশ অনুভব করিলাম না। স্বপ্নাচ্ছন্নের মত অনুভব করিলাম, তণ্ডু কর্কশ উল্লাসে বলিতেছে, 'অহিদত্ত রঞ্জুল, রল্লা তোমাকে বধ করে নাই,—বধ করিয়াছে তণ্ডু—তণ্ডু—তণ্ডু—'

আমার দেহটার সহিত আমার যেন একটা দ্বন্দ্ব চলিতেছে। সে আমাকে ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছে, আমি বায়ুহীন কারা-কূপে আবদ্ধ বন্দীর মত প্রাণপণে মুক্ত হইবার জন্য ছটফট করিতেছি। এই টানাটানি ক্রমে অসহ্য হইয়া উঠিল। তারপর হঠাৎ মুক্তিলাভ করিলাম।

প্রথমটা কিছুই ধারণা করিতে পারিলাম না। তম্ভুর যন্ত্রগৃহে আমি দাঁড়াইয়া আছি, আমার পায়ের কাছে একটা বলিষ্ঠ রক্তাক্ত মৃতদেহ পড়িয়া আছে। আর তম্ভু ঘরের কোণে খনিত্র দিয়া গর্ত খুঁড়িতেছে এবং ভয়ার্ত চোখে বার বার মৃতদেহটার পানে ফিরিয়া তাকাইতেছে।

ক্রমে মননশক্তি ফিরিয়া আসিল। বুঝিলাম, তম্ভু আমাকে হত্যা করিয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য! আমি তো মরি নাই! ঠিক পূর্বের মতই বাঁচিয়া আছি। অনির্বচনীয় বিস্ময় ও হর্ষে মন ভরিয়া উঠিল।

অনুভব করিলাম, আরও কয়েক জন ঘরের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহাদের মধ্যে কাহাকেও চিনিলাম, কাহাকেও বা চিনিতে পারিলাম না। একজন আমার কাছে আসিয়া মৃদুহাস্যে বলিল, 'চল, এখানে থাকিয়া আর লাভ নাই।'

রল্লার কথা মনে পড়িয়া গেল। মুহূর্ত মধ্যে তাহার নিকটে গিয়া দাঁড়াইলাম। একটি বদ্ধ কক্ষে গবাক্ষপথে সে বাহিরের দিকে চাহিয়া আছে; শুষ্ক চোখে ছুরির ঝলক, ক্ষণে ক্ষণে তীক্ষ্ম দংশনে অধর দংশন করিতেছে। কিন্তু তাহাকে দেখিয়া, তাহার অত্যন্ত কাছে দাঁড়াইয়াও আমার লেশ মাত্র বিকার জন্মিল না। সেই তপ্ত লালসাফেনিল উন্মত্ততা আর নাই। দেহের সঙ্গে দেহ জাত আবিলতাও যেন ঝরিয়া গিয়েছে।

অতঃপর আমার নূতন জীবন আরম্ভ হইল। পার্থিব সময়ের প্রায় দুই সহস্র বর্ষব্যাপী এই জীবন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করা সহজ নয়। আমার স্বপ্নে আমি এই দুই-হাজার বৎসরের জীবন বোধ হয় দুই ঘন্টা বা আরও অল্প সময়ের মধ্যে যাপন করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহা বর্ণনা করিতে গেলে দুই হাজার পৃষ্ঠাতেও কুলাইবে না!

জীবিত মানুষ স্থান এবং কালের আশ্রয়ে নিজের সত্তাকে প্রকট করে। কিন্তু প্রেতলোকে আত্মার স্থিতি কেবল কালের মধ্যে। নিরবয়ব বলিয়া বোধ করি তাহার স্থানের প্রয়োজন হয় না।

শরীর নাই; তাই রোগ কামনা ক্ষুধা তৃষ্ণাও নাই। দেহ-বোধ প্রথম কিছু দিন থাকে, ক্রমে ক্ষয় হইয়া যায়। গতির অবাধ স্বচ্ছন্দতা আছে, অভিলাষমাত্রেই যেখানে ইচ্ছা যাওয়া যায়। সূর্যের জ্বলন্ত অগ্নি-বাষ্পের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছি, লেশমাত্র তাপ অনুভব করি নাই। শৈত্য-উত্তাপের একান্তই অভাব এ রাজ্যের স্বাভাবিক অবস্থা।

এখানকার কালের গতিও পার্থিব কালের গতি হইতে পৃথক। পৃথিবীর এক অহোরাত্রে এখানে এক অহোরাত্র হয় না; পার্থিব এক চান্দ্র মাসে আমাদের অহোরাত্র। এই কালের বিভিন্নতার জন্য পার্থিব ঘটনা আমাদের নিকট অতিশয় দ্রুত বলিয়া বোধ হয়।

অবাধ স্বচ্ছন্দতার আমার সময় কাটিতে লাগিল। কোটি কোটি দেহ আত্মা এখানে আমারই মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। নারী আছে, পুরুষ আছে; সকলেই

স্বেচ্ছানুসারে বিচরণ করিতেছে। আপাতদৃষ্টিতে কোনও প্রকার বিধি নিষেধ লক্ষ্য করা যায় না। কিন্তু তবু কোথায় যেন একটা অদৃশ্য শক্তি সমস্ত নিয়ন্ত্রণ করিতেছে। সেই শক্তির আধার কে, জানি না, কিন্তু তাহার নিঃশব্দ অনুশাসন লঙ্ঘন করা অসাধ্য।

সময় কাটিয়া যাইতে লাগিল। এখানে জ্ঞানের পথে বাধা নাই; যাহার মন স্বভাবত জ্ঞানলিপসু সে যথেচ্ছ জ্ঞানলাভ করিতে পারে। মর্তলোকে যে-জ্ঞান বহু সাধনায় অর্জন করিতে পারা যায় না, এখানে তাহা সহজে অবলীলাক্রমে আসে। আমি আমার ক্ষুদ্র মানবজীবনে যে-সকল মানসিক সংস্কার ও সংকীর্ণতা সঞ্চয় করিয়াছিলাম, তাহা ক্রমশ ক্ষয় হইয়া গেল। অকলঙ্ক জ্ঞান ও প্রীতির এক আনন্দময় অবস্থার মধ্যে উপনীত হইলাম।

রবি, চন্দ্র, গ্রহ, তারা ঘুরিতেছে, কাল অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। শনৈশ্চর শনি-গ্রহ বোধ করি ষাট বারেরও অধিক সূর্যমণ্ডলকে পরিক্রমণ করিল। তারপর একদিন আদেশ আসিল—ফিরিতে হইবে।

অদৃশ্য শক্তির প্রেরণায় চন্দ্রলোকে উপস্থিত হইলাম। সেখান হইতে সূক্ষ্ম চন্দ্রকর অবলম্বন করিয়া আলোকের বেগে ছুটিয়া চলিলাম।

পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিলাম। হরিৎবর্ণ বিপুল শস্য-প্রান্তর চন্দ্রকরে দুলিতেছে; পরমানন্দে তাহারই অঙ্গে মিলাইয়া গেলাম।

আমার সচেতন আত্মা কিন্তু অস্তিত্ব হারাইল না—একটি আনন্দের কণিকার মত জাগিয়া রহিল।

তারপর এক অন্ধকারলোকে প্রবেশ করিলাম। স্থাণুর মত নিশ্চল, আত্মস্থ,—কিন্তু আনন্দময়।

সহসা একদিন এই যোগনিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। ব্যথা অনুভব করিলাম; দেহানুভূতির যে যন্ত্রণা ভুলিয়া গিয়াছিলাম, তাহাই নূতন করিয়া আমাকে বিদ্ধ করিল।

যন্ত্রণা বাড়িতে লাগিল; সেই শ্বাসরোধকর কারাকূপের ব্যাকুল যন্ত্রণা। তারপর আমার কণ্ঠ বিদীর্ণ করিয়া এই যন্ত্রণা অভিব্যক্তি লাভ করিল—তীক্ষ্ম ক্রন্দনের সুরে।

পাশের ঘর হইতে মন্দমন্দ্র শব্দ শুনিলাম, 'লিখে রাখ। ৩রা চৈত্র রাত্রি ১টা ১৭ মিনিটে জন্ম।'

তন্দ্রাহরণ

পৌণ্ড্র বর্ধনের রাজকুমারী তন্দ্রার মন একেবারে খিঁচড়াইয়া গিয়াছে। মধুমাসের সায়াহ্নে তাই প্রাসাদশিখরে উঠিয়া একাকিনী দ্রুত পায়চারি করিতেছেন এবং গণ্ড আরক্তিম করিয়া ভাবিতেছেন, কেন মরিতে রাজকন্যা হইয়া জন্মিলাম?

অনেকদিন আগেকার কথা। ভারতীয় রমণীগণের মন তখন অতিশয় দুর্দমনীয় ছিল; মাত্র কয়েক বৎসর পূর্বে কনৌজ সংযুক্তার স্বয়ংবর হইয়া গিয়াছে।

রাজকুমারী তন্দ্রার বয়স আঠারো বৎসর, ফুটন্ত রূপ, বিকশিত যৌবন। তথাপি মধুমাসের সায়াহ্নে তাঁহার মন কেন খিঁচড়াইয়া গিয়াছে জিজ্ঞাসা করিলে বলিতে হয়, তাঁহার আসন্ন বিবাহই একমাত্র কারণ।

কিন্তু আঠারো বছরের বিকশিত যৌবনা কুমারী বিবাহ করিতে অনিচ্ছুক কেন? একালে তো এমনটা দেখা যায় না। তবে কি সেকালে—

না, তাহা নয়। সেকালেও এমনই ছিল। কিন্তু কুমারী তন্দ্রার আপত্তির কারণ, তাঁহার মনোনীত স্বামী প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের যুবরাজ চন্দ্রানন মাণিক্য। কথাটা বোধ করি পরিষ্কার হইল না। আসল কথা—বর বাঙাল।

যতদিন এই বিবাহ রাজা ও মন্ত্রীমণ্ডলীর গবেষণার বিষয়ীভূত ছিল, ততদিন কুমারী তন্দ্রা গ্রাহ্য করেন নাই। কিন্তু হঠাৎ শিরে সংক্রান্তি আসিয়া পড়িয়াছে। যুবরাজ চন্দ্রানন বিবাহ করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া সৈন্যসামন্তসমভিব্যাহারে রাজধানীতে ডেরাডাণ্ডা ফেলিয়াছেন।

গোড়া হইতেই তন্দ্রার মন বাঁকিয়া বসিয়াছে। তবু তিনি গোপনে প্রিয়সখী নন্দাকে পাঠাইয়াছিলেন—চন্দ্রানন মাণিক্য লোকটি কেমন দেখিবার জন্য। নন্দা আসিয়া সংবাদ দিয়াছে—যুবরাজ দেখিতে শুনিতে ভাল, চালচলনও অতি চমৎকার। কিন্তু তাঁহার ভাষা একেবার অশ্রাব্য। 'ইসে' এবং 'কচু' এই দুইটি শব্দের বহুল-প্রয়োগসহযোগে তিনি যাহা বলেন তাহা কাহারও বোধগম্য হয় না।

শুনিয়া কুমারী তন্দ্রা একেবারে আগুন হইয়া গিয়াছেন। এ কি অত্যাচার! তিনি রাজকুমারী বলিয়া কি তাঁহার এতটুকু স্বাধীনতা নাই? হউক সে প্রাগ্‌-জ্যোতিষপুরের যুবরাজ—তবু বাঙাল তো। দেশে কি আর রাজপুত্র ছিল না। আর রাজপুত্র ছাড়া রাজকুমারী বিবাহ করিতে পারিবে না—এই বা কেমন কথা!

কুমারী তন্দ্রা রাজসভায় নিজ অনিচ্ছা জানাইয়া তীব্র লিপি লিখিয়াছিলেন। উত্তরে মন্ত্রিগণ কর্তৃক পরামর্শিত হইয়া রাজা কন্যাকে সংবাদ দিয়াছেন যে, চন্দ্রানন মহা বীরপুরুষ, উপরন্তু বহু সৈন্যসামন্ত লইয়া আসিয়াছেন; এ ক্ষেত্রে বিবাহে অস্বীকৃত হইলে নিশ্চয় কন্যাকে হরণ করিয়া লইয়া যাইবেন—প্রাগ্‌জ্যোতিষ-পুরের গোঁ অতি ভয়ানক বস্তু। সুতরাং বিবাহ করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

তদবধি ক্রোধে অভিমানে কুমারী তন্দ্রার চোখে তন্দ্রা নাই। তাই মধুসায়াহ্নে একাকী প্রাসাদশীর্ষে দ্রুত পায়চারি করিতে করিতে গণ্ড আরক্তিম করিয়া তিনি ভাবিতেছেন, কেন মরিতে রাজকন্যা হইয়া জন্মিলাম?

সহসা একটি তীর হাউইয়ের মত প্রাসাদপার্শ্ব হইতে উঠিয়া আসিয়া তন্দ্রার পদপ্রান্তে পড়িল। বিস্মিত হইয়া তন্দ্রা চারিদিকে চাহিলেন। রাজপ্রাসাদশীর্ষে কোন্ ধৃষ্ট তীর নিংক্ষপ করিল? তন্দ্রা ছাদের কিনারায় গিয়া নিম্নে উঁকি মারিলেন।

ঠিক নীচেই জলপূর্ণ পরিখা প্রাসাদ বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে। পরিখার পরপারে একটি উষ্ণীষধারী যুবক উর্ধ্বমুখ হইয়া গুম্ফে তা দিতেছে। তন্দ্রাকে দেখিতে পাইয়া সে হাত তুলিয়া ইঙ্গিত করিল।

চতুস্তল প্রাসাদের শিখর হইতে মুখাবয়ব ভাল দেখা গেল না; তবু সে যে বলিষ্ঠ ও কান্তিমান তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। তন্দ্রা বিস্ময়াপন্ন হইয়া ফিরিয়া আসিয়া তীরটি তুলিয়া লইলেন। দেখিলেন, তীরের গায়ে একটি লিপি জড়ানো রহিয়াছে।

লিপি খুলিয়া তন্দ্রা পড়িলেন—

"ছলনাময়ী নন্দা, আর কতদিন দূর হইতে দেখিয়া অতৃপ্ত থাকিব? তুমি যদি আমাকে ভালবাস, তবে আমার মনস্কাম সিদ্ধ কর; আমার মন আর বিলম্ব সহিতেছে না। যদি আমাকে বঞ্চনা কর, নিজেই পরিতাপ করিবে। পরদেশী বন্ধু কতদিন থাকে?"

"সদয়া হও; তুমি যাহা বলিবে তাহাই করিব। একবার সাক্ষাত হয় না?—তোমার অনুগত বন্ধু।"

লিপি পড়িয়া কুমারী তন্দ্রা স্থির হইয়া বসিয়া রহিলেন। মনে পড়িল, ইদানীং প্রিয় সখী নন্দা যখন তখন ছলছুতা করিয়া ছাদে আসে। এই তাহার অর্থ! ঐ কমলকান্তি বিদেশী নন্দাকে দেখিয়া মজিয়াছে; নন্দাও নিশ্চয় তাহার প্রতি আসক্ত। দুইজনে কাছাকাছি হয় নাই, দূর হইতেই প্রণয়। তীরের মুখে প্রেম!

সহসা তন্দ্রার দুই নয়নে বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। তিনি সন্তর্পণে উঠিয়া গিয়া আবার উঁকি মারিলেন। ধৈর্যশীল যুবক তখনও ঊর্ধমুখে দাঁড়াইয়া গুম্ফে তা দিতেছে।

কবরী হইতে কাজললতা লইয়া চুলের কাঁটা দিয়া তন্দ্রা লিপি লিখিলেন, হাত কাঁপিতে লাগিল। লিপি শেষ হইলে তীরের গায়ে জড়াইয়া পরিখার পরপারে ফেলিয়া দিলেন। নিরুদ্ধনিশ্বাসে দেখিলেন, যুবক সাগ্রহে তীর তুলিয়া লইল।

*   *   *   *

নন্দা ছাদে আসিয়া তন্দ্রাকে দেখিয়া অবাক হইয়া গেল, বলিল, 'প্রিয় সখী, তুমি এখানে?'

তন্দ্রা তপ্তমুখে আকাশের পানে চাহিয়া রহিলেন। নন্দা ছাদের এদিক ওদিক সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল, তারপর বলিল, 'কতক্ষণ এখানে এসেছ?'

তন্দ্রা আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিলেন না, ঝরঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন; 'নন্দা, আমার ভাগ্যে কি আছে জানি না। হয়তো কাল সকালে উঠে আর আমায় দেখতে পাবি না! সখি, তোর কাছে যদি কখনও অপরাধী হই ক্ষমা করিস।'

নন্দা রাজকুমারীকে জড়াইয়া অনেকক্ষণ তাঁহার অশ্রুসিক্ত মুখের পানে চাহিয়া রহিল, তারপর ধীরে ধীরে বলিল, 'ছি সখি, ও কথা বলতে নেই। চল, নীচে চল।' কাজললতা যে প'ড়ে রইল', 'আমি নিচ্ছি। চুলের কাঁটাও খ'সে পড়েছে দেখছি! সখি, উতলা হ'য়ো না, তোমার ভাগ্যদেবতা তোমায় নিয়ে হয়তো একটু পরিহাস করেছেন, দেবতার পরিহাসে কাতর হ'লে কি চলে?

শয়নমন্দিরে প্রবেশ করিয়া অশ্রুভরা স্বরে তন্দ্রা কহিলেন, 'নন্দা আজ রাত্রে আমি একা শোব, তুই যা। আর দেখ, প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের সেই বর্বরটাকে যদি তোর পছন্দ হয়, তুই নিস।'—মনে মনে বলিলেন, 'অদল-বদল।'

নন্দা জিভ কাটিয়া চোখে আঁচল দিল। 'ওমা ও কি কথা! আমি যে তাঁর দাসীর দাসী হবার যোগ্য নই।'—বলিয়া ছুটিয়া পলাইল। নন্দার এই পলায়ন একেবারে প্রাসাদের বাহিরে গিয়া থামিল।

*   *   *   *

রাত্রি দ্বিপ্রহরের যাম-ঘোষণা থামিয়া যাইবার পর, রাজকুমারী তন্দ্রা প্রাসাদের গুপ্ত পথ দিয়া পরিখা-পার হইয়া বাহিরে গেলেন। তাঁহার বরতনু বেষ্টন করিয়া

আছে রাত্রির মতই নিবিড় নীল একটি উর্ণা।

নক্ষত্রখচিত অন্ধকারে একটি তরুণ সুদৃঢ় হস্ত আসিয়া তাঁহার হাত ধরিল। কেহ কথা কহিল না; দুইটি কৃষ্ণবর্ণ অশ্ব পাশাপাশি দাঁড়াইয়াছিল, তরুণ সুদৃঢ় হস্ত-ধারী তন্দ্রাকে একটির পৃষ্ঠে তুলিয়া দিল; তারপর এক লম্ফে অপরটির পৃষ্ঠে উঠিয়া বসিল। নক্ষত্রখচিত অন্ধকারে দুই কৃষ্ণকায় অশ্ব ছুটিয়া চলিল পৌণ্ড্রভুক্তির সীমান্ত লক্ষ্য করিয়া।

দণ্ড কাটিল, প্রহর কাটিল, কত নক্ষত্র অস্ত গেল। সম্মুখে শুকতারা বিস্ময়াবিষ্ট জ্যোতিষ্মান চক্ষুর মত জ্বলজ্বল করিতে লাগিল।

দিগন্তহীন প্রান্তরের মাঝখানে প্রভাত হইল; তখন বল্গার ইঙ্গিত পাইয়া অশ্ব-যুগল থামিল। কুমারী তন্দ্রা মুখের নীল উর্ণা সরাইয়া পাশে অশ্বারোহী মূর্তির পানে চাহিলেন। দৃষ্টি বিনিময় হইল।

অশ্বপৃষ্ঠে বসিয়া আছে একটি তরুণ কন্দর্প। পক্ক ডালিমের মতো তার দেহের বর্ণ। পেশল অথচ পেশীবন্ধ দেহ, মুখে পৌরুষ ও লাবণ্যের অপূর্ব মেশামেশি। নবজাত গুম্ফের নীচে একটি কৌতুকহাস্য ক্রীড়া করিতেছে। দেখিতে দেখিতে কুমারী তন্দ্রার চক্ষু দুইটি আবেশে নিমীলিত হইয়া আসিল। দূর হইতে যাহা দেখিয়া-ছিলেন, এ যে তাহার চেয়ে সহস্রগুণ সুন্দর!

সহসা অনুতাপে তন্দ্রার হৃদয় বিদ্ধ হইল। তিনি লজ্জা বিজড়িত কণ্ঠে বলিলেন, 'আর্যপুত্র, আমার ছলনা ক্ষমা কর। আমি নন্দা নই—আমি তন্দ্রা।'

তরুণ কন্দর্প হাসিলেন, গুম্ফে ঈষৎ তা দিয়া সুধামধুর স্বরে কহিলেন,—'ইসে—সেডা না জাইনাই কি চুরি কৈরা আন্‌ছি? রাজকুমারী, তুমি বরই চতুরা; কিন্তু আমার চৈক্ষে যদি ধুলাই দিতি পারবা তো তোমারে বিয়া করিতে আইলাম কিসের লাইগা?'

তন্দ্রা চমকিত হইলেন; বিস্ফারিত চক্ষে চাহিয়া স্খলিত স্বরে কহিলেন, 'তুমি—তুমি কে?'

যুবক কলকণ্ঠে হাসিয়া বলিলেন, 'আরে কচু—সেডা এখনো বোঝবার পার নাই? আমি চন্দ্রানন মাণিক্য—ইসে—প্রাগ্‌জ্যোতিষের যুবরাজ। হ—সৈত্য কইলাম।'

*　　　　*　　　　*　　　　*

দুইটি অশ্ব অত্যন্ত ঘেঁষাঘেঁষি মন্থর গমনে পৌণ্ড্রবর্ধনের পথে ফিরিয়া চলিয়াছে। তন্দ্রার করতল চন্দ্রাননের দৃঢ়মুষ্টিতে আবদ্ধ। তাঁহার স্খলিতবেণী মস্তক মাঝে মাঝে যুবরাজের বামস্কন্ধের উপর নত হইয়া পড়িতেছে।

তন্দ্রা কহিলেন, 'যুবরাজ কী সুন্দর তোমার ভাষা—যেন মধু ঝ'রে পড়ছে। কতদিনে আমি এ ভাষা শিখতে পারব?'

চন্দ্রানন তন্দ্রার মনিবন্ধে একটি আনন্দ গদগদ চুম্বন করিয়া বলিলেন, 'ইসে—আগে বিয়া তো করি, তারপর এক মাসের মৈধ্যে তোমারে শিখাইয়া ছারমু। তোমাগোর ও কচুর ভাষা এক মাসে ভুইলা যাইতে পারবা না?'

সুখাবিষ্ট কণ্ঠে তন্দ্রা বলিলেন, 'পারমু।'

রক্তসন্ধ্যা

মানুষের সহজ সাধারণ বৈচিত্র্যহীন জীবনযাত্রার মাঝখানে ভূমিকম্পের মত এমন এক একটা ঘটনা ঘটিয়া যায় যে পারিপাশ্বিক অবস্থার সহিত তুলনা করিয়া সেটাকে একটা অসম্ভব অঘটন বলিয়া মনে হয়। যে গল্পটা আজ বলিতে বসিয়াছি, সেটাও একদিন এমনই অকস্মাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে আমার জীবনে আসিয়া হাজির হইয়াছিল। যদিও শুধু দর্শক হিসাবে ছাড়া এ গল্পের সঙ্গে আমার কোনও সংস্রব নাই, তবু ইহা আমার মনের উপর এমন একটা গভীর দাগ কাটিয়া দিয়াছে যাহা বোধ করি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত মুছিবে না।

যে লোকটার কাহিনী আজ লিপিবদ্ধ করিতে বসিয়াছি, আজ সাত দিন হইল সে হাইকোর্টের রায় মাথায় করিয়া পরলোকে যাত্রা করিয়াছে। সুতরাং সাক্ষীসাবুদ উপস্থিত করিবার আমার আর উপায় নাই। তবে সংবাদপত্রের নথি হইতে এবং আসামীর বিচারের সময় সাক্ষীদের মুখের যে যে কথা এই গল্পে কাজে আসিতে পারে, তাহা প্রয়োজনমত ব্যবহার করিব। বিশ্বাস আমি কাহাকেও করিতে বলি না, এবং নিছক গাঁজা বলিয়া যাঁহারা উড়াইয়া দিতে চাহেন, তাঁহাদের বিরুদ্ধেও আমার কোন নালিশ নাই। আমি শুধু এইটুকু ভাবি যে, সে লোকটা মরিবার পূর্বে নিজের দোষ-স্খালনের বিন্দুমাত্র চেষ্টা না করিয়াও এতগুলি অনাবশ্যক মিথ্যা বলিয়া গেল কেন?

এই সময় দৈনিক সংবাদপত্র 'কালকেতু'তে এই ঘটনার যে বিবরণ বাহির হইয়াছিল, তাহাই সর্বাগ্রে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—

"গতকল্য বেলা প্রায় সাড়ে নটার সময় কলিকাতার দুর্গাচরণ ব্যানার্জি লেনে এক কসাইয়ের দোকানে ভীষণ হত্যাকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। দোকানের মালিক গোলাম কাদের অন্য দিনের ন্যায় যথারীতি মাংস বিক্রয় করিতেছিল। দোকানে কয়েকজন ফিরিঙ্গী ও মুসলমান খরিদ্দার উপস্থিত ছিল। এমন সময় একজন অপরিচিত ফিরিঙ্গী দোকানে প্রবেশ করিয়া কিছু গোমাংস খরিদ করিতে চাহে। তাহাকে দেখিয়াই দোকানদার গোলাম কাদের ভীষণ চীৎকার করিয়া মাংস-কাটা ছুরি হস্তে তাহার উপর লাফাইয়া পড়ে এবং নৃশংসভাবে তাহার বুকে, পেটে, মুখে ছুরিকাঘাত করিতে থাকে। আক্রান্ত ব্যক্তি মাটিতে পড়িয়া যায়, তখন গোলাম কাদের তাহার বুকের উপর বসিয়া এক-একবার ছুরিকাঘাতের সঙ্গে সঙ্গে বলিতে থাকে, 'ভাস্কো-ডা-গামা, এই আমার স্ত্রীর জন্যে—এই আমার কন্যার জন্যে—এই বৃদ্ধ পিতার জন্যে।' দোকানে যাহারা ছিল, সকলেই এই লোমহর্ষক কাণ্ড দেখিয়া দ্রুত পলায়ন করিয়া পুলিশে খবর দেয়। পুলিশ আসিয়া যখন গোলাম কাদেরকে গ্রেপ্তার করিল, তখনও সে মৃতদেহের উপর ছুরি চালাইতেছে ও পূর্ববৎ বকিতেছে।

"সন্দেহ হয় যে, গোলাম কাদের হঠাৎ পাগল হইয়া গিয়াছে। কারণ, হত ব্যক্তির সহিত পূর্ব হইতে তাহার পরিচয় ছিল বলিয়া জানা যাইতেছে না, এবং তাহার স্ত্রী, কন্যা বা বৃদ্ধ পিতা কেহই বর্তমান নাই। অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে

যে গোলাম কাদের প্রায় পনেরো বৎসর পূর্বে বিপত্নীক হইয়াছিল। তাহার স্ত্রী এক মৃত কন্যা প্রসব করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তাহার পর সে আর বিবাহ করে নাই।

"পুলিশ তদন্তে বাহির হইয়াছে যে, হত ব্যক্তি গোয়া হইতে নবাগত একজন পর্তুগীজ ফিরিঙ্গী, ব্যবসার উপলক্ষে কয়েকদিন পূর্বে কলিকাতায় আসিয়া এক ক্ষুদ্র হোটেলে বাস করিতেছিল। তাহার নাম গেব্রিয়েল ডিরোজা।

"গোলাম কাদের এখন হাজতে আছে। ডিরোজার লাস পরীক্ষার জন্য হাসপাতালে প্রেরিত হইয়াছে।"

ঘটনাস্থলের খুব কাছেই আমার বাড়ি এবং অনেকদিন হইতে এই গোলাম কাদের লোকটার সহিত আমার মুখ চেনাচেনি ছিল বলিয়াই ব্যাপারটা বেশি করিয়া আমাকে আকৃষ্ট করিয়াছিল। তাহা ছাড়া আর একটি জিনিস আমার কৌতূহল উদ্রিক্ত করিয়াছিল, সেটি ভাস্কো-ডা-গামার নাম। ছেলেবেলা হইতেই আমি ইতিহাসের ভক্ত, তাই হঠাৎ কসাইখানার হত্যাকাণ্ডের মধ্যে এই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ নামটা উঠিয়া পড়ায় আমার মন সচকিত ও উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল। 'ভাস্কো-ডা-গামা' সাধারণ নাম নহে; একজন অশিক্ষিত কসাইয়ের মুখে এ নাম এমন অবস্থায় উচ্চারিত হইতে দেখিয়া কোন এক গুপ্ত রোমান্সের গন্ধে আমার মনটা ভরিয়া উঠিয়াছিল। কি অদ্ভুত রহস্য এই বিশ্রী হত্যাকাণ্ডের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে? কে এই গেব্রিয়েল ডিরোজা—যাহাকে হত্যাকারী ভাস্কো-ডা-গামা বলিয়া সম্বোধন করিল? সত্যই কি ইহা কেবলমাত্র এক বাতুলের দায়িত্বহীন প্রলাপ?

তা সে যাহাই হউক, কৌতূহল আমার এতই বাড়িয়া গিয়াছিল যে, যে দিন এই মকদ্দমা করোনারের কোর্টে উঠিল, সেদিন আমি একটু সকাল সকাল আদালতে গিয়া হাজির হইলাম। করোনার তখনও উপস্থিত হন নাই, কিন্তু আসামীকে আনা হইয়াছে। চারিদিকে পুলিস গিসগিস করিতেছে। আসামীর হাতে হাতকড়া—একটি টুলের উপর চুপ করিয়া বসিয়া আছে। আমাকে দেখিয়া সে চিনিতে পারিল এবং হাত তুলিয়া সেলাম করিল। পাগলের লক্ষণ কিছুই দেখিলাম না, নিতান্ত সহজ মানুষের মত চেহারা। মুখে ভয় বা উৎকণ্ঠার কোনও চিহ্নই নাই। দেখিয়া কে বলিবে, এই লোকটাই দুই দিন আগে এমন নির্দয়ভাবে আর একটা লোককে হত্যা করিয়াছে।

করোনার আসিয়া পড়িলেন। তখন কাজ আরম্ভ হইল। প্রথমেই ডাক্তার আসিয়া এজাহার দিলেন। তিনি বলিলেন, লাসের গায়ে সর্বসুদ্ধ সাতান্নটি ছুরিকাঘাত পাওয়া গিয়াছে। এই সাতান্নটির মধ্যে কোন্‌টি মৃত্যুর কারণ, বলা শক্ত। কারণ, সবগুলিই সমান সাংঘাতিক।

ডাক্তারের জবানবন্দি শেষ হইলে জর্জ ম্যাথুস নামক একজন দেশী খ্রীষ্টানকে সাক্ষী ডাকা হইল। অন্যান্য সওয়াল জবাবের পর সাক্ষী কহিল, 'আমি গত দশ বৎসর প্রায় প্রত্যহ গোলাম কাদেরের দোকানে মাংস কিনিয়াছি। কিন্তু কোনও দিন তাহার এরূপ ভাব দেখি নাই। সে স্বভাবত বেশ শান্ত শিষ্ট লোক।'

প্রশ্ন—আপনার কি মনে হয়, সে যে-সময় হত ব্যক্তিকে আক্রমণ করে, সে-সময় সে স্বাভাবিক অবস্থায় ছিল না?

উত্তর—হত ব্যক্তি দোকানে প্রবেশ করিবার আগে পর্যন্ত সে স্বাভাবিক অবস্থায় ছিল—আমাদের সঙ্গে সহজভাবে কথাবার্তা কহিতেছিল। কিন্তু ডিরোজাকে দেখিয়াই একেবারে যেন পাগল হইয়া গেল।

প্রশ্ন—আপনার কি বোধ হয়, আসামী হত ব্যক্তিকে পূর্ব হইতে চিনিত?

উত্তর—হাঁ। কিন্তু তাহার আসল নাম না বলিয়া ভাস্কো-ডা-গামা বলিয়া ডাকিয়াছিল।

প্রশ্ন—ডিরোজা আক্রান্ত হইয়া কোন কথা বলিয়াছিল?

উত্তর—না।

প্রশ্ন—আসামী মদ বা অন্য কোনও নেশা করে, আপনি জানেন?

উত্তর—আমি কখনও তাহাকে নেশা করিতে বা মাতাল হইতে দেখি নাই।

প্রশ্ন—আসামীর ভাবে ইঙ্গিতে কি আপনার বোধ হইয়াছিল যে, সে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার জন্য ডিরোজাকে খুন করিতেছে?

উত্তর—হাঁ। তাহার কথায় ও মুখের ভাবে আমার মনে হইয়াছিল যে, ডিরোজা পূর্বে তাহার স্ত্রী, কন্যা ও বৃদ্ধ পিতার উপর কোনও অত্যাচার করিয়া থাকিবে।

জর্জ ম্যাথুসের পরে আরও কয়েকজন সাক্ষী প্রায় ওই মর্মে এজাহার দিবার পর পুলিসের ডেপুটি কমিশনার এজাহার দিতে উঠিলেন। তিনি বলিলেন যে, গোয়া হইতে খবর পাইয়াছেন যে, ডিরোজা সেখানকার একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, জাতিতে ফিরিঙ্গী পর্তুগীজ—বয়স বিয়াল্লিশ বৎসর; সে পূর্বে কখনও গোয়া ছাড়িয়া অন্যত্র যায় নাই—জীবনে এই প্রথম কলিকাতায় পদার্পণ করিয়াছিল। আসামী সম্বন্ধে ডেপুটি কমিশনার বলিলেন, 'আসামীর আত্মীয়স্বজন স্ত্রী-পুত্র-পরিবার কেহই নাই। অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে যে, গত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে সে কলিকাতা ছাড়িয়া কোথাও যায় নাই। তাহার বয়স অনুমান সাতচল্লিশ বৎসর। সুতরাং ডিরোজার সহিত তাহার যে পূর্বে কখনও দেখা-সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তাহা সম্ভব বলিয়া বোধ হইতেছে না।'

আসামী এতক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। এবার সে কথা কহিল, বলিল, 'ডা-গামাকে আমি অনেকবার দেখিয়াছি।'

মুহূর্ত মধ্যে ঘর একেবারে নিস্তব্ধ হইয়া গেল। করোনার ডেপুটি কমিশনারকে চুপ করিতে ইঙ্গিত করিয়া আসামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি ডিরোজাকে পূর্ব হইতে জানো?'

আসামী বলিল, ডিরোজাকে আমি কখনও দেখি নাই—আমি ভাস্কো-ডা-গামাকে চিনি। ভাস্কো-ডা-গামা ছদ্মবেশে আমার দোকানে মাংস কিনিতে আসিয়াছিল।'

করোনার তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে আসামীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'আচ্ছা ভাস্কো-ডা-গামাকে তুমি কোথায় দেখিয়াছ?'

আসামী কহিল, 'প্রথম দেখি কালিকটের বন্দরে—শেষ দেখি সমুদ্রের বুকের উপর—' এই পর্যন্ত বলিয়া আসামী হঠাৎ থামিয়া গেল। দেখিলাম, তাহার মুখ-চোখ লাল হইয়া উঠিয়াছে, মুখ দিয়া কথা বাহির হইতেছে না।

সে অবরুদ্ধ কণ্ঠে একবার 'ইয়া খোদা!' বলিয়া দুই হাতে মুখ গুঁজিয়া বসিয়া পড়িল—আর কোনও কথা বলিল না।

তারপর করোনার যথাসময়ে রায় দিলেন যে, ক্ষণিক উন্মত্ততার বসে গোলাম

কাদের ডিরোজাকে খুন করিয়াছে।

কোর্ট হইতে যখন বাহিরে রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইলাম, তখন আমার মাথার ভিতর ঝাঁ-ঝাঁ করিতেছে। 'কালিকট', 'সমুদ্রের বুকের উপর'—আসামী এসব কি বলিল? আরও কত কথা, না জানি কোন্ অপূর্ব কাহিনী এই মূর্খ নিরক্ষর কসাই গোলাম কাদেরের বুকের মধ্যে লুকানো আছে। কারণ সে যে পাগলামির ভান করিতেছে না, তাহা নিঃসন্দেহ। কোনও কথা বা কাজই তাহার পাগলের মত নহে। অথচ দুই-একটা অসংলগ্ন কথার ভিতর দিয়া অতীতের পর্দার একটা কোণ তুলিয়া এ কি এক আশ্চর্য রূপকথার ইঙ্গিত দিয়া গেল।

ইহার পর গোলাম কাদেরের ভাগ্যে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা বিস্তারিত ভাবে বলিবার কোনও প্রয়োজন দেখিতেছি না। দায়রা সোপর্দ হইয়া মামলা হাইকোর্টে উঠিলে হাইকোর্টের জজবাহাদুর গোলাম কাদেরকে এক মাস ডাক্তারের নজরবন্দিতে থাকিবার হুকুম দিলেন। একমাস পরে ডাক্তারের রিপোর্ট আসিল—গোলাম কাদের সুস্থ সহজ মানুষ, পাগলামির চিহ্নমাত্র তাহার মধ্যে নাই। তারপর বিচার। বিচারে গোলাম কাদের নিজের উকিলের পরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়া স্পষ্ট ভাষায় বলিল, 'আমি খুন করিয়াছি, সে জন্য বিন্দুমাত্র দুঃখিত বা অনুতপ্ত নই। আবার যদি তাহার সহিত দেখা হয়, আবার তাহাকে এমনই ভাবে হত্যা করিব।'

হাইকোর্ট নিরুপায় হইয়া তাহার ফাঁসির হুকুম দিলেন।

আমি শেষ পর্যন্ত আদালতে উপস্থিত ছিলাম। গোলাম কাদেরের জীবননাট্যে বিচারের অঙ্কটা শেষ হইয়া গেল। একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলাম। বিচারে তাহার মুক্তির প্রত্যাশা কোন দিনই করি নাই, কিন্তু তবু অকারণে মনটা অত্যন্ত খারাপ হইয়া গেল। বুকের নিভৃত স্থানে যেন একটা সংশয় লাগিয়াই রহিল যে, এ সুবিচার হইল না, কোথায় যেন কি একটা অত্যন্ত জরুরী প্রমাণ বাদ পড়িয়া গেল।

এইসব নানা কথা ভাবিতেছি, এমন সময় কয়েকজন পুলিসের লোক আসামীকে বাহিরে লইয়া আসিল। আমি গোলাম কাদেরের মুখের দিকে চাহিতেই সে ইশারা করিয়া আমাকে কাছে ডাকিল। তারপর গলা নামাইয়া বলিল, 'বাবুজী, আপনি আমার মকদ্দমার শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত আছেন তাহা আমি দেখিয়াছি। আমি তো চলিলাম, আমার একটি শেষ আর্জি আছে—একবার জেলে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবেন, আমার কিছু বলিবার আছে।'

আমি বলিলাম, 'নিশ্চয় করিব।'

গোলাম কাদের হাতকড়া-বাঁধা দুই হাত তুলিয়া আমাকে সেলাম করিয়া জেলের গাড়িতে চড়িয়া চলিয়া গেল।

তারপর কি করিয়া কর্তৃপক্ষের অনুমতি লইয়া জেলে তাহার সহিত দেখা করিলাম, সে বিবৃতি এখানে অনাবশ্যক। শুধু কনডেম্ড আসামীর কক্ষে বসিয়া মৃত্যুর দুই দিন পূর্বে সে আমাকে যে গল্প বলিয়াছিল, তাহাই বাংলাভাষায় অনুদিত করিয়া আনুপূর্বিক উদ্ধৃত করিতেছি।—

গোলাম কাদের বলিল, 'বাবুজী, আমার এই কাহিনী আপনি বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, আমি যে পাগল নই—আমার এই কথাটি আপনি অবিশ্বাস করিবেন

না। সত্য কথা বলিতে কি, আমার কাছেও ইহা এক অদ্ভুত ব্যাপার। আমি কিতাব পড়ি নাই, আজীবন মাংস বিক্রয় করিয়াছি। গল্প বানাইয়া বলিবার শক্তি আমার নাই। যাহা আজ বলিব, তাহা আমি নিজে প্রত্যক্ষ করিয়াছি বলিয়াই বলিব। অথচ এ সকল ঘটনা আমার—এই গোলাম কাদেরের জীবনে যে ঘটে নাই, তাহাও নিশ্চিত। আপনাকে কেমন করিয়া বুঝাইব জানি না, আমি মূর্খ লোক—শুধু এইটুকু বলিতে পারি যে, ইহা আজিকার ঘটনা নয়, বহু বহু যুগের পুরাতন।

'তবে শুরু হইতেই কথাটা বলি। পনেরো-ষোলো বৎসর পূর্বে আমার স্ত্রী এক কন্যা প্রসব করিতে গিয়া মারা যায়, মেয়েটিও মারা গেল। কি করিয়া জানি না, আমার মনের মধ্যে বদ্ধমূল হইয়া গেল যে, কোন দুশমন আমার স্ত্রী-কন্যাকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিয়াছে। শোকের অপেক্ষা ক্রোধ ও প্রতিহিংসায় আমার অন্তঃকরণ অধিক পূর্ণ হইয়া উঠিল; সর্বদাই মনে হইত, যদি সেই অজ্ঞাত দুশমনটাকে পাই, তাহা হইলে তাহার প্রতি অঙ্গ ছিঁড়িয়া প্রতিশোধ লই।

এইভাবে কিছুদিন কাটিবার পর ক্রমে বুঝিতে পারিলাম যে ইহা আমার ভ্রান্তি—সত্যের উপর ইহার কোনও প্রতিষ্ঠা নাই। তারপর যত দিন কাটিতে লাগিল, আস্তে আস্তে শোক এবং ক্রোধ দুই-ই ভুলিতে লাগিলাম। কিন্তু আর বিবাহ করিতে পারিলাম না। শেষ পর্যন্ত হয়তো জীবনটা আমার এমনই সহজভাবে কাটিয়া যাইত, যদি না সেদিন অশুভক্ষণে সেই লোকটা আমার দোকানে পদার্পণ করিত।

'শুনিয়াছি, মানুষ জলে ডুবিলে তাহার বিগত জীবনের সমস্ত ঘটনা ছবির মত চোখের পর্দায় দেখিতে পায়। এই লোকটাকে দেখিবামাত্র আমারও ঠিক তাহাই হইল। মুহূর্তের মধ্যে চিনিয়া লইলাম—এই সেই নৃশংস রাক্ষস, যে আমার স্ত্রী-কন্যা এবং পিতাকে হত্যা করিয়াছিল। ছবির মত সে সকল দৃশ্য আমার চোখের উপর জাগিয়া উঠিল। মজ্জমান জাহাজের উপর সেই মরণোন্মুখ অসহায় যাত্রীদের হাহাকার কানে বাজিতে লাগিল! ভাস্কো-ডা-গামার সেই ক্রূর হাসি আবার দেখিতে পাইলাম।

'আমার জজসাহেবরা হত্যার কারণ খুঁজিতেছিলেন, কৈফিয়ৎ চাহিতেছিলেন। বাবুজী, আমি কি কৈফিয়ৎ দিব, আর দিলেই বা তাহা বুঝিত কে?'

'আপনি হয়তো বুঝিবেন। আপনার চোখে মুখে আমি তাহার পরিচয় পাইয়াছিলাম, তাই আপনাকে এই কষ্ট দিয়াছি। ইহাতে ফল কিছু হইবে না জানি, কিন্তু আমার হৃদয়ভার লাঘব হইবে; এছাড়া আমার অন্য স্বার্থ নাই।'

'আমার এই কসাই জীবনের ইতিহাসটা এখানেই শেষ করিতেছি। এবার যাহার কথা আরম্ভ করিতেছি, তাহার নাম মির্জা দাউদ বিন্ গোলাম সিদ্দী। আমিই যে এই মির্জা দাউদ, তাহা এখন ভুলিয়া যান। মনে করুন, ইহা আর কাহারও জীবনের কাহিনী।'—

কালিকটের নাম আপনি শুনিয়া থাকিবেন। মালাবার উপকূলে অতি সুন্দর মহার্ঘ মণিখণ্ডের মত একটি ক্ষুদ্র নগর। মোরগের ডাক যতদূর শুনা যায়, ততদূর তাহার নগর-সীমানা। নগরের পশ্চাতে ছোট ছোট পাহাড়, উপত্যকা, কঙ্করপূর্ণ সমতল ক্ষেত্র এবং তাহার পশ্চাতে অভ্রভেদী পশ্চিমঘাট সমস্ত পৃথিবী হইতে যেন স্থানটুকুকে পৃথক করিয়া ঘিরিয়া রাখিয়াছে। সম্মুখে অপার সমুদ্র ভিন্ন কালিকটে

প্রবেশ বা নিষ্ক্রমণের জন্য সুগম পথ নাই। এই সমুদ্রপথে অসংখ্য বাণিজ্যতরণী কালিকটের বন্দরে প্রবেশ করে, আবার পাল তুলিয়া সমুদ্রে বিলীন হইয়া যায়। কালিকট যেন পৃথিবীর সমগ্র বণিক-সমাজের মোসাফিরখানা।

পীতবর্ণ চৈনিক, তাম্রবর্ণ বাঙালী, লোহিতবর্ণ পারসিক, কৃষ্ণবর্ণ মুর—সকলেই কালিকটের পথে সমান দর্পে পা ফেলিয়া চলে, কেহ কাহারও অপেক্ষা হীন নহে। চীন হইতে লাক্ষা, দারুশিল্প; ব্রহ্ম হইতে গজদন্ত; মলয়দ্বীপ হইতে চন্দন; বঙ্গ হইতে ক্ষৌম পট্টবস্ত্র, মলমল, ব্যাঘ্রচর্ম; চম্পা ও মগধ হইতে চামর, কস্তুরী, চারু-কেশরার পুষ্পবীজ; দাক্ষিণাত্য হইতে অগুরু, কর্পূর, দারুচিনি; লঙ্কা হইতে মুক্তা আসিয়া কালিকটে স্তূপীকৃত হয়। পশ্চিম হইতে তুরস্ক, পারসিক, আরব ও মুর সওদাগর তাহাই স্বর্ণের বিনিময়ে ক্রয় করিয়া জাহাজে তুলিয়া, কেহ বা পারস্যোপসাগরের ভিতর দিয়া ইউফ্রাটেস নদের মোহনায় উপস্থিত হয় বা লোহিত সাগরের উত্তরপ্রান্তে নীলনদের সন্নিকটে গিয়া তরণী ভিড়ায়। তথা হইতে প্রাচী-রপণ্য সমগ্র পাশ্চাত্য খণ্ডে ছড়াইয়া পড়ে। কালিকটের রাজা সামরী বাণিজ্যতরণীর শুল্ক আদায় করিয়া রাজ্যের ব্যয়ভার নির্বাহ করেন। রাজকোষে সর্বদা সুবর্ণ-মণিমাণিক্যে পূর্ণ। রাজ্যে কোথাও সৈন্য নাই, অশান্তি নাই, অসন্তোষ নাই; ইতর-ভদ্র সকলেই সুখী।

মির্জা দাউদ এই কালিকটের একজন সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়ী। তাহার একুশখানি বাণিজ্যতরী আছে,—হোয়াংহো হইতে নীলনদের প্রান্ত পর্যন্ত তাহাদের গতিবিধি। যখন এই তরণী সকল শুভ্র পাল তুলিয়া শ্রেণীবদ্ধ ভাবে সমুদ্রযাত্রায় বাহির হয়, তখন মনে হয়, রাজহংসশ্রেণী পক্ষ বিস্তার করিয়া নীল আকাশে ভাসিয়া চলিয়াছে।

মির্জা দাউদ জাতিতে মুর। কালিকটে তাঁহার শ্বেত-প্রস্তরের প্রাসাদ মুর-প্রথায় নির্মিত। সুদূর মরক্কো দেশে এখনও তাঁহার বৃদ্ধ পিতা বর্তমান; কিন্তু তিনি কালিকটকেই মাতৃভূমিত্বে বরণ করিয়াছেন। অনেক বৈদেশিক সওদাগরই এরূপ করিয়া থাকেন। মির্জা দাউদ ধর্মে মুসলমান হইলেও একপত্নীক। সম্প্রতি চৌত্রিশ বৎসর বয়সে একটি কন্যা জন্মিয়াছে। কন্যার জন্মদিনে মির্জা দাউদ এক সহস্র তোলা সুবর্ণ বিতরণ করিয়াছেন—তারপর তাঁহার গৃহে সপ্তাহব্যাপী উৎসব চলিযাছিল। নগরে ধন্য ধন্য পড়িয়া গিয়াছিল।

বস্তুত মির্জা দাউদের মত সর্বজনপ্রিয় বহু সম্মানিত ব্যক্তি নগরে আর দ্বিতীয় নাই। উচ্চ-নীচ, ধনী-নির্ধন সকলেই শ্রদ্ধা ও সম্মান করে। স্বয়ং রাজা সামরী তাঁহাকে বন্ধুর মধ্যে গণ্য করেন। এদিকে ব্যবসায়ে দিন দিন অধিক অর্থাগম হইতেছে। মানুষ পৃথিবীতে কিছু পাইলে সুখী হয়, কিছুরই তাঁহার অভাব নাই।

একদিন গ্রীষ্মের সায়াহ্নে পশ্চিম দিগ্বলয় রঞ্জিত করিয়া সূর্যাস্ত হইতেছে, দূরে লাক্ষাদ্বীপ হইতে সুগন্ধ বহন করিয়া স্নিগ্ধ বায়ু বহিতে আরম্ভ করিয়াছে। আকাশ মেঘ-নির্মুক্ত। সমস্ত দিন গরম ভোগ করিয়া নগরের নরনারী শীতল বায়ু সেবন করিবার জন্য এই সময় বন্দরের ঘাটে আসিয়া জমিয়াছে। বহুদূর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অর্ধচন্দ্রাকৃতি ঘাট—বড় বড় চতুষ্কোণ পাথর দিয়া বাঁধানো। পাথরের উপর সারি সারি জাহাজ বাঁধিবার লোহার কড়া। জোয়ারের সময় সমুদ্রের জল ওই ঘাটের কানায় কানায় ভরিয়া উঠে, আবার ভাটার সময় সিক্ত বালুকারাশি মধ্যে রাখিয়া

দূরে সরিয়া যায়। এই ঘাটই নগরের কর্মকেন্দ্র। ক্রয়-বিক্রয়, দর-দস্তুর, আমোদ-প্রমোদ সমস্তই এই স্থানে অনুষ্ঠিত হয়। তাই সকল সময় এখানে মানুষের ভিড়।

সে সময় ঘাটে একটিও নবাগত কিংবা বহির্গামী বাণিজ্যতরী ছিল না। কাজকর্ম কিছু শিথিল। নাগরিকগণ নানা বিচিত্র বেশ পরিধান করিয়া কেহ সস্ত্রীক সপুত্র-কন্যা পদচারণ করিতেছে, কেহ উচ্চৈঃস্বরে গান ধরিয়াছে। চঞ্চলমতি কিশোরগণ ছুটাছুটি করিয়া খেলা করিতেছে, আবার কেহ বা ঘাট হইতে সমুদ্রের জলে লাফাইয়া পড়িয়া সন্তরণ করিতেছে।

চীনদেশীয় এক বাজিকর নানা প্রকার অদ্ভুত খেলা দেখাইতেছে। জনতার মধ্য হইতে মাঝে মাঝে উচ্চ হাসির রোল উঠিতেছে।

বাজিকর একজন স্থূলকায় প্রৌঢ় সিংহলীকে ধরিয়া তাহার কানের মধ্যে দৃষ্টি-পাত করিয়া বলিল, 'তোমার মাথার মধ্যে ২৫৬টি পাথরে নুড়ি রহিয়াছে, বল তো বাহির করিয়া দিই।' অমনিই জনতা সোল্লাসে চীৎকার করিয়া উঠিল, 'বাহির কর, বাহির কর।' তখন বাজিকর ক্ষিপ্রহস্তে ক্ষুদ্র চিমটা দিয়া তাহার কর্ণ হইতে সুপারির মত বড় বড় অসংখ্য পাথর বাহির করিয়া মাটিতে স্তূপীকৃত করিল। প্রৌঢ় সিংহলী বিস্ময়ে বিহ্বল হইয়া চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া তাহা দেখিতে লাগিল। ভারি হাসির একটা ধুম পড়িয়া গেল। একজন পরিহাস করিয়া বলিল, 'শেঠ তোমার মাথা যে এত নিরেট, তাহা জানিতাম না।'

ক্রমে সূর্য অস্তমিত হইল। সমুদ্রের গায় সীসার রঙ লাগিল। দিগন্তরেখার যে স্থানটায় সূর্য অস্ত গিয়াছিল, তাহাকে কেন্দ্র করিয়া সন্ধ্যার রক্তিমাভা ধীরে ধীরে সংকুচিত হইয়া আসিতে লাগিল।

এমন সময় দূরে সমুদ্রবক্ষে সেই রক্তিমাভার সম্মুখে তিনটি কৃষ্ণবর্ণের ছায়া আবির্ভূত হইল। সকলে দেখিল, তিনখানি জাহাজ বন্দরের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে।

তখন, জাহাজ কোথা হইতে আসিতেছে, কাহার জাহাজ—ইহা লইয়া ঘাটের দর্শকদিগের মধ্যে তর্ক চলিতে লাগিল। কেহ বলিল, আরবী জাহাজ; কেহ বলিল, চীনা। কিন্তু অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছিল—কোন দেশীয় জাহাজ নিশ্চয়রূপে কিছু বুঝা গেল না।

মির্জা দাউদ ঘাটে ছিলেন। তিনি বহুক্ষণ একদৃষ্টে সেই জাহাজ তিনটির প্রতি চাহিয়া রহিলেন। ক্রমে তাঁহার মুখে উদ্বেগের চিহ্ন দেখা দিল। তিনি অস্ফুটস্বরে কহিলেন, 'পোর্তুগীজ জাহাজ।—কিন্তু ফিরিঙ্গী কোন্ পথে আসিল?'

তারপর গগনপ্রান্তে দিবা-দীপ্তি নিবিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে তিনটি জীর্ণ সিন্ধু-বিধ্বস্ত ক্ষুদ্র পোত ছিন্ন পাল নামাইয়া কালিঘাটের বন্দরে আসিয়া ভিড়িল।

পরদিন প্রভাতে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে মির্জা দাউদ বন্দরে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, কয়েকজন বিদেশীকে ঘিরিয়া ভারি ভিড় জমিয়া গিয়াছে। ফিরিঙ্গীগণ অপরিচিত ভাষায় কি বলিতেছে। কেহই বুঝিতেছে না এবং প্রত্যুত্তরে নানা দেশীয় ভাষায় তাহাদের প্রশ্ন করিতেছে। মির্জা দাউদ ভিড় ঠেলিয়া তাহাদের সম্মুখীন হইলেন। তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া সকলে সম্মানে পথ ছাড়িয়া দিল।

আগন্তুকদিগের মধ্যে একজন বলিল, 'এখানে পোর্তুগীজ ভাষা বুঝে, এমন কেহ কি নাই? আমি জামোরিনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাই—দোভাষী খুঁজিতেছি।'

মির্জা দাউদ দেখিলেন, বক্তা শালপ্রাংশু বিশালদেহ এক পুরুষ। তপ্ত কাঞ্চনের ন্যায় বর্ণ, দীর্ঘ স্বর্ণাভ কেশ এবং হ্রস্ব সূচাগ্র শ্মশ্রুমণ্ডিত মুখমণ্ডল। ঊর্ধ্বাঙ্গে সোনার জরির কাজ করা অতি মূল্যবান মখমলের অঙ্গরক্ষা কটি হইতে জানু পর্যন্ত ওই মখমলের জাঙিয়া এবং জানু হইতে নিম্নে পদদ্বয় চর্মনির্মিত খাপে আবৃত। মস্তকে টুপির উপর কঙ্কপত্র বক্রভাবে অবস্থিত ; এই পুরুষের সহিত অন্য পাঁচ-ছয়জন যাহারা রহিয়াছে, তাহারাও প্রায় অনুরূপ বেশধারী। সকলের কটিবন্ধে তরবারি।

মির্জা দাউদ এই প্রধান পুরুষের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া গম্ভীর স্বরে কহিলেন, 'আমি পর্তুগীজ ভাষা বুঝি।'

নবাগত কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে মির্জা দাউদের মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল। তাহার মুখ অন্ধকার হইল। সে ধীরে ধীরে কহিল, 'তুমি দেখিতেছি মুর!'

এই তিনটি শব্দের অন্তর্নিহিত যে সুতীক্ষ্ম ঘৃণা, তাহা মির্জা দাউদকে বিদ্ধ করিল। তিনিও মনোগত বিদ্বেষ গোপন করিবার চেষ্টা না করিয়া কহিলেন, 'হ্যাঁ, আমি মুর। তোমরা দেখিতেছি পোর্তুগীজ—জলদস্যু ; তোমাদের সহিত পরিচয় আমার প্রথম নহে, কিন্তু ফিরিঙ্গীর সঙ্গে আমাদের সদ্ভাব নাই।'

এতক্ষণে দ্বিতীয় একজন পোর্তুগীজ কথা কহিল। তাহার বয়স অল্প, উদ্ধত কন্ঠে বলিল, 'মুর-কুক্কুরের সহিত আমরা সদ্ভাব রাখি না—মুরের উচ্ছেদ করাই আমাদের ধর্ম।

নিমেষের মধ্যে মির্জা দাউদের কটি হইতে ছুরিকা বাহির হইয়া আসিল, দুই চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু পরক্ষণেই আগন্তুকদিগের প্রধান ব্যক্তি হাত তুলিয়া তাঁহাকে নিরস্ত করিল। বিনীতস্বরে কহিল, 'মহাশয়, আমার এই স্পর্ধিত সঙ্গীকে ক্ষমা করুন। আপনি মুর এবং আমরা পোর্তুগীজ বটে। কিন্তু আমরা উভয়েই ব্যবসায়ী, জলদস্যু নহি। অন্যত্র যাহাই হোক্, এখানে আমার সহিত আপনাদের বিবাদ নাই। বরঞ্চ আপনার হৃদ্যতা লাভ করিলেই আমরা কৃতার্থ হইব। তারপর নিজ সঙ্গীর দিকে ফিরিয়া বলিল, 'পেড্রো, আর কখনো যদি তোমার মুখে এরূপ শুনিতে পাই, তোমার প্রত্যেক অস্থি চাকায় ভাঙিয়া তারপর ডালকুত্তা দিয়া খাওয়াইব।'

ভয়ে পেড্রোর মুখ পীতবর্ণ হইয়া গেল। কিন্তু তথাপি সে কম্পিত বিদ্রোহের কণ্ঠে কহিল, 'আমি সত্য কথা বলিতে ভয় করি না। মুর মাত্রেই আমাদের ঘৃণার পাত্র। আপনি নিজেও তো মুরকে—'

তাহার কথা শেষ হইবার পূর্বেই প্রথম ব্যক্তি বিদ্যুতের মতো দুই হাত বাড়াইয়া তাহার কণ্ঠ চাপিয়া ধরিল। বজ্রমুষ্টিতে নিঃশব্দে কিছুক্ষণ তাহার কণ্ঠনালী চাপিয়া থাকিবার পর ছাড়িয়া দিতেই পেড্রো হতজ্ঞান হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। তাহার প্রতি আর দৃকপাত না করিয়া প্রথম ব্যক্তি মির্জা দাউদের দিকে ফিরিয়া ঈষৎ হাস্যে কহিল, মিথ্যাবাদীর দণ্ডদান ধার্মিকের কর্তব্য। এখন দয়া করিয়া আমাদের সহিত জামোরিনের নিকট গিয়া আমার নিবেদন তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলে আপনার নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিব।'—বলিয়া মাথার টুপি খুলিয়া আভূমি লুণ্ঠিত হইয়া অভিবাদন করিল। দর্শকবৃন্দ—যাহারা পোর্তুগীজ ভাষা বুঝিল না, তাহারা অবাক হইয়া এই দুর্বোধ্য অভিনয় দেখিতে লাগিল।

মির্জা দাউদ আগন্তুকের মিষ্ট বাক্যে ভুলিলেন না, অটল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। শেষে ধীরে ধীরে কহিলেন, 'ফিরিঙ্গী, তুমি অতি ধূর্ত', কি জন্য সামরীর রাজ্যে আসিয়াছ, সত্য বল।'

'বাণিজ্য করিতে।'

'খ্রীষ্টান, আমি তোমাদের চিনি। কলহ তোমাদের ব্যবসা, লোভ তোমাদের ধর্ম', *পরশ্রীকাতরতা তোমাদের স্বভাব। এ রাজ্যে কলহ-বিদ্বেষ নাই—হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসসমান, হিব্রু নির্বিবাদে শান্তিতে ব্যবসা-বাণিজ্য করিতেছে। সত্য বল, কি উদ্দেশ্যে এই হিন্দে পদার্পণ করিয়াছ '

ফিরিঙ্গীর মুখ রক্তলীন হইয়া গেল। শুধু তাহার চক্ষুযুগল জ্বলন্ত অঙ্গারের মত নিষ্ফল ক্রোধ ও হিংসাবিকীর্ণ করিতে লাগিল। কিন্তু পরক্ষণেই আপনাকে সংবরণ করিয়া সে কণ্ঠবিলম্বিত সুবর্ণ-ক্রুশ হস্তে তুলিয়া বলিল, 'এই ক্রুশ স্পর্শ করিয়া সত্য করিতেছি - সকলের সহিত সদ্ভাব রাখিয়া বাণিজ্য করা ব্যতীত আমাদের আর অন্য উদ্দেশ্য নাই।'

ক্ষণকাল নিঃশব্দে তাহার মুখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া মির্জা দাউদ কহিলেন, 'তোমার কথা বিশ্বাস করিলাম। চল, সামরীর প্রাসাদে তোমাদের লইয়া যাই।'

তখন বিদেশীরা মির্জা দাউদের অনুসরণ করিয়া রাজপ্রাসাদ অভিমুখে চলিল। পেড্রোর সংজ্ঞাহীন দেহ ঘাটের পাথরের উপর মৃতবৎ পড়িয়া রহিল।

প্রাসাদে উপস্থিত হইয়া সামরীর সম্মুখে নতজানু হইয়া তাহার বস্ত্রপ্রান্ত চুম্বন করিয়া পোর্তুগীজ বণিকদিগের অধিনায়ক বলিল, 'আমার নাম ভাস্কো-ডা-গামা—আমি পোর্তুগালের রাজদূত। আপনার নিকট কালিকটে বাণিজ্য করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিতেছি।' এই বলিয়া পোর্তুগাল-রাজ-প্রেরিত মহার্ঘ উপঢৌকনসকল সামরীর সম্মুখে স্থাপন করিতে সঙ্গীগণকে ইঙ্গিত করিল।

মুখে যাহাই বলুন, সন্দেহ এবং অবিশ্বাস মির্জা দাউদের অন্তর হইতে দূর হইল না। তিনি ফিরিঙ্গীকে পূর্ব হইতেই চিনিতেন—মুরমাত্রেই চিনিত। স্বদেশে বহু সংঘর্ষের ভিতর দিয়া এই পরিচয় ঘনিষ্ঠ হইয়াছিল। তাহারা জানিত যে, ফিরিঙ্গী অতিশয় অর্থলিপ্সু ও ভোগলুব্ধ। ইহাদের জন্মভূমি অর্থপ্রসূ নহে; তাই অন্নের জন্য ইহাদিগকে দৈহিক ও মানসিক কঠোরতার মধ্যে জীবনযাপন করিতে হয় বটে, কিন্তু এই জন্যই ইহারা অপেক্ষাকৃত ধনী মুসলমানদিগকে অত্যন্ত ঈর্ষা করে। পরের উন্নতি ইহাদের চক্ষুশূল। কোথাও একবার ধনরত্ন-ঐশ্বর্যের সন্ধান পাইলে ইহাদের লালসা ও ক্ষুধা এত উগ্র ও নির্মম হইয়া উঠে যে, কোনও মতে সেখানে প্রবেশ লাভ করিয়া নিজেকে একবার ভালরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলে শত্রুমিত্র নির্বিচারে সকলের উপর দুর্বিনীত বাহুবল, স্পর্ধা ও জুলুম প্রকাশ করিতে থাকে। ইহারা নিরতিশয় কলহপ্রিয় ও যুদ্ধনিপুণ। স্বার্থরক্ষার জন্য এমন কাজ নাই যাহা ইহারা পারে না এবং স্বজাতির স্বার্থবর্ধনের জন্য প্রাণ পর্যন্ত উৎসর্গ করিতে ইহারা তিলমাত্র কুণ্ঠিত নহে।

পোর্তুগাল হইতে সমুদ্র পথে আফ্রিকা প্রদক্ষিণ করিয়া আজ পর্যন্ত কেহ ভারতবর্ষে আসে নাই, এ পথ এতদিন অজ্ঞাত ছিল। ভাস্কো-ডা-গামা সেই পথ

ইউরোপীয়দের জন্য উন্মুক্ত করিয়া দিয়া বহু নূতন সম্ভাবনা ও দুর্ভাবনার সৃষ্টি করিল। সম্প্রতি ভাস্কো-ডা-গামার উদ্দেশ্যও নিশ্চয়ভাবে বুঝা যায় না। অথচ উদ্ধত ও কটুভাষী পেড্রোর কণ্ঠরোধ করিয়া সে যে একটা গূঢ় অভিপ্রায় গোপন করিয়া গেল, তাহাও বুঝিতে মির্জা দাউদের বিলম্ব হইল না। শঙ্কা ও সংশয়ের মেঘে তাঁহার মন আচ্ছন্ন হইয়া রহিল। পোর্তুগীজগণ কালিকটে বাস করিতে লাগিল এবং দিন দিন নূতন পণ্যে তরণী পূর্ণ করিতে লাগিল। অতি অপদার্থ পণ্য দ্বিগুণ চতুর্গুণ মূল্য দিয়া কিনিতে লাগিল। ইহাতে নির্বোধ ব্যবসায়ীরা যতই উৎফুল্ল হউক না কেন, মির্জা দাউদের ন্যায় বহুদর্শী শ্রেষ্ঠীদের মনে সন্দেহ ততই ঘনীভূত হইয়া উঠিল। উচিত মূল্যের অধিক মূল্য দিয়া পণ্য ক্রয় করা ব্যবসায়ীর স্বভাব নহে, অথচ নবাগতরা অব্যবসায়ী বা নির্বোধ নহে। এ ক্ষেত্রে বাণিজ্য ছলমাত্র, অন্য কোনও দুরভিসন্ধি তাহাদের অন্তরে প্রচ্ছন্ন আছে, ইহা অনুমান করিয়া বিচক্ষণ ব্যবসায়ীদের চিন্তা ও উৎকণ্ঠার অবধি রহিল না।

এইরূপে কিছুকাল বিগত হইল। কালিকটের জীবনপ্রবাহ পূর্ববৎ প্রশান্তভাবে চলিতে লাগিল।

একদিন শরৎকালে মেঘমার্জিত আকাশে শুভ্র পাল উড়াইয়া দুইটি জাহাজ বন্দরে প্রবেশ করিল। সঙ্গে সঙ্গে নগরে নগরে রাষ্ট্র হইয়া গেল যে বঙ্গদেশ হইতে প্রভাকর শ্রেষ্ঠীর নৌকা আসিতেছে। প্রভাকর শেঠ অতি প্রসিদ্ধ বণিক—প্রতি বৎসর এই সময় লক্ষাধিক মুদ্রার বস্ত্রাদি পণ্য বহন করিয়া তাহার তরণী কালিকটে উপস্থিত হয়। কাশ্মীরের শাল, বারাণসীর চেলি, কৌশেয় পট্ট, বাংলার মলমল কিনিবার জন্য কালিকটের সওদাগর-সমাজে হুড়াহুড়ি পড়িয়া যায়। এত সুন্দর এবং এত মূল্যবান বস্ত্র কেহই আনিতে পারে না, সে জন্য প্রভাকরের এত খ্যাতি।

প্রভাকরের নৌকা ঘাটে লাগিবার পূর্বেই নগরের বড় বড় ব্যবসায়ীরা ঘাটে সমবেত হইয়াছিলেন। প্রভাকর নৌকার উপর দাঁড়াইয়া পরিচিত সকলকে নমস্কার-সম্ভাষণাদি করিতে লাগিল। সে অতিশয় বাক্‌পটু ও হাস্যপ্রিয়, এজন্য সকলেই তাহাকে ভালবাসিত।

হিব্রু মূশা ইব্রাহিম তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, 'প্রভাকর, এবার তোমার দেরি দেখিয়া আমরা ভাবিয়াছিলাম, বুঝি আর আসলে না—পথে তোমাদের সুন্দর-বনের কুমীর তোমাকে পেটে পুরিয়াছে!'

প্রভাকর হাসিয়া বলিল, 'মূশা সাহেব, পেটে পুরিলেও কুমীর আমাকে হজম করিতে পারিত না। এই যে মির্জা সাহেব! আদাব আদাব—শরীর গতিক সব ভালো তো? এবার আপনার ফরমাশী জিনিস সমস্ত আনিয়াছি, কত লইতে পারেন দেখিব। আপনার কোমরে তলোয়ারখানি নূতন দেখিতেছি, ডামাস্কাসের বুঝি? আমার কিন্তু এক জোড়া চাই—গৌড়েশ্বরের কাছে বাক্যদত্ত হইয়া আছি। ভাল কথা, পথে আসিতে শ্রীখণ্ডের নিকট আপনার যবদ্বীপ-যাত্রী জাহাজের সঙ্গে দেখা হইয়াছিল—খবর সব ভালো! হায়দার মুস্তফা যে, ইতিমধ্যে কয়টি সাদি করিলেন? এবার কিন্তু ইস্পাহানী আঙ্গুরের রস না খাওয়াইলে বড অন্যায় হইবে। জাম্বো, শাঁখালুর মত দাঁত বাহির করিয়া হাসিস না—দড়িটা ধর্!'

নৌকা বাঁধা হইলে প্রভাকর ঘাটে নামিয়া সকলের সহিত আলিঙ্গনাদি করিল।

তখন মির্জা দাউদ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'প্রভাকর, কি কি সওদা আনিলে?'

প্রভাকর বলিল, 'এবার যে মলমল আনিয়াছি মির্জা সাহেব, তেমন মলমল আজ পর্যন্ত কখনও চোখে দেখেন নাই। মাকড়শার জালের চেয়েও হালকা—মুঠির মধ্যে দেড়শ গজ কাপড় ধরা যায়। কিন্তু এক থান কাপড়ের দাম পাঁচ তোলা সোনা, তার কমে দিতে পারিব না। কোচিনে চার তোলা পর্যন্ত দিতে চাহিয়াছিল—আমি লই নাই। শেষে কি লোকসান দিয়া ঘরে ফিরিব? শেঠনী তাহা হইলে আমার মুখ দেখিবে না।'

মির্জা দাউদ হাসিয়া বলিলেন, 'তা না দেখুক। তোমার মুখ না দেখিলেও শেঠনীর কোনও লোকসান হইবে না। এখন তোমার সওদা দেখাও।'

প্রভাকর বলিল, 'বলেন কি মির্জা সাহেব, লোকসান হইবে না? শেঠনীর এমন যৌবনকাল, কাঁচা বয়স, এখন স্বামীর মুখদর্শন না করিলে জীবন-যৌবন সমস্তই লোকসান হইয়া যাইবে যে!—ভালো কথা, গতবারে শুনিয়াছিলাম, আপনার বিবি সাহেবা নাকি অসুস্থ? তা কোনও শুভ সংবাদ আছে নাকি?'

মির্জা দাউদ বলিলেন, 'খোদার দয়ায় একটি মেয়ে হইয়াছে—'

প্রভাকর বলিল, 'এত বড় আনন্দের সংবাদ এতক্ষণ চাপিয়া রাখিয়াছিলেন! আমাদের দেশে বলে, মেয়ে হইলে পিতার পরমায়ু বৃদ্ধি হয়। তাহা হইলে আজ রাত্রে আপনার দৌলতখানায় আমার নিমন্ত্রণ রহিল। দেশে কুক্কুটাদি ভোজনের সুবিধা হয় না—দুষ্প্রাপ্যও বটে, আর ব্রাহ্মণগুলা বড়ই গণ্ডগোল করে।—ও বাবা! এটি আবার কে, মির্জা সাহেব? এ রকম পোশাক-পরিচ্ছদ তো কখনও দেখি নাই। ইহারা কোথা হইতে আসিল?'

মির্জা দাউদ ফিরিয়া দেখিলেন, ভাস্কো-ডা-গামা দুইজন সহচর সঙ্গে সেই দিকে আসিতেছে। ইতিমধ্যে কালিকটের পথে-ঘাটে দুইজনের দেখাসাক্ষাৎ ঘটিয়াছে বটে, কিন্তু কোন পক্ষেই সৌহার্দ বর্ধনের আগ্রহ দেখা যায় নাই। বরঞ্চ উভয়ে উভয়কে যথাসম্ভব এড়াইয়া চলিয়াছেন।

প্রভাকরের প্রশ্নের উত্তরে মির্জা দাউদ কহিলেন, 'ইহারা পোর্তুগীজ। ক্রমে পরিচয় পাইবে।'

ইত্যবসরে প্রভাকরের নৌকা হইতে পণ্যসামগ্রী সকল পরিদর্শনের জন্য ঘাটে নামানো হইতেছিল। সওদাগরেরা ভিড় করিয়া তাহাই দেখিতেছিলেন। মির্জা দাউদও সেই সঙ্গে যোগ দিলেন। অন্য দিক হইতে ভাস্কো-ডা-গামাও আসিয়া মিলিত হইল।

মলমলের নমুনা দেখিয়া মির্জা দাউদ কহিলেন, 'অতি উৎকৃষ্ট মলমল। প্রভাকর, এ জিনিস কত আনিয়াছ?'

প্রভাকর সগর্বে বলিল, 'পুরা এক জাহাজ।'

দাউদ কহিলেন, 'ভালো, আমি এক জাহাজই লইলাম। দর-দামের কথা আজ রাত্রে স্থির হইবে।'

ভাস্কো-ডা-গামা এরূপ অপূর্ব সূক্ষ্ম মলমল পূর্বে কখনও দেখে নাই। বস্তুত, এত মহার্ঘ্য মলমল পারস্য দেশ ভিন্ন অন্য কোথাও যাইত না। পোর্তুগাল, স্পেন, ফ্রান্স প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্যদেশে যাহা যাইত, তাহা অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট শ্রেণীর মলমল। ডা-গামার অন্তর লুব্ধ হইয়া উঠিল। পোপ এবং রাজা ইম্যানুয়েলকে নজর দিতে

হইলে ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বস্তু আর কি আছে? সে বলিল, 'এ মলমল আমি কিনিব।'

মির্জা দাউদ হাসিয়া বলিলেন, 'আর উপায় নাই। এই মলমল আমি কিনিয়াছি।'

ডা-গামা প্রভাকরের দিকে ফিরিয়া বলিল, 'আমি অধিক মূল্য দিব।'

মির্জা দাউদ বলিলেন, 'অধিক মূল্য দিলেও পাইবে না—এ মলমল এখন আমার।'

ডা-গামা সেদিকে কর্ণপাত না করিয়া প্রভাকরকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, 'আমি দ্বিগুণ মূল্য দিব।'

মির্জা দাউদ বিরক্ত হইয়া বলিলেন, 'শতগুণ দিলেও আর পাইবে না।'

ডা-গামা বিদ্যুৎবেগে মির্জা দাউদের দিকে ফিরিল। কর্কশকণ্ঠে কহিল, 'মূর চুপ কর্—আমি মালের মালিকের সহিত কথা কহিতেছি।'

প্রভাকর বুদ্ধিমান, মির্জা দাউদ তাহার পুরাতন খরিদ্দার, অথচ এই ব্যক্তিকে সে চেনেও না। সে বলিল, 'উনিই এখন মালের মালিক, আমি কেহ নই। উনি যদি আপনাকে বিক্রয় করিতে ইচ্ছা করেন, করিতে পারেন।'

ডা-গামার অশিষ্ট কথায় কিন্তু মির্জা দাউদের মুখ ক্রোধে কৃষ্ণবর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, তিনি তিক্তকণ্ঠে কহিলেন, 'ডা-গামা, পূর্বেও বুঝিয়াছিলাম, কিন্তু আজ তোর প্রকৃত স্বরূপ ধরা পড়িল। ব্যবসা তোর ভান মাত্র, তুই তস্কর। নচেৎ অনুচিত মূল্য দিয়া বাণিজ্য নষ্ট করিবি কেন?'

আহত ব্যাঘ্রের মত গর্জন করিয়া ভাস্কো-ডা-গামা নিজ কটি হইতে তরবারি বাহির করিল। দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিয়া ক্রোধকষায়িত নেত্রে কহিল, 'স্পর্ধিত মূর, আজ তোর রক্তে তরবারির কলঙ্ক ধৌত করিব।'

মির্জা দাউদও তরবারি নিষ্কোষিত করিয়া কহিলেন, বর্বর ফিরিঙ্গী, আজ তোকে জাহান্নামে পাঠাইব।'

মুহূর্তমধ্যে ব্যগ্র জনতা চতুর্দিকে সরিয়া গিয়া মধ্যে বৃত্তাকৃতি স্থান যুযুৎসুদের জন্য ছাড়িয়া দিল। শান্তিপূর্ণ বাণিজ্যকেন্দ্র হইলেও এরূপ ব্যাপার কালিকটে একান্ত বিরল নহে। কলহ যখন তরবারি পর্যন্ত পেঁছায়, তখন তাহা ভঞ্জন করিবার প্রয়াস যে শুধু নিষ্ফল নহে, অত্যন্ত বিপজ্জনক, তাহা কাহারও অবিদিত ছিল না। তাই সকলে সরিয়া দাঁড়াইয়া অস্ত্র দ্বারা উভয় পক্ষকে বিবাদের মীমাংসা করিবার সুবিধা করিয়া দিল।

ভাস্কো-ডা-গামা ও মির্জা দাউদ প্রথম দৃষ্টি বিনিময়েই পরস্পরকে যে বিষ-দৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন, সেই বিষ উভয়ের অন্তরে সঞ্চিত হইয়া আজ সামান্য সূত্র ধরিয়া দুর্নিবার বিরোধরূপে আত্মপ্রকাশ করিল। এ কলহ যে একজন না মরিলে নিবৃত্ত হইবে না, তাহা উভয়েই মনে মনে বুঝিলেন।

নিস্তব্ধ জনতার কেন্দ্রস্থলে অসিধারী দুইজন দাঁড়াইলেন। ভাস্কো-ডা-গামা বিশালকায়, প্রস্তরের মত কঠিন, হস্তীর মত বলশালী। মির্জা দাউদ অপেক্ষাকৃত কৃশ ও খর্ব; কিন্তু বিষধর কালসর্পের মত ক্ষিপ্র, তেজস্বী ও প্রাণসার। ভাস্কো-ডা-গামার তরবারি বেত্রবৎ ঋজু, তীক্ষ্ণাগ্র; মির্জা দাউদের তরবারি ঈষৎ বক্র ও ক্ষুরধার। নগ্ন কৃপাণহস্তে ক্ষণকালের জন্য দুইজন পরস্পরকে নিরীক্ষণ করিয়া লইলেন। তারপর ঝড়ের মত তরবারিকে অগ্রবর্তী করিয়া ভাস্কো-ডা-গামা আক্রমণ করিল।

কিন্তু ডা-গামার তরবারি মির্জা দাউদের অঙ্গ স্পর্শ করিবার পূর্বেই তিনি ক্ষিপ্র-হস্তে নিজ তরবারি দ্বারা তাহা অপসারিত করিয়া সরিয়া দাঁড়াইলেন এবং পরক্ষণেই তাঁহার বক্র অসি বিদ্যুতের মত একবার ডা-গামার জানু দংশন করিয়া ফিরিয়া আসিল। ডা-গামা পিছু হটিয়া আত্মরক্ষা করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। তাহরে জানুর চর্মাবরণ ধীরে ধীরে রক্তে ভিজিয়া উঠিল।

ডা-গামা সেদিকে দ্রূক্ষেপ করিল না ; কিন্তু সাবধান হইল। সংযত ও সতর্কভাবে অসিচালনা করিতে লাগিল। সে বুঝিল যে বিপক্ষকে অবজ্ঞা করিলে চলিবে না। মির্জা দাউদের অসি-কৌশল অসাধারণ, তাঁহার সম্মুখে দ্বিতীয়বার ভুল করিলে আর তাহা সংশোধনের অবকাশ থাকিবে না।

এদিকে মির্জা দাউদও বুঝিলেন যে, ডা-গামা অসি কৌশলে তাঁহার সমতুল্য কিন্তু তাঁহার অপেক্ষা দ্বিগুণ বলশালী। আবার তাঁহার মত ক্ষিপ্রগামী ও লঘুদেহ নহে বটে, কিন্তু তাহার তরবারি ঋজু এবং দীর্ঘ—মির্জা দাউদের তরবারি বক্র এবং খর্ব। তাঁহাদের যুদ্ধরীতিও সম্পূর্ণ পৃথক। এ ক্ষেত্রে মির্জা দাউদ দেখিলেন, ডা-গামার জয়ের সম্ভাবনাই অধিক। মির্জা দাউদ অত্যন্ত সাবধানে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

সর্প এবং নকুলের যুদ্ধে যেমন উভয়ে উভয়ের চক্ষুতে চক্ষু নিবদ্ধ রাখিয়া পরস্পরকে প্রদক্ষিণ করিতে থাকে এবং সুযোগ পাইবামাত্র তীরবেগে আক্রমণ করিয়া আবার স্বস্থানে ফিরিয়া আসে, ডা-গামা ও মির্জা দাউদও সেইরূপে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। অস্ত্রে অস্ত্রে প্রতিরুদ্ধ হইয়া মুহুর্মুহুঃ ঝনৎকার উঠিতে লাগিল, চঞ্চল অসিফলকে সূর্যকিরণ পড়িয়া তড়িৎরেখার মত জ্বলিয়া উঠিতে লাগিল। নিঃস্পন্দ জনব্যূহ সহস্রচক্ষু হইয়া এই অদ্ভুত যুদ্ধ দেখিতে লাগিল।

যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে মির্জা দাউদ বাক্যশূলে ডা-গামাকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন, 'ফিরিঙ্গী দস্যু, চাহিয়া দেখ, তোর রক্ত মানুষের রক্তের মত লাল নয়, শয়তানের রক্তের মত নীল। খ্রীষ্টান কুত্তা, এখনও ক্ষমা প্রার্থনা কর্—তোর প্রাণ ভিক্ষা দিব।

ডা-গামা কোনও উত্তর না দিয়া নিঃশব্দে যুদ্ধ করিতে লাগিল। শ্লেষ করিয়া মির্জা দাউদ যে তাহার ধৈর্যচ্যুতি ঘটাইবার চেষ্টা করিতেছেন, চতুর ডা-গামা তাহা বুঝিয়াছিল।

যুদ্ধ ক্রমে আরও প্রখর ও তীব্র হইয়া উঠিল। দুই যোদ্ধারই ঘন ঘন শ্বাস বহিল। সর্বাঙ্গে ঘাম ঝরিতে লাগিল। কিন্তু উভয়েই যেন এক অদৃশ্য বর্মে আচ্ছাদিত। ডা-গামার তরবারি বার বার মির্জা দাউদের কণ্ঠের নিকট হইতে, বক্ষের নিকট হইতে ব্যর্থ হইয়া ফিরিয়া গেল, মির্জা দাউদের অসি ডা-গামাকে ঘিরিয়া এক ঝাঁক ক্রুদ্ধ মৌমাছির মত গুঞ্জন করিয়া ফিরিতে লাগিল, কিন্তু কোথাও হুল ফুটাইতে পারিল না।

সহসা এক সময় ডা-গামা সভয়ে দেখিল যে সে ঘুরিতে ঘুরিতে একেবারে ঘাটের কিনারায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, আর এক পা পিছাইলেই সমুদ্রের জলে পড়িয়া যাইবে। মির্জা দাউদ তাহার মুখের ভাব দেখিয়া উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন। বিদ্রূপ বিষাক্ত কণ্ঠে কহিলেন, 'ফিরিঙ্গী, আজ তোকে ঐ সমুদ্রের জলে চুবাইব। তারপর মরা ইঁদুরের মত তোর রাজা ইম্যানুয়েলের কাছে তোকে বকশিশ পাঠাইয়া দিব।

এতক্ষণে মির্জা দাউদ যাহা চাহিতেছিলেন তাহাই হইল—ভাস্কো-ডা-গামা ধৈর্য হারাইল। উন্মত্ত বন্যমহিষের মত গর্জন করিয়া অসি ঊর্ধ্বে উত্তোলন করিয়া সে মির্জা দাউদকে আক্রমণ করিল। ইচ্ছা করিলে মির্জা দাউদ অনায়াসে ডা-গামাকে বধ করিতে পারিতেন কিন্তু তাহা না করিয়া তরবারির উল্টা পিঠ দিয়া ডা-গামার দক্ষিণ মুষ্ঠিতে দারুণ আঘাত করিল সঙ্গে সঙ্গে তাহার তরবারি হস্তমুক্ত হইয়া উর্ধে উৎক্ষিপ্ত হইয়া দূরে গিয়া পড়িল। অকস্মাৎ অস্ত্রহীন হইয়া ডা-গামা থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।

ডা-গামার দুইজন সহচর এতক্ষণ সকলের সঙ্গে দাঁড়াইয়া যুদ্ধ দেখিতেছিল। প্রভুর অপ্রত্যাশিত বিপৎপাতে তাহারা সাহায্য করিতে অগ্রসর হইল। দুই পদ অগ্রসর হইবার পূর্বেই, অতি বিশাল-কলেবর নিকষকৃষ্ণ হাবসী জাম্বো মাস্তুলের ন্যায় দুই হস্ত বাহির করিয়া তাহাদের কেশ ধরিয়া ফিরাইয়া আনিল এবং নিরতিশয় শুভ্র দুই পাটি দন্ত বিনিষ্ক্রান্ত করিয়া যাহা বলিল, তাহার একটি বর্ণও তাহারা বুঝিতে না পারিলেও জাম্বোর মনোগত অভিপ্রায় অনুধাবন করিতে তাহাদের বিন্দুমাত্র ক্লেশ হইল না।

মির্জা দাউদ তরবারির ধার ডা-গামার কণ্ঠে স্থাপন করিয়া কহিলেন, 'ডা-গামা, নতজানু হ, নহিলে তোকে বধ করিব।'

ডা-গামা, নতজানু হইল না—বাহুদ্বয় বক্ষে নিবদ্ধ করিয়া বিকৃতমুখে হাস্য করিয়া কহিল, 'মুর, নিরস্ত্রকে হত্যা করা তোদের স্বভাব বটে।'

মির্জা দাউদ কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, 'ভালো, তোকে ছাড়িয়া দিব; কিন্তু প্রতিজ্ঞা কর্—'

ডা-গামা কহিল, 'আমি কোন প্রতিজ্ঞা করিব না, তোর যা ইচ্ছা কর্।'

মির্জা দাউদ বলিলেন, 'শপথ কর্ যে, আজ হইতে সপ্তাহ মধ্যে সদলবলে এ দেশ ছাড়িয়া যাইবি, আর কখনও ফিরিবি না।'

ডা-গামা উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল, কহিল, 'মূঢ়, তুই অতি নির্বোধ। আমি শপথ করিব না, আমাকে বধ কর্। আমার রক্তে কালিকটের মাটি ভিজিলে হিন্দে ইম্যানুয়েলের জয়ধ্বজা রোপিত হইবে।'

মির্জা দাউদ হাস্য করিয়া কহিলেন, 'এতদিনে নিজ মুখে নিজের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলি। কিন্তু তাহা হইতে দিব না। ইম্যানুয়েলের জয়ধ্বজা কালিকটে রোপিত হইবে না। কালিকট চিরদিন পৃথিবীর সমস্ত জাতির মিলনক্ষেত্র হইয়া থাকিবে। প্রতিজ্ঞা কর্, নচেৎ—'

ডা-গামা ভ্রূকুটি করিয়া কহিল, 'নচেৎ?'

'নচেৎ পোর্তুগালে ফিরিয়া যাইতে একটি প্রাণীও জীবিত রাখিব না। তোদের জাহাজ পুড়াইয়া এই একশত ত্রিশজন লোককে কাটিয়া সমুদ্রের জলে ভাসাইয়া দিব।'

ডা-গামা স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল। কোন উত্তর দিল না।

মির্জা দাউদ পুনশ্চ কহিলেন, 'ডা-গামা, এখনও শপথ কর্, তোর ধর্মের উপর বিশ্বাস করিয়া ছাড়িয়া দিব।—ভাবিয়া দেখ্, তোরা মরিলে কে তোর দেশবাসী ভিক্ষুকদের পথ দেখাইয়া লইয়া আসিবে?'

ডা-গামা অবরুদ্ধ কণ্ঠে কহিল, 'শপথ করিতেছি।'

মির্জা দাউদ কহিলেন, 'তোদের যিশুর জননী মেরীর নামে শপথ কর।'

ডা-গামা তখন কম্পিত ক্রোধ-জর্জরিত কণ্ঠে শপথ করিল যে, সপ্তাহ মধ্যে এ দেশ ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে এবং আর কখনও ভারতভূমির উপর পদার্পণ করিবে না।

ডা-গামাকে ছাড়িয়া দিয়া মির্জা দাউদ ও আরও প্রধান প্রধান নাগরিকগণ সামরীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। সমস্ত বিবরণ আদ্যোপান্ত শুনিয়া সামরী কহিলেন, 'যতদিন উহারা আমার রাজ্যের কোনও প্রকার অনিষ্ট না করিতেছে, ততদিন শুধু সন্দেহের উপর নির্ভর করিয়া আমি উহাদিগকে রাজ্য হইতে বিতাড়িত করিতে পারি না। তবে কেহ যদি তোমাদের ব্যক্তিগত অনিষ্ট করিয়া থাকে, তোমরা প্রতিশোধ লইতে পার, আমি বাধা দিব না।'

সকলে সামরীকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন যে, ইহারা অত্যন্ত কুটবুদ্ধি ও যুদ্ধ নিপুণ। তাহাদের কামান, বন্দুক গোলাগুলি আছে; সুযোগ পাইলেই তাহারা বাহুবলে এই সোনার রাজ্য অপূর্ব অমরাবতী গ্রাস করিবে।

সামরী হাসিয়া উত্তর করিলেন, 'আমার সৈন্যদল নাই সত্য, কিন্তু এই সামরীবংশ পঞ্চদশ শতাব্দী ধরিয়া এই মসলন্দে রাজত্ব করিতেছে—কেহ তাহাকে রাজ্যভ্রষ্ট করে নাই। আমার সিংহাসন সুশাসন ও জনপ্রিয়তার উপর প্রতিষ্ঠিত। উহারা আমার কি করিতে পারে?'

সকলে নিরাশ হইয়া ফিরিয়া গেলেন।

সপ্তাহ পরে স্বর্ণপাত্র লিখিত সামরীর সন্ধিলিপি মস্তকে ধারণ করিয়া ভাস্কো-ডা-গামা অনুচরসহ জাহাজে উঠিল।

মির্জা দাউদ বন্দর হইতে ডাকিয়া বলিলেন, 'ডা-গামা, শপথ স্মরণ রাখিও।'

একটা ক্রুর হাস্য ডা-গামার মুখের উপর খেলিয়া গেল, মির্জা দাউদের প্রতি স্থিরদৃষ্টি রাখিয়া সে বলিল, 'দাউদ, আবার আমাদের সাক্ষাৎ হইবে।'

মির্জা দাউদ হাসিয়া উত্তর দিলেন, সম্ভব নয়। আমি মুসলমান—বেহেস্তে যাইব।'

ডা-গামা দুই চক্ষুতে অগ্নিবর্ষণ করিয়া কহিল, 'ইহজন্মেই আবার আমাদের সাক্ষাৎ হইবে।'

তারপর ধীরে ধীরে তাহার তিনটি জাহাজ বাহির হইয়া গেল।

চারি বৎসর অতীত হইয়াছে। চারি বৎসরে যাহা যাহা ঘটিয়াছে, তাহা এই কাহিনীর অন্তর্গত না হইলেও সংক্ষেপে বর্ণিত হইল। ভাস্কো-ডা-গামা কালিকট ত্যাগ করিবার দুই বৎসর পরে আবার পোর্তুগীজ জাহাজ ভারতবর্ষে আসিল। এবার পোর্তুগীজদের অধিনায়ক কেব্‌লার নামক একজন পাদ্রী এবং তাঁহার অধীনে নয়খানি জাহাজ। পাদ্রী আল্‌ভারেজ কালিকট বন্দরে প্রবেশ করিয়াই জাহাজ হইতে নগরের উপর গোলাবর্ষণ আরম্ভ করিলেন। ফলে বহু নাগরিকের প্রাণনাশ হইল। অনেকে আহত হইল এবং কয়েকটি অট্টালিকা চূর্ণ হইয়া গেল। এইরূপে রাজা-প্রজার মনে ভীতি ও কর্তব্যজ্ঞান সঞ্চারিত করিয়া পোর্তুগীজরা আবার ভারত ভূমিতে পদার্পণ করিল। রাজা সামরী আগন্তুকদিগকে সম্মান দেখাইলেন ও তাদের বাসের জন্য নগরের বাহিরে ভূমিদান করিয়া কুঠি নির্মাণের অনুমতি দিলেন। কিন্তু

পোর্তুগীজদের এই অহেতুক জিঘাংসা ও নিষ্ঠুরতায় কালিকটের জনসাধারণের মন তাহাদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও বিদ্বেষে পূর্ণ হইয়া উঠিল।

তারপর কলহ বাধিতে বিলম্ব হইল না। দাম্ভিক বিদেশীদের প্রতি যাহাদের ব্যক্তিগত বিদ্বেষ জন্মিয়াছিল, তাহারা ঝগড়া বাধাইয়া রক্তপাত করিতে লাগিল। পোর্তুগীজরাও জবাব দিল। ক্রমে ভিতরে বাহিরে আগুন জ্বলিয়া উঠিল। একদিন নাগরিকগণ পোর্তুগীজদের কুঠিতে অগ্নিসংযোগ করিয়া সত্তর জন ফিরিঙ্গীকে হত্যা করিল। অবশিষ্ট পলাইয়া জাহাজে উঠিল এবং জাহাজ হইতে গোলা মারিয়া নগরের এক অংশে আগুন লাগাইয়া দিল। তারপর সেই যে তাহারা কালিকট ছাড়িয়া গেল, দুই বৎসরের মধ্যে ফিরিয়া আসিল না।

কালিকটের রাজা-প্রজা নিঃশ্বাস ফেলিল,—ভাবিল—আপদ দূর হইয়াছে, আর ফিরিবে না।

শেষোক্ত ঘটনার বৎসর কয়েক পরে মির্জা দাউদ স্ত্রী-কন্যা লইয়া তাঁহার জন্মভূমি মরক্কো দেশে গেলেন। সেখানে কিছুদিন অবস্থানের পর বৃদ্ধ পিতাকে সঙ্গে লইয়া মক্কাশরীফ দর্শন করিলেন। তারপর তীর্থ-দর্শন শেষ করিয়া সকলে মিলিয়া কালিকটে প্রত্যাবর্তন করিতেছিলেন।

কথা ছিল, মক্কাশরীফ হইতে মির্জা দাউদ কালিকটে আসিবেন, তাঁহার পিতা মরক্কো দেশে ফিরিয়া যাইবেন। কিন্তু পিতা স্থবির ও জরাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছেন—অধিকদিন পরমায়ু নাই। পুনরায় মরক্কো যাইবার সুযোগ হয়তো শীঘ্র হইবে না, ততদিন পিতা বাঁচিবেন কি না—এই সকল বিবেচনা করিয়া মির্জা দাউদ তাঁহাকে ছাড়িলেন না, নিজের সঙ্গে কালিকটে লইয়া চলিলেন। বৃদ্ধও ঈদের চাঁদের মত সুন্দর ক্ষুদ্র নাতনীটিকে দেখিয়া ভুলিয়াছিলেন—তিনিও বিশেষ আপত্তি করিলেন না।

মক্কাশরীফ দর্শনের সময় কালিকটের কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সহিত মির্জা দাউদের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তিনি তাঁহাদের বলিলেন, 'আপনারাও কালিকটে ফিরিতেছেন—আমার জাহাজেই চলুন।' তাঁহারা আনন্দিত হইয়া সপরিবারে মির্জা দাউদের জাহাজে আশ্রয় লইলেন।

মক্কা হইতে কালিকট তিন মাসের পথ। জাহাজ যথাসময়ে আবার উপকূল ছাড়িয়া লোহিত সাগর পার হইল। ক্রমে পারস্য উপসাগর উত্তীর্ণ হইয়া ভারত সমুদ্রে আসিয়া পড়িল।

মহাসাগরের বুকের উপর বায়ু-বর্তুলিত পালের ভরে মির্জা দাউদের তরণী দক্ষিণাভিমুখে চলিয়াছে। চারিদিকে অতল জল দুলিতেছে, ফুলিতেছে—লক্ষকোটি খণ্ডে বিচূর্ণিত দর্পণের মত রবিকরে প্রতিফলিত হইতেছে। পূর্ণ দিগন্তরেখা অখণ্ড-ভাবে তরণীকে চারিদিকে বেষ্টন করিয়া আছে। কেবল বহু দূরে পূর্বচক্রবালে মেঘের মত কচ্ছভূমির তটবনানী ঈষন্মাত্র দেখা যাইতেছে।

জাহাজে যে অভিজ্ঞ আড়কাঠি আছে, সে বলিয়াছে যে, বায়ু দিক এবং গতি পরিবর্তিত না হইলে অষ্টাহমধ্যে কালিকটে পৌঁছান যাইবে। আশু যাত্রা শেষ কল্পনা করিয়া আরোহীরা সকলেই হৃষ্ট হইয়া উঠিয়াছেন।

সেদিন শুক্রবার, সূর্য ক্রমে মধ্য গগন অতিক্রম করিয়া পশ্চিমে ঢলিয়া পড়িল।

জাহাজের বিস্তৃত ছাদের উপর মির্জা দাউদ, তাঁহার পিতা ও আর আর পুরুষগণ দ্বিপ্রাহরিক নামাজ প্রায় শেষ করিয়াছেন। জাহাজের নিয়ামক সম্মুখে স্থিরদৃষ্টি করিয়া হালের নিকট নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া আছে। চারিদিক নিস্তব্ধ, শুধু তরণীর বেগবিদীর্ণ জলরাশি ফেন-হাস্যে কল্‌কল্‌ শব্দ করিতেছে।

এমন সময় আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত করিয়া মেঘগর্জনের ন্যায় ভীষণ শব্দে সকলে চমকিত হইয়া দেখিলেন, পশ্চাৎ হইতে পাঁচখানা ফিরিঙ্গি জাহাজ সমস্ত পাল তুলিয়া দিয়া সঙ্গে সঙ্গে অগণ্য দাঁড় বাহিয়া যেন বহুপদ বিশিষ্ট অতিকায় জলজন্তুর মত ছুটিয়া আসিতেছে। অতর্কিতে এত নিকটে আসিয়া পড়িয়াছে যে, জাহাজের মানুষগুলোকে পর্যন্ত স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। এই আকস্মিক দৃশ্য দেখিয়া সকলেই বুদ্ধিভ্রষ্টের মত সেই দিকে নিষ্পলকভাবে তাকাইয়া রহিলেন।

বিস্মিত হইবার মত দৃশ্য বটে! দুই দন্ড পূর্বেও চতুর্দিকে কোথাও একটা ভেলা পর্যন্ত ছিল না। সহসা সমুদ্রের কোন্‌ অতল গুহা হইতে পাঁচটা ভীষণ দৈত্য বাহির হইয়া আসিল? মির্জা দাউদের মন বলিল, আজ আর রক্ষা নাই। কামান দাগিয়া ইহারা নিজ আগমনবার্তা ঘোষণা করিয়াছে—আজ তাহারা দয়া মায়া দেখাইবে না। মুরের রক্তে হিংসা চরিতার্থ করিবার আজ তাহাদের সুযোগ মিলিয়াছে।

এরূপ ঘটনা প্রতীচ্যখন্ডের সমুদ্রবক্ষে পূর্বে কখনও ঘটে নাই। স্মরণাতীত কাল হইতে এই পথে শত শত তরণী অবাধে যাতায়াত করিয়াছে। চীন হইতে কাস্পীয় হ্রদ পর্যন্ত কেহ কখন হিংস্রিকা বা বোম্বেটের নাম পর্যন্ত শুনে নাই। স্থলপথ অপেক্ষা জলপথ অধিক নিরাপদ ছিল বলিয়াই জলবাণিজ্য এত প্রসার লাভ করিয়াছিল। কিন্তু আজ যুগযুগান্তরের বাহিতপণ্য অব্যাহত পথে স্বার্থান্ধ ফিরিঙ্গি তাহার অগ্নি অস্ত্র লইয়া পথরুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইল।

কিন্তু যুদ্ধদান করা মির্জা দাউদের পক্ষে অসম্ভব। তাঁহার জাহাজ তীর্থযাত্রীর জাহাজ, তাহাতে বারুদ-গোলা কিছুই নাই। আছে কেবল কতকগুলি অসহায় যুদ্ধানভিজ্ঞ ধর্মপরায়ণ তীর্থযাত্রী এবং তদপেক্ষাও অসহায় কতকগুলি নারী ও শিশু। এরূপ অবস্থায় পাঁচখানা রণপোতের সঙ্গে যুদ্ধ করা বাতুলতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। এক উপায় পলায়ন। কিন্তু মির্জা দাউদের জাহাজ কেবল পালের ভরে চলে; বিপক্ষের পাল দাঁড় দুই-ই আছে; এক্ষেত্রে পলায়নও সাধ্যাতীত।

মির্জা দাউদ ক্ষণকাল স্তব্ধভাবে চিন্তা করিলেন। একবার আকাশের দিকে দৃষ্টি করিলেন। আকাশ নির্মেঘ, বেলা প্রায় তৃতীয় প্রহর। রাত্রি হইতে বিলম্ব আছে। তিনি নাবিককে ডাকিয়া সমস্ত পাল তুলিয়া প্রাণপণে জাহাজ ছুটাইতে আজ্ঞা দিলেন।

কিন্তু এই আজ্ঞা পালিত হইতে না হইতে জলদস্যুদিগের পাঁচখানা জাহাজ হইতে এক সঙ্গে কামান ডাকিল। একটা গোলা বড় পালের ভিতর ছিদ্র করিয়া জাহাজের পরপারে গিয়া সমুদ্রগর্ভে প্রবেশ করিল, অন্যগুলো জাহাজের চারিদিকে জলের উপর পড়িল। কোনোটাই কিন্তু জাহাজকে গুরুতর জখম করিতে পারিল না।

জাহাজের পুরুষযাত্রীদের মুখ শুকাইল। নিম্ন হইতে ভীত শিশু ও নারীগণের আর্তস্বর ও ক্রন্দন উঠিল। দন্তে দন্ত চাপিয়া মির্জা দাউদ নাবিকদের হুকুম দিলেন, 'যতক্ষণ পার জাহাজ চালাও, ফিরিঙ্গী দস্যুর হাতে ধরা দিব না।'

এমন সময় মির্জা দাউদের চারি বৎসরের কন্যা হাঁপাইতে হাঁপাইতে উপরে উঠিয়া আসিয়া পিতার জানু জড়াইয়া ধরিল। বলিল, 'বাবা, মা তোমাকে ডাকছেন।'—বলিয়া পিতার মুখের দিকে চোখ তুলিয়াই উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল, 'বাবা, আমার বড় ভয় করছে।'

মির্জা দাউদ কন্যাকে দুই হাতে তুলিয়া বুকে চাপিয়া ধরিলেন। তাহার কানে কানে কহিলেন, 'হারুণা, কাঁদিস না। তুই মুরের কন্যা—তোর কিসের ভয়? আজ আমরা সকলে একসঙ্গে বেহেস্তে যাইব।'

কন্যাকে পিতার ক্রোড়ে দিয়া মির্জা দাউদ নিচে নামিয়া গেলেন। সম্মুখেই আকুলনয়না স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ হইল।

নিজ কটি হইতে ক্ষুদ্র মাণিক্যখচিত ছুরিকা পত্নীর হস্তে দিয়া সংযত কণ্ঠে কহিলেন, 'সালেহা, বোধ হয় আজ অন্তিমকাল উপস্থিত হইয়াছে। বোম্বেটে জাহাজ পিছু লইয়াছে। যদি উহারা এ জাহজে পদার্পণ করে, এ ছুরি নিজের উপর ব্যবহার করিও। তার পূর্বে কিছু করিও না। আর অন্যান্য স্ত্রীলোকদের আশ্বাস দিও, অকারণে ভয় না পায়। চলিলাম।—এই বলিয়া মুহূর্তকালের জন্য পত্নীর মস্তক বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া মির্জা দাউদ উপরে ফিরিয়া গেলেন।

উপরে উঠিয়া দেখিলেন, এই অল্পকাল মধ্যে দস্যু জাহাজগুলি অর্ধচন্দ্রাকারে তাঁহাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। এত নিকটে আসিয়া পড়িয়াছে যে, তাহাদের কণ্ঠস্বর পর্যন্ত শুনা যাইতেছে। মির্জা দাউদ দেখিলেন, প্রত্যেক জাহাজ হইতে কামানের মুখ তাঁহাদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া আছে। এত নিকট হইতে এবার আর লক্ষ্যভ্রষ্ট হইবে না।

মির্জা দাউদের পিতা আসিয়া বলিলেন, 'দাউদ, আর উপায় নাই। ধরা না দিলে জাহাজডুবি হইয়া মরিতে হইবে।'

মির্জা দাউদ কহিলেন, 'ধরা দিলেও নিশ্চয় মরিতে হইবে, তাহার অপেক্ষা ডুবিয়া মরাই শ্রেয়।'

পিতা বলিলেন, 'সে কথা ঠিক। কিন্তু সঙ্গে শিশু ও স্ত্রীলোক রহিয়াছে। তাহাদের রক্ষা করিবার চেষ্টা করা উচিত নহে কি?'

মির্জা দাউদ কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, 'কিন্তু দস্যুরা শিশু ও নারীদের দয়া করিবে কি? বরঞ্চ—'

পিতা কহিলেন, 'ফিরিঙ্গী অর্থলোভী, অর্থের বিনিময়ে তাহাদের ছাড়িয়া দিতে পারে।'

অন্যান্য পুরুষগণও বৃদ্ধের বাক্য সমর্থন করিলেন। মির্জা দাউদ তখন কহিলেন, 'ভালো, চেষ্টা করিয়া দেখা যাক্।'

ঠিক এই সময় একখানা জাহাজ হইতে আবার কামান দাগিল। এবার গোলার আঘাতে প্রকাণ্ড মাস্তুল পালসুদ্ধ মড়মড় শব্দে ভাঙ্গিয়া পড়িল এবং সঙ্গে সঙ্গে স্তূপীকৃত পালের কাপড়ে আগুন লাগিয়া গেল।

রমণীরা এতক্ষণ পর্যন্ত আবরু রক্ষা করিয়া জাহাজের খোলের মধ্যেই ছিল, কিন্তু এবার লজ্জার বাধা মানিল না। সন্তানবতীরা সন্তান কোলে লইয়া, যাহাদের সন্তান নাই—তাহারা যে যেমন ভাবে ছিল, উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে উপরে উঠিয়া

আসিল। সকলেই ভয়-বিহ্বলা। কেহ ঊর্ধ্বমুখী নতজানু হইয়া ঈশ্বরের নিকট প্রাণের আকুল আবেদন জানাইতে লাগিল, কেহ শিশু-সন্তানকে দুই হাতে উচ্চে তুলিয়া ধরিয়া জলদস্যুদিগকে দেখাইয়া তাহাদিগের কৃপা আকর্ষণের চেষ্টা করিতে লাগিল।

এদিকে পালের আগুন ক্রমে বাড়িয়া উঠিয়া জাহাজময় ব্যাপ্ত হইবার উপক্রম করিল। পুরুষগণ সমুদ্র হইতে জল তুলিয়া অগ্নিনির্বাপণের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বহু কষ্টে অনেক জল ঢালিবার পর অগ্নি নির্বাপিত হইল। তখনকার মত জাহাজ রক্ষা পাইল।

একখানা ফিরিঙ্গী জাহাজ মির্জা দাউদের জাহাজের একেবারে পাশে আসিয়া পড়িয়াছিল? মধ্যে মাত্র একশত গজের ব্যবধান। কামান ঘুরাইয়া তাহারা আবার গোলা ছুঁড়িবার উদ্যোগ করিতেছিল। তখন মির্জা দাউদ উচ্চকণ্ঠে তাহাদিগকে ডাকিয়া কহিলেন, 'গোলা ছুঁড়িও না—আমরা আত্মসমর্পণ করিতেছি।'

কামান ছাড়িয়া তাহারা উল্লাসধ্বনি করিয়া উঠিল। তাহাদের মধ্যে একজন—বোধ হয়, সে-ই প্রধান নাবিক—কহিল, 'তোমাদের জাহাজে যত অস্ত্র আছে, জলে ফেলিয়া দাও—নহিলে কামান ছুঁড়িব।'

মির্জা দাউদ কহিলেন, 'আমাদের সঙ্গে কোন অস্ত্র নাই। ইহা তীর্থযাত্রীর জাহাজ। যাহা কিছু ধনরত্ন সঙ্গে আছে, দিতেছি—আমাদের ছাড়িয়া দাও।'

এইরূপ কথাবার্তা হইতেছে, এমন সময় আক্রমণকারী জাহাজের ভিতর হইতে একজন পুরুষ উপরে উঠিয়া আসিল। অতি মহার্ঘ্য বেশভুষায় সজ্জিত বিশাল দেহ এক পুরুষ। তাহাকে দেখিয়া মির্জা দাউদের বুকের রক্ত সহসা যেন স্তব্ধ হইয়া গেল। চিনিলেন—ভাস্কো-ডা-গামা। তাহার মুখের উপর কৃষ্ণ কালসর্পের মতো হিংসা যেন কুণ্ডলিত হইয়া আছে। মির্জা দাউদকে দেখিয়া ভাস্কো-ডা-গামা হাসিল। মাথায় কঙ্কপত্রযুক্ত টুপি খুলিয়া তাহা আভূমি সঞ্চারিত করিয়া বলিল, 'মির্জা দাউদ, আজ সুপ্রভাত। স্মরণ আছে,—বলিয়াছিলাম, আবার দেখা হইবে?'

মির্জা দাউদের মুখ দিয়া সহসা কথা বাহির হইল না। ভাস্কো ডা-গামা তখন পূর্বোক্ত প্রধান নাবিকের দিকে ফিরিয়া কঠোর কণ্ঠে কহিল, 'কাপ্তেন, কামান নীরব কেন? আমার হুকুম কি ভুলিয়া গিয়াছ?'

ভীত কাপ্তেন বলিল, 'প্রভু, উহারা ধনরত্ন দিয়া পরিত্রাণের আর্জি করিতেছে।'

দুই জাহাজ ক্রমে আরও নিকটবর্তী হইতেছিল। ভাস্কো-ডা-গামা আবার মির্জা দাউদের দিকে ফিরিয়া শ্লেষকণ্ঠে কহিল, 'মুর, ধনরত্ন দিয়া প্রাণভিক্ষা চাও।'

মির্জা দাউদ কহিলেন, 'নিজের প্রাণভিক্ষা চাহি না। আমাদের সর্বস্ব লইয়া বৃদ্ধা, নারী ও শিশুদের ছাড়িয়া দাও।'

ডা-গামা শত্রুর লাঞ্ছনার মিষ্ট রস অল্প অল্প পান করিতে লাগিল, কহিল, 'বৃদ্ধা, নারী ও শিশুদের ছাড়িয়া দিব? কিন্তু তাহাতে আমাদের লাভ? বরঞ্চ তোমরা যুবতী নারীদের আমাদের নিকট পাঠাইয়া দিয়া পুরুষগণ প্রাণ বাঁচাইতে পার। আমাদের জাহাজে কিছু স্ত্রীলোকের প্রয়োজন হইয়াছে। আমার নিজের জন্য নয়—খালাসীদের জন্য। আমার নারীতে রুচি নাই।'

ক্রোধে অপমানে মির্জা দাউদের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। বুঝিলেন, ডা-গামা

তাঁহাকে লইয়া খেলা করিতেছে। অতি কষ্টে কহিলেন, 'ডা-গামা, তোমার প্রস্তাবের উত্তর দিতে ঘৃণা হইতেছে। যদি অভিরুচি হয়, আমাদের সহিত যাহা মূল্যবান সামগ্রী ও স্বর্ণ রৌপ্য আছে, তাহা লইয়া আমাদের নিষ্কৃতি দাও। নতুবা কিছুই পাইবে না।'

ডা-গামা ভ্রূকুটি করিয়া কহিল, 'কিছুই পাইব না, তার অর্থ ?'

মির্জা দাউদ কহিলেন, 'তার অর্থ—জোর করিলে আমাদের মারিয়া ফেলিতে পারিবে, কিন্তু কিছু লাভ করিতে পারিবে না। যদি আমার জাহাজ চড়াও হবার চেষ্টা কর, তক্তা খুলিয়া জাহাজ ডুবাইয়া দিব।'

মির্জা দাউদের কথা শুনিয়া ডা-গামার ভ্রূকুটি গভীরতর হইল, সে নতমুখে চিন্তা করিতে লাগিল।

এদিকে জাহাজের মাস্তুল ভাঙিয়া যাওয়ায় মির্জা দাউদ পঙ্কে নিবদ্ধ হস্তীর মত চলচ্ছক্তিহীন। ফিরিঙ্গীর পাঁচখানা জাহাজ ধীরে ধীরে তিন দিক হইতে ঘিরিয়া আরও নিকটবর্তী হইতে লাগিল।

মির্জা দাউদ অধীর হইয়া কহিলেন, 'ডা-গামা, যাহা করিবে শীঘ্র কর। আমাদের সহিত বারো শত তোলা সোনা আছে—আরও অন্যান্য মহার্ঘ্য বস্তু আছে; যদি পাইতে ইচ্ছা কর, শীঘ্র বল। অধিক বিলম্ব করিলে সব হারাইবে।'

ডা-গামা বলিল, 'রমণীদের দিবে না ?'

মির্জা দাউদ গর্জিয়া উঠিলেন, 'না দিব না। আমরা স্ত্রী-কন্যার ব্যবসা করি না।'

ডা-গামা কহিল, 'মূর, এখনও তোর স্পর্ধা কমিল না। ভাল, অর্থই লইব। তোমার জাহাজে যাহা কিছু আছে, ভেলায় করিয়া আমার জাহাজে পাঠাও।'

'যাহা কিছু আছে, পাইলে ছাড়িয়া দিবে!'

'দিব।'

'তোমাকে বিশ্বাস কি ?'

'আমি মিথ্যা কথা বলি না।'

'মিথ্যাচারি, শপথ করিয়াছিলে, কখনও হিন্দে পদার্পণ করিবে না, তাহার কি হইল ?'

ডা-গামা হাসিয়া বলিল, 'এখনও হিন্দে পদার্পণ করি নাই।'

মির্জা দাউদ তখন অন্যান্য সকলের সহিত পরামর্শ করিলেন। সকলেই কহিলেন, উহাদের কবলে যখন পড়িয়াছি, তখন উহাদের কথাই বিশ্বাস করা ভিন্ন উপায় নাই। অগত্যা মির্জা দাউদ সম্মত হইলেন।

তখন এক ভেলা প্রস্তুত করিয়া তাহারই উপর যাহা কিছু ছিল, এমন কি, নারীগণের অলংকার পর্যন্ত খুলিয়া ডা-গামার জাহাজে পৌঁছাইয়া দেওয়া হইল।

ডা-গামা জিজ্ঞাসা করিল, 'তোমাদের আর কিছু নাই ?'

'না'।

'আবার জিজ্ঞাসা করিতেছি—নারীদের দিবে না ?'

অসহ্য ক্রোধে মির্জা দাউদের বাকরুদ্ধ হইয়া গেল। শুধু তার চক্ষুদ্বয় অগ্নি-শিখার মতো জ্বলিতে লাগিল।

ভাস্কো-ডা-গামা কালকূটের মতো হাসিল। বলিল, 'ভাল, তোমাদের যেরূপ অভিরুচি।' তারপর কাপ্তেনের দিকে ফিরিয়া বলিল, 'কাপ্তেন, গোলা মারিয়া উহাদের জাহাজে আগুন লাগাইয়া দাও। আজ মুসলমান কুকুরগুলোকে পুড়াইয়া মারিব।'

মির্জা দাউদ চীৎকার করিয়া উঠিলেন, 'শঠ। বিশ্বাসঘাতক! মিথ্যাবাদী শয়তান!'

ডা-গামা কহিল, 'মির্জা দাউদ, তোর প্রাণরক্ষা করিতে পারে এত অর্থ পৃথিবীতে নাই। তবে তুই তোর স্ত্রীর বিনিময়ে এখনও প্রাণরক্ষা করিতে পারিস। তোর স্ত্রীকে আমি বাঁদী করিয়া রাখিব।'

মির্জা দাউদ উন্মত্তের মতো গর্জন করিতে লাগিল, 'শয়তান! শয়তান!'

জাহাজে ভীষণ কোলাহল উঠিল। নর-নারী সকলে পাগলের মতো চারিদিকে ছুটাছুটি করিতে লাগিল। সকলেই যেন এই অভিশপ্ত জাহাজ হইতে পলাইবার চেষ্টা করিতেছে। চতুর্দিক হইতে আর্তরব উঠিল, রক্ষা কর। দয়া কর। প্রাণ বাঁচাও।

এই আকুল প্রার্থনার জবাব আসিল। সহসা শিলাবৃষ্টির মতো জাহাজের উপর বন্দুকের গুলি পড়িতে লাগিল। কেহ হত, কেহ আহত হইয়া পড়িতে লাগিল। মৃত্যুর রূপ যেন ভীষণতর রূপ ধরিয়া দেখা দিল।

মির্জা দাউদের পিতা ক্ষুদ্র হারুণাকে বক্ষে লইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে পুত্রের পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন। স্খলিত কণ্ঠে একবার শুধু ডাকিলেন, 'দাউদ!'

দুর্দম আবেগে মির্জা দাউদ একসঙ্গে পিতা ও কন্যাকে জড়াইয়া ধরিলেন, এমন সময় লাজলজ্জা বিসর্জন দিয়া সালেহা আসিয়া স্বামীর হস্ত ধরিয়া দাঁড়াইলেন।

মির্জা দাউদ বাষ্পাচ্ছন্ন চোখে একবার তিনজনের মুখের দিকে চাহিলেন, তারপর অবরুদ্ধ স্বরে কহিলেন, 'পিতা, ঈশ্বর কি নাই?'

সহসা হারুণা ক্ষুদ্র একটি কাতরোক্তি করিয়া এলাইয়া পড়িল। দ্রুত কন্যাকে নিজের ক্রোড়ে লইয়া মির্জা দাউদ দেখিলেন, তাহার দেহে প্রাণ নাই। নিষ্ঠুর গুলি বক্ষে প্রবেশ করিয়াছে।

তারপর দ্রুত অনুক্রমে স্ত্রী ও পিতা গুলির আঘাতে পড়িয়া গিয়া মরণ-যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিলেন। ভাস্কো-ডা-গামা তখন স্বয়ং ধূমায়িত বন্দুক হাতে করিয়া পিশাচের মতো উচ্চ হাসি হাসিতেছে।

সূর্য তখন পশ্চিম দিগন্তরেখা স্পর্শ করিয়াছে। আকাশ এবং সমুদ্র তপ্ত রক্তের মতো রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। সাগরবক্ষে সূর্যাস্ত হইতেছে।

এইবার পাঁচখানা জাহাজ হইতে এককালে কামান ডাকিল। গোলার সংঘাতে শীতার্ত বৃদ্ধের মতো মির্জা দাউদের জাহাজখানা কাঁপিয়া উঠিল। পালের কাপড়ে দপ করিয়া আবার আগুন জ্বলিয়া উঠিল। ধীরে ধীরে টলিতে টলিতে জাহাজ নিমজ্জিত হইতে লাগিল। আবার কামান গর্জিল। এবার জাহাজের সম্মুখ দিকটা ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। কলকল শব্দে জল ঢুকিতে লাগিল।

তারপর নিমেষের মধ্যে সমস্ত শেষ হইয়া গেল। আরোহীদের মিলিত কণ্ঠ হইতে এক মহা হাহাকার-ধ্বনি উঠিল। জ্বলন্ত জাহাজ অকস্মাৎ জীবিতবৎ সোজা দাঁড়াইয়া উঠিল; তারপর সবেগে সমুদ্রগর্ভে প্রবেশ করিল। যাত্রীদের উর্ধোত্থিত

কণ্ঠস্বর সহসা স্তব্ধ হইয়া গেল। মুহূর্তপূর্বে যেখানে জাহাজ ছিল, সেখানে আবর্তিত তরঙ্গশীর্ষ জলরাশি ক্রীড়া করিতে লাগিল।

ফিরিঙ্গী জাহাজগুলি চিত্রাপির্তবৎ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। প্রায়ান্ধকারে তাহাদিগকে যেন অন্য জগতের কোন ভৌতিক তরণীর মতো দেখাইতে লাগিল।

ক্ষণকাল পরে সান্ধ্য নীরবতা বিদীর্ণ করিয়া ভাস্কো-ডা-গামার জাহাজ হইতে দামামা ও তূর্য বাজিয়া উঠিল।

সূর্য তখন সমুদ্রপারে অস্তমিত হইয়া অন্য কোন নূতন গগনে উদিত হইয়াছে।

চুয়াচন্দন

একদিন গ্রীষ্মের শেষভাগে, সূর্য মধ্যাকাশে আরোহণ করিতে তখনও দণ্ড তিন-চার বাকি আছে, এমন সময় নবদ্বীপের স্নানঘাটে এক কৌতুকপ্রদ অভিনয় চলিতেছিল।

ভাগীরথীর পূর্বতটে নবদ্বীপ। স্নানের ঘাটও অতি বিস্তৃত—এক গঙ্গাঘাটে লক্ষ লোক স্নান করে। ঘাটের সারি সারি পৈঁঠাগুলি যেমন উত্তর-দক্ষিণে বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত, তেমনি প্রত্যেকটি পৈঁঠা প্রায় সেকালের সাধারণ রাজপথের মতো চওড়া। গ্রীষ্মের প্রখরতায় জল শুকাইয়া প্রায় সব পৈঁঠাই বাহির হইয়া পড়িয়াছে—এই এক ধাপ নামিলেই নদীর কাদা পায়ে ঠেকে। স্নানের ঘাট যেখানে শেষ হইয়াছে, সেখান হইতে বাঁধানো খেয়াঘাট আরম্ভ। তথায় খেয়ার নৌকা, জেলে-ডিঙ্গি, দুই-একটা হাজারমনী মহাজনী ভড় বাঁধা আছে। নৌকাগুলির ভিতরে দৈনিক রন্ধনকার্য চলিতেছে,—ছই ভেদ করিয়া মৃদু মৃদু ধূম উত্থিত হইতেছে।

বহু জনাকীর্ণ স্নান-ঘাটে ব্যস্ততার অন্ত নাই। আজ কৃষ্ণা চতুর্দশী। ঘাটের জনতাকে সমগ্রভাবে দর্শন করিলে মনে হয়, মুণ্ডিতশীর্ষ উপবীতধারী ব্রাহ্মণ ও প্রৌঢ়াবৃদ্ধা নারীর সংখ্যাই বেশী। ছেলেছোকরার দলও নেহাৎ কম নয়; তাহারা সাঁতার কাটিতেছে, জল তোলপাড় করিতেছে। নারীদের স্নানের জন্য কোনও পৃথক ব্যবস্থা নাই, যে যেখানে পাইতেছে সেখানেই স্নান করিতেছে। তরুণী বধূরা ঘোমটায় মুখ ঢাকিয়া টুপ টুপ ডুব দিতেছে। পর্দাপ্রথা বলিয়া কিছু নাই বটে, তবু অবগুণ্ঠন দ্বারা শালীনতা-রক্ষার একটা চেষ্টা আছে; যদিও সে-চেষ্টা তনু-সংলগ্ন সিক্তবস্ত্রে বিশেষ মর্যাদা পাইতেছে না। সেকালে বাঙালী মেয়েদের দেহলাবণ্য গোপন করিবার সংস্কার বড় বেশী প্রবল ছিল না; গৃহস্থ-কন্যাদের কাঁচুলি পরিবার রীতিও প্রচলিত হয় নাই।

যে যুগের কথা বলিতেছি, তাহা আজ হইতে চারি শতাব্দীরও অধিককাল হইল অতীত হইয়াছে। সম্ভবত আমাদের ঊর্ধতন পঞ্চদশ পুরুষ সে সময় জীবিত ছিলেন। তখন বাংলার ঘোর দুর্দিন যাইতেছিল। রাজশক্তি পাঠানের হাতে; ধর্ম ও সমাজের বন্ধন বহু যুগের অবহেলায় গলিত রজ্জুবন্ধনের ন্যায় খসিয়া পড়িতেছে। দেশও যেমন অরাজক, সমাজও তেমনি বহুরাজক। কেহ কাহারও শাসন মানে না। মৃত বৌদ্ধধর্মের শবনির্গলিত তন্ত্রবাদের সহিত শাক্ত ও শৈব মতবাদ মিশ্রিত হইয়া যে বীভৎস সমাচার উত্থিত হইয়াছে—তাহাই আকণ্ঠ পান করিয়া বাঙালী অন্ধ-মত্ততায় অধঃপথের পানে স্খলিতপদে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। সহজিয়া সাধনার নামে যে উচ্ছৃঙ্খল অনাচার চলিয়াছে, তাহার কোনও নিষেধ নাই। কে কাহাকে নিষেধ

করিবে ? যাহারা শক্তিমান, তাহারাই উচ্ছৃঙ্খলতায় অগ্রবর্তী। মাতৃকাসাধন, পঞ্চম-কার উদ্দাম নৃত্যে আসর দখল করিয়া আছে। প্রকৃত মনুষ্যত্বের চর্চা দেশ হইতে যেন উঠিয়া গিয়াছে।

তখন স্মার্ত রঘুনন্দন আচারকে ধর্মের নিগূঢ় বন্ধনে বাঁধিয়া সমাজের শোধন-সংস্কার আরম্ভ করেন নাই। কাণভট্ট রঘুনাথ মিথিলা জয় করিয়া ফিরিয়াছেন বটে, কিন্তু নবদ্বীপে সরস্বতীর পীঠ দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। নদের নিমাই তখন ব্যাকরণের টোলে ছাত্র পড়াইতেছেন ও নানাপ্রকার ছেলেমানুষি করিতেছেন। তখনও সেই হরিচরণশ্রুত প্রেমের বন্যা আসে নাই—বাঙালীর ক্লেদকলুষিত চিত্তের বহু শতাব্দীসঞ্চিত মলামাটি সেই পূত প্রবাহে ধৌত হইয়া যায় নাই।

১৪২৬ শকাব্দের প্রারম্ভে এক কৃষ্ণা চতুর্দশীর পূর্বাহ্নে বাংলার কেন্দ্র নবদ্বীপের ঘাটে কি হইতেছিল, তাহাই লইয়া এই আখ্যায়িকার আরম্ভ।

ঘাটে যে সকলেই স্নান করিতেছে, তাহা নয়। এক পাশে সারি সারি নাপিত বসিয়া গিয়াছে; বহু ভট্টাচার্য গোঁসাই গলা বাড়াইয়া ক্ষৌরী হইতেছেন। বুরুজের গোলাকৃতি চাতালে একদল উলঙ্গপ্রায় পন্ডিত দেহে সবেগে তৈলমর্দন করিতে করিতে ততোধিক বেগে তর্ক করিতেছেন। বাসুদেব সার্বভৌম মিথিলা হইতে সর্ববিদ্যায় পারংগম হইয়া ফিরিয়া আসিবার পর হইতে নবদ্বীপে বিদ্যাচর্চার সূত্রপাত হইয়াছিল। কিন্তু বিদ্যা তখনও হৃদয়ে আসন স্থাপন করেন নাই; তাই বাঙালী পন্ডিতের মুখের দাপট কিছু বেশী ছিল। শাস্ত্রীয় তর্ক অনেক সময় আঁচড়া-কামড়িতে পরিসমাপ্তি লাভ করিত।

তৈল-মসৃণ পন্ডিতদের তর্ক ও ন্যায়শাস্ত্রের সীমানা ছাড়াইয়া অরাজকতার দেশে প্রবেশ করিবার উপক্রম করিতেছিল। একজন অতি গৌরকান্তি যুবা—বয়স বিশ বছরের বেশি নয়—তর্ক বাধাইয়া দিয়া, পাশে দাঁড়াইয়া তাহাদের বিতন্ডা শুনিতেছিল ও মৃদু মৃদু হাস্য করিতেছিল। তাহার ঈষদরুণ আয়ত চক্ষু হইতে যেন তীক্ষ্ম বুদ্ধি, পান্ডিত্যের অভিমান ও কৌতুক একসঙ্গে ক্ষরিয়া পড়িতেছিল।

জলের কিনারায় বসিয়া কেহ কেহ পায়ে ঝামা ঘষিতেছিল। নারীরা বস্ত্রাবরণের মধ্যে ক্ষার-খৈল দিয়া গাত্র মার্জনা করিতেছিল। কয়েকজন বর্ষীয়ান্ ব্রাহ্মণ আবক্ষ জলে নামিয়া পূর্বমুখ হইয়া আহ্নিক করিতেছিলেন।

এই সময় দক্ষিণ দিকে গঙ্গার বাঁকের উপর দুইখানি বড় সামুদ্রিক নৌকা পালের ভরে উজান ঠেলিয়া ধীরে ধীরে নবদ্বীপের ঘাটের দিকে অগ্রসর হইতেছিল—অধিকাংশ স্নানার্থীর দৃষ্টি সেই দিকেই নিবদ্ধ ছিল। সমুদ্রযাত্রী বাণিজ্যতরীদের দেশে ফিরিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে; প্রতি সপ্তাহেই একটি একটি করিয়া ফিরিতেছিল।

ক্রমে নৌকা দুইটি খেয়ার ঘাটে গিয়া ভিড়িল। মধুকর ডিঙ্গার ছাদের উপর একজন যুবা দাঁড়াইয়া পরম আগ্রহের সহিত ঘাটের দৃশ্য দেখিতেছিল; পাল নামাইবার সঙ্গে সঙ্গে সেও তীরে অবতরণ করিবার জন্য ছাদ হইতে নামিয়া গেল।

বড় নৌকা ঘাটের নিকট দিয়া যাইবার ফলে জলে ঢেউ উঠিয়া ঘাটে আঘাত করিতে আরম্ভ করিয়াছিল; অনেক ছেলে-ছোকরা কোমরে গামছা বাঁধিয়া ঢেউ খাইবার জন্য জলে নামিয়াছিল। ঢেউয়ের মধ্যে বহু সন্তরণকারী বালকের হস্তপদ-

সঞ্চালনে ঘাট আলোড়িত হইয়া উঠিয়াছিল।

হঠাৎ তীর হইতে একটা 'গেল গেল' রব উঠিল। গৌরকান্তি যুবাটি এতক্ষণ দাঁড়াইয়া তর্করত পণ্ডিতদের রঙ্গ দেখিতেছিল, সে দুই লাফে জলের কিনারায় আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কি হয়েছে?'

কয়েকজন সমস্বরে উত্তর দিল, 'কানা-গোঁসাই এতক্ষণ জলে দাঁড়িয়ে আহ্নিক করছিলেন, হঠাৎ তাঁকে আর দেখা যাচ্ছে না। ভাবে-ভোলা মানুষ, হয়তো নৌকার ঢেউ লেগে তলিয়ে গেছেন।'

যুবা কোমরে গামছা বাঁধিতে বাঁধিতে শুনিতেছিল, আদেশের স্বরে কহিল, 'তোমরা জলে নেমো না, তা হলে গণ্ডগোল হবে। আমি দেখছি।'—বলিয়া সে জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

গ্রীষ্মকালে ঘাটে স্নান করা ভাবে-ভোলা মানুষদের পক্ষে সর্বদা নিরাপদ নয়। কারণ, জলের মধ্যে দুই ধাপ সিঁড়ি নামিয়াই শেষ হইয়াছে—তারপর কাদা। এখানে বুক পর্যন্ত জলে বেশ যাওয়া যায়, কিন্তু আর এক পা অগ্রসর হইলেই একেবারে ডুব জল। যুবক জলে ঝাঁপ দিয়া কয়েক হাত সাঁতার কাটিয়া গেল, তারপর অথৈ জলে গিয়া ডুব দিল।

কিছুক্ষণ তাহার আর কোনও চিহ্ন নাই। ঘাটের ধারে কাতার দিয়া লোক দাঁড়াইয়া দেখিতেছে। সকলের মুখেই উদ্বেগ ও আশঙ্কার ছায়া। কয়েকজন প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক ক্রন্দন-করুণ সুরে হা হুতাশ করিতে আরম্ভ করিয়া দিল।

পঞ্চাশ গুণিতে যতক্ষণ সময় লাগে, ততক্ষণ পরে যুবকের মাথা জলের উপর জাগিয়া উঠিল। সকলে হর্ষধ্বনি করিয়া উঠিল—কিন্তু পরক্ষণেই আবার নীরব হইল। যুবক নিমজ্জিত ব্যক্তিকে খুঁজিয়া পায় নাই, সে বার কয়েক সুদীর্ঘ নিশ্বাস টানিয়া আবার ডুব দিল।

এবারও সমধিক কাল ডুবিয়া থাকিয়া সে আবার উঠিল, একবার সজোরে মস্তক সঞ্চালন করিয়া এক হাতে সাঁতার কাটিয়া তীরের দিকে অগ্রসর হইল।

সকলে সচিৎকারে প্রশ্ন করিল, 'পেয়েছ? পেয়েছ?'

যুবক হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, 'বলতে পারি না। তবে এক মুঠো টিকি পেয়েছি।'

যুবক যখন তীরে আসিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, তখন সকলে বিস্মিত হইয়া দেখিল, তাহার বামমুষ্ঠি এক গুচ্ছ পরিপুষ্ট শিখা দৃঢ়ভাবে ধরিয়া আছে এবং নিমজ্জিত পণ্ডিতের দেহ সমেত মুণ্ড উক্ত শিখার সহিত সংলগ্ন হইয়া আছে।

কিয়ৎকাল শুশ্রূষার পর পণ্ডিতের চৈতন্য হইল। তিনি কিছু জল পান করিয়াছিলেন, তাহা উৎক্ষিপ্ত হইবার পর চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন। যুবক সহাস্যকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, 'শিরোমণি মহাশয়, বলুন দেখি বেঁচে আছেন, না ম'রে গেছেন? আপনার নব্য ন্যায়শাস্ত্র কি বলে?'

শিরোমণি এক চক্ষু দ্বারা কিছুক্ষণ ফ্যালফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া থাকিয়া ক্ষীণকণ্ঠে কহিলেন, 'কে—নিপাতনে সিদ্ধ? ডুবে গিয়েছিলুম—না? তুমি বাঁচালে?' যুবককে শিরোমণি মহাশয় 'নিপাতনে সিদ্ধ' বলিয়া ডাকিতেন। একটু ব্যাকরণের খোঁচাও ছিল, কুটতর্কে অপরাজেয় শক্তির জন্য সমাদরমিশ্রিত স্নেহও ছিল। নিপাতনে সিদ্ধ

হাসিয়া বলিল, 'বাঁচাতে পেরেছি কি না, সেই কথাই তো জিজ্ঞাসা করছি। যদি বেঁচে থাকেন, ন্যায়ের প্রমাণ দিন।'

কানভট্ট ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিলেন। এইমাত্র মৃত্যুর মুখ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে—শরীরে বল নাই; কিন্তু তাঁহার এক চক্ষুতে প্রাণময় হাসি ফুটিয়া উঠিল; তিনি বলিলেন, "প্রমাণ নিষ্প্রয়োজন। আমি বেঁচে আছি—এ কথা স্বয়ংসিদ্ধ। আমি বেঁচে নেই এ কথা যে বলে,সে তৎক্ষণাৎ প্রমাণ করে দেয় যে, সে বেঁচে আছে। বাজিকর যত কৌশলী হোক, নিজের স্কন্ধে আরোহণ করতে অক্ষম; মানুষ তেমনি নিজেকে অস্বীকার করতে পারে না।"

নৈয়ায়িকের কথায় সকলে হাসিয়া উঠিল। নিপাতনে সিদ্ধ বলিল, 'যাক, তা হ'লে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। এখন উঠতে পারবেন কি?'

শিরোমণি তাহার হাত ধরিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন, 'হঠাৎ হাতে পায়ে কেমন খিল ধ'রে গিয়েছিল। নিপাতন, তুমিই জল থেকে টেনে তুলেছ, না?

নিপাতন বলিল 'উঁহু। আপনাকে টেনে তুলেছে আপনার প্রচণ্ড পাণ্ডিত্যের বিজয় নিশান।'

'সে কি?'

'আপনার নশ্বর শিখাটাই আপনার প্রাণদাতা। ওটি না থাকলে কিছুতেই টেনে তুলতে পারতাম না।'

'জ্যাঠা ছেলে।'

আপনার পৈতে ছুঁয়ে বলছি—সত্যি কথা। কিন্তু সে যা হোক্, একলা বাড়ি ফিরতে পারবেন তো?'

'পারব, এখন বেশ সুস্থ বোধ করছি।' তারপর তাহার হাত ধরিয়া বলিলেন, 'বিশ্বম্ভর, এতদিন জানতাম তুমি নিপাতনেই সিদ্ধ, কিন্তু এখন দেখছি প্রাণদানেও তুমি কম পটু নও। আশীর্বাদ করি, এমনি ভাবে মজ্জমানকে উদ্ধার করেই যেন তোমার জীবন সার্থক হয়।'

নিপাতন হাসিয়া বলিল, 'কি সর্বনাশ! শিরোমণি মশাই, ও আশীর্বাদ করবেন না। তা হ'লে আমার ব্যাকরণ-টোলের কি দশা হবে?'

ও দিকে নৌকার মালিক যুবকটি এসব ব্যাপার কিছুই জানিতে পারে নাই। সে নগর-ভ্রমণের উপযুক্ত সাজসজ্জা করিয়া ঘাটে নামিল; স্নান-ঘাটের দিকে দৃষ্টি পড়িতেই সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। দেখিল, এক অতি গৌরকান্তি সুপুরুষ যুবা একজন মধ্যবয়স্ক একচক্ষু ব্যক্তির সহিত দাঁড়াইয়া কথা কহিতেছে। এই গৌরাঙ্গ যুবকের অপূর্ব দেহসৌষ্ঠব দেখিয়া সে মুগ্ধ হইয়া গেল। সে পৃথিবীর অনেক দেশ দেখিয়াছে; সিংহল, কোচিন, সুমাত্রা, যবদ্বীপ—কোথাও যাইতে তাহার বাকি নাই। কিন্তু এমন অপরূপ তেজোদীপ্ত পুরুষমূর্তি আর কখনও দেখে নাই।

একজন জেলে মাঝি নিজের ক্ষুদ্র ডিঙ্গিতে বসিয়া জাল বুনিতেছিল, যুবক তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'বাপু, ঐ লোকটি কে জান?'

জেলে একবার চোখ তুলিয়া বলিল, 'ঐ উনি? উনি নিমাই পণ্ডিত।'

যুবক ভাবিল—পণ্ডিত! এত অল্প বয়সে পণ্ডিত! যুবকের নিজের পাণ্ডিত্যের সহিত কোন সংবাদ ছিল না। সে বেনের ছেলে, বুদ্ধির বলেই সাত সাগর চষিয়া

সোনাদানা আহরণ করিয়া আনিয়াছে। সে আর একবার নিমাই পণ্ডিতের অনিন্দ্য দেহকান্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া হৃষ্টচিত্তে নগর পরিদর্শনে বাহির হইল।

বেনের ছেলের নাম চন্দনদাস। বেশ সুশ্রী চোখে-লাগা চেহারা; বয়স একুশ-বাইশ। বুদ্ধিমান; বাক্‌পটু, বিনয়ী—বেনের ছেলের যত প্রকার গুণ থাকা দরকার, সবই আছে; বরং দেশ-বিদেশে ঘুরিয়া নানাজাতীয় লোকের সহিত মিশিয়া আরও পরিমার্জিত হইয়াছে। বেশভূষাও ঘরবাসী বাঙ্গালী হইতে পৃথক। পায়ে সিংহলী চটি, পরিধানে চাঁপা রঙের রেশমী ধুতি মালসাট করিয়া পরা, স্কন্ধে উত্তরীয়। দুই কানে হীরার লবঙ্গ; মাথার কোঁকড়া চুল কাঁধ পর্যন্ত পড়িয়াছে—মাঝখানে সিঁথি। গলায় সোনার হার বণিক-পুত্রের জাতি-পরিচিতি দিতেছে।

চন্দনদাস অগ্রদ্বীপের প্রসিদ্ধ সওদাগর রূপচাঁদ সাধুর পুত্র। রূপচাঁদ সাধুর বয়স হইয়াছে, তাই এবার নিজে না গিয়া উপযুক্ত পুত্রকে বাণিজ্যে পাঠাইয়াছিলেন। এক বৎসর নয় মাস পরে ছেলে বিলক্ষণ দু-পয়সা লাভ করিয়া দেশে ফিরিতেছে। বহুদিন একাদিক্রমে নৌকা চালাইয়া মাঝি-মাল্লারা ক্লান্ত; তাই একদিনের জন্য চন্দনদাস নবদ্বীপে নৌকা বাঁধিয়েছে। কাল প্রভাতেই আবার গৃহাভিমুখে যাত্রা করিবে।

চন্দনদাস হরষিত-মনে গঙ্গাঘাটের পথ ধরিয়া নগর দর্শনে চলিল। সে-সময় নবদ্বীপের সমৃদ্ধির বিশেষ খ্যাতি ছিল। পথে পথে নাটশালা, পাঠশালা, চূর্ণ-বিলোপিত দেউল, প্রতি গৃহচূড়ায় বিচিত্র ধাতুকলস, প্রতি দ্বারে কারুখচিত কপাট; বাজারের এক বিপণিতে লক্ষ তঙ্কার সওদা কেনা যায়। পথগুলি সংকীর্ণ বটে, কিন্তু তাহাতে নগরশ্রী আরও ঘনীভূত হইয়াছে। রাজপথে বহু লোকের ব্যস্ত যাতায়াত নগরকে সজীব ও প্রাণবন্ত করিয়া তুলিয়াছে।

অনায়াস-মন্থর পদে চন্দনদাস চারিদিকে চাহিতে চাহিতে চলিয়াছিল। কিছুদূর যাইবার পর একটি জিনিস দেখিয়া হঠাৎ তাহার বাইশ বছরের মুণ্ড ঘুরিয়া গেল। সে পথের মাঝখানেই মন্ত্রমুগ্ধবৎ দাঁড়াইয়া পড়িল। বেচারা চন্দনদাস সাত সাগর পাড়ি দিয়েছে, কিন্তু সে বিদ্যাপতির কাব্য পড়ে নাই,—মেঘমাল সঞে তড়িতলতা জনু হৃদয়ে শেল দেই গেল—এরূপ ব্যাপার যে সম্ভবপর, তাহা সে জানিত না। বিদ্যাপতি জানা থাকিলে হয়তো ভাবিতে পারিত—

অপরূপ পেখলুঁ রামা
কনককলতা অব-　　　　　লম্বনে উয়ল
হরিণহীন হিমধামা।

কিন্তু চন্দনদাস কাব্যরসবঞ্চিত বেনের ছেলে, আত্মবিস্মৃত ভাবে হাঁ করিয়া রহিল। প্রভাতে সে কাহার মুখ দেখিয়া উঠিয়াছিল কে জানে, কিন্তু আজ তাহার সুন্দর মুখ দেখিবার পালা।

যাহাকে দেখিয়া চন্দনদাসের মুণ্ড ঘুরিয়া গিয়াছিল, সে মেয়েটি একজন বয়স্কা সহচরীর সঙ্গে ঘাটে স্নান করিতে যাইতেছিল। পূর্ণযৌবনা ষোড়শী—তাহার রূপের বর্ণনা করিতে গিয়া হতাশ হইতে হয়। বৈষ্ণব-রসসাহিত্য নিঙড়াইয়া এই রূপের একটা কাঠামো খাড়া করা যাইতে পারে; হয়তো এমনই কোনও গোরোচনা গোরী নবীনার নববিকশিত রূপ দেখিয়া প্রেমিক বৈষ্ণব কবি তাঁহার রাই-কমলিনীকে

গড়িয়াছিলেন, কে বলিতে পারে? মেয়েটির প্রতি পদক্ষেপে দর্শকের হৃদকমল দুলিয়া উঠে, যেন হৃদকমলের উপর পা ফেলিয়া সে চলিয়াছে। তাহার মদির নয়নের অপাঙ্গদৃষ্টিতে মনের মধ্যে মধুর মাদকতা উন্মথিত হইয়া উঠে।

কিন্তু এত রূপ সত্ত্বেও মেয়েটির মুখখানি ম্লান, যেন তাহার উপর কালোমেঘের ছায়া পড়িয়াছে। চোখ দুইটি অবনত করিয়া ধীরপদে সে চলিয়াছে, তৈলসিক্ত চুলগুলি পিঠের উপর ছড়ানো; পরণে আটপৌরে রাঙাপাড় শাড়ি। দেহে এক-খানিও গহনা নাই, এমন কি, নাকে বেসর, কানে দুল পর্যন্ত নাই। কেবল দুই হাতে দুইগাছি শঙ্খ।

মেয়েটির সঙ্গে যে সহচরী রহিয়াছে, তাহাকে সহচরী না বলিয়া প্রতিহারী বলিলেই ভাল হয়। সে যেন চারিদিক হইতে তাহাকে আগলাইয়া চলিয়াছে। তাহাকে দেখিলেই বুঝা যায়, বিগতযৌবনা ভ্রষ্টা স্ত্রীলোক। আঁট-সাঁট দোহারা গঠন, গোলাকৃতি মুখ, কলহপ্রিয় বড় বড় দুইটা চোখ যেন সর্বদাই ঘুরিতেছে।

চন্দনদাস হাঁ করিয়া পথের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া রহিল, মেয়েটি তাহার পাশ দিয়া চলিয়া গেল। পাশ দিয়া যাইবার সময় একবার চকিতের ন্যায় চোখ তুলিল, আবার তৎক্ষণাৎ মাথা হেঁট করিল। সঙ্গিনী স্ত্রীলোকটি কটমট করিয়া চন্দনদাসের পানে তাকাইল, তাহার আত্মবিস্মৃত বিহ্বলতার জন্য যেন কিছু বলিবে মনে করিল। কিন্তু চন্দনদাসের বিদেশীর মতো সাজ-সজ্জা দেখিয়া কিছু না বলিয়া সমস্ত দেহের একটা স্বৈরিণীসুলভ ভঙ্গি করিয়া চলিয়া গেল।

চন্দনদাসও অমনি ফিরিল। তাহার নগর-ভ্রমণের কথা আর মনে ছিল না, সে একদৃষ্টে মেয়েটির দিকে তাকাইয়া রহিল। মেয়েটিও কয়েক পা গিয়া একবার ঘাড় বাঁকাইয়া পিছু ফিরিয়া চাহিল। 'গেলি কামিনী, গজহু গামিনী, বিহসি পালটী নেহারি'—চন্দনদাসের যেটুকু সর্বনাশ হইতে বাকি ছিল তাহাও একবার হইয়া গেল।

সেও গঙ্গাঘাটের দিকে ফিরিল, অগ্রবর্তিনী স্নানার্থিনীদের দৃষ্টি-বহির্ভূত হইতে না দিয়া তাহাদের পিছু পিছু চলিল।

ক্রমে তাহারা ঘাটের সম্মুখে পৌঁছিল। এখানে চন্দনদাস আবার নিমাই পণ্ডিতকে দেখিতে পাইল। তিনি স্নান শেষ করিয়া বোধহয় গৃহে ফিরিতেছিলেন। ভিজে গামছা গায়ে জড়ানো। চন্দনদাস লক্ষ্য করিল, মেয়েটির প্রতি দৃষ্টি পড়িতেই নিমাই পণ্ডিতের মুখে একটা ক্ষুব্ধ কারুণ্যের ভাব দেখা দিয়াই মিলাইয়া গেল। তিনি অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিলেন।

অতঃপর স্ত্রীলোক দুইটি ঘাটে গিয়া স্নান করিল। চন্দনদাস একটু আড়ালে থাকিয়া চোরা চাহনিতে দেখিল। চন্দনদাস দুষ্মন্ত নয়,—"অসংশয়ং ক্ষত্রপরিগ্রহ-ক্ষমা" তাহার মনে আসিল না; কিন্তু নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারণে তাহার ধারণা জন্মিল যে মেয়েটি বেনের মেয়ে, তাহার স্বজাতি। কিন্তু একটা কথা সে কিছুতেই বুঝিতে পারিল না, এত বয়স পর্যন্ত মেয়েটি অনূঢ়া কেন? বিধবা নয়, হাতের শঙ্খ ও রাঙা-পাড় শাড়ি তাহার প্রমাণ। তবে ষোল-সতেরো বছরের মেয়ে বাংলা দেশে অবিবাহিতা থাকে কি করিয়া?

কিন্তু যাহা হউক, স্নান সারিয়া তাহারা যখন ফিরিয়া চলিল, তখন সেও

তাহাদের পিছু লইল।

চন্দনদাসের ব্যবহারটা বর্তমানকালে কিছু বর্বরোচিত বোধ হইতে পারে। কিন্তু একালের রুচি দিয়া সেকালের শিষ্টাচারের সূক্ষ্ম অনুশাসন মানিয়া চলিবার মতো হৃদ্‌যন্ত্রের অবস্থা চন্দনদাসের ছিল না। তাহার কাঁচা হৃদ্‌যন্ত্রটা একেবারেই অবশ হইয়া পড়িয়াছিল। বিশেষ দোষ দেওয়াও যায় না। অনুরূপ অবস্থায় পড়িয়া সেকালের ঠাকুর-দেবতারাও কিরূপ বিহ্বল বে-এক্তিয়ার হইয়া পড়িতেন তাহা তো ভক্ত কবিগণ লিপিবন্ধ করিয়াই গিয়াছেন। "এ ধনি কে কহ বটে।"

মোট কথা, চন্দনদাস তাহার মন-চোরা মেয়েটির পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। এ-পথ হইতে ও-পথ কয়েকটা মোড় ফিরিয়া প্রায় এক পোয়া পথ অতিক্রম করিবার পর মেয়েটি এক গলির মধ্যে প্রবেশ করিল। চন্দনদাস দেখিল, পাড়াটা অপেক্ষাকৃত গরিব বেনেপাড়া। অধিকাংশ বাড়ির খড়ের বা খোলার চাল।

গলির মধ্যে কিছুদূরে গিয়া মেয়েটি এক ক্ষুদ্র পাকা বাড়ির দালানে উঠিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। বাড়িটা পাকা বটে, কিন্তু অতিশয় জীর্ণ ও শ্রীহীন। বাড়ির সম্মুখীন হইয়া চন্দনদাস দেখিল দালানের উপর একটি ক্ষুদ্র বেনের দোকান। আদা, মরিচ, হলুদ, চই ছোট ছোট ধামিতে সাজানো আছে। একজন বৃদ্ধা স্ত্রীলোক বেসাতি করিতেছে। দালানের পশ্চাদ্ভাগে একটি দ্বার, উহাই অন্দরে প্রবেশ করিবার পথ। চন্দনদাস বুঝিল, ঐ পথেই মেয়েটি ও তাহার সঙ্গিনী অন্দরে প্রবেশ করিয়াছে।

চন্দনদাস বড় সমস্যায় পড়িল। সে কোন মতলব স্থির করিয়া ইহাদের অনুসরণ করে নাই, গুণের নৌকার ন্যায় অদৃশ্য রজ্জুবন্ধন তাহাকে টানিয়া আনিয়াছে। কিন্তু এখন সে কি করিবে? কেবলমাত্র মেয়েটির বাড়ি দেখিয়া ফিরিয়া যাইবে? চন্দনদাস বাড়ির সম্মুখ দিয়া কয়েকবার অলসভাবে যাতায়াত করিয়া কর্তব্য স্থির করিয়া লইল। তাহার হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল, তাহার মা তাহাকে নবদ্বীপ হইতে ভাল চুয়া কিনিয়া আনিতে বলিয়াছিলেন। সে কথা সে ভুলে নাই, আজ নগর-ভ্রমণের সময় কিনিয়া লইবে স্থির করিয়াছিল। কিন্তু চুয়া কিনিবার অছিলা এমনভাবে সদ্ব্যবহার করিবার কথা এতক্ষণ মনেই আসে নাই।

সে দৃঢ়পদে দোকানের সম্মুখীন হইল; মিঠা হাসিয়া বুড়ীকে জিজ্ঞাসা করিল, 'হ্যাঁ গো ভালোমানুষের মেয়ে, তোমার দোকানে ভালো চুয়া আছে?'

যে বৃদ্ধা বেসাতি করিতেছিল তাহার দেহ-যষ্ঠিতে বিন্দুমাত্র রস না থাকিলেও প্রাণটা তাজা ও সরস ছিল। চন্দনদাসকে বাড়ির সম্মুখে অকারণ ঘুরঘুর করিতে দেখিয়া বুড়ী এই অনিশ্চিত ঘোরাঘুরির গূঢ় কারণটি ধরিয়া ফেলিয়াছিল এবং মনে মনে একটু আমোদ অনুভব করিতেছিল। পাড়ার কোন চ্যাংড়া ছোঁড়া হইলে বুড়ী মুখ ছাড়িত; কিন্তু এই কান্তিমান সুদর্শন ছেলেটির বিদেশীর মতো সাজ-পোশাক দেখিয়া সে একটু আকৃষ্ট হইয়াছিল।

চন্দনদাসের প্রশ্নের উত্তরে সে বলিল, 'আছে বইকি বাছা। এস, ব'স।'

চন্দনদাসও তাই চায়, সে দালানে উঠিয়া জলচৌকির উপর চাপিয়া বসিল। জিজ্ঞাসা করিল, 'হ্যাঁ গা, তোমাদের বাড়িতে কি পুরুষমানুষ নেই? তুমি নিজে বেসাতি করছ যে?'

বৃদ্ধা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'সে কথা আর ব'লো না বাছা, একটা ব্যাটাছেলে ঘরে থাকলে কি আজ আমাদের এমন খোয়ার হয় ? তারপর কথা পাল্টাইয়া বলিল, 'তা, হ্যাঁ বাছা, তোমাকে তো আগে কখনও দেখিনি, ন'দের লোক নও বুঝি ?'

চন্দনদাস বলিল, 'না, আমার বাড়ি অগ্রদ্বীপ।'

বুড়ী বলিল, 'ও তাই। কথায় বার্তায় যেন বেনের ছেলে বলে মনে হচ্ছে।'।

চন্দনদাস তখন জাতি-পরিচয় দিল, নিজের ও পিতার নাম উল্লেখ করিল। বুড়ী দু'দণ্ড গল্প করিবার লোক পায় না, সে আহ্লাদে গদগদ হইয়া বলিল, 'ও মা, তুমি তো আমাদের ঘরের ছেলে গো—স্বজাত! আহা যেমন সোনার কার্তিকের মতো চেহারা, তেমনি মার কোল জুড়ে বেঁচে থাকো।—কোথায় বিয়ে-থা করেছ ?'

চন্দনদাস কহিল, তেরো বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল আয়ি, এক বছর পরেই বউ ম'রে যায়। তারপর আর বিয়ে করিনি।'

বুড়ী একটু বিমনা হইল ; তারপর উৎসুকভাবে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল।

চন্দনদাস কথাপ্রসঙ্গে বলিল, 'সমুদ্রে গিয়াছিলাম আয়ি, দু বছর পরে দেশে ফিরছি। তা ভাবলাম, ন'দেয় একদিন থেকে যাই ; মার বরাত চুয়া কেনবার। চুয়া কেনাও হবে, একটু জিরেন দেওয়াও হবে।'

বুড়ী বলিল, 'তা বেশ করেছ বাবা, ভাগ্যিস এসেছিলে তাই তো অমন চাঁদমুখখানি দেখতে পেলাম।' বুড়ী একটা নিঃশ্বাস ফেলিল। তাহার প্রাণের ভিতরটা হায় হায় করিয়া উঠিল। আহা, যদি সম্ভব হইত।

চন্দনদাস এতক্ষণ ফাঁক খুঁজিতেছিল, জিজ্ঞাসা করিল, 'আয়ি তোমার আপনার জন কি আর কেউ নেই ?'

'একটি নাতনী আছে, আর সব ম'রে হেজে গেছে। পোড়াকপালী ছুঁড়ির কপাল!'—বলিয়া বুড়ী আঁচলে চোখ মুছিল।

'নাতনী!' চন্দনদাস সচকিত হইয়া উঠিল, তবে বুড়ীর নাতনীকেই সে দেখিয়াছে!—'তবে তুমি বুড়োমানুষ দোকান দেখ কেন ? সে দেখতে পারে না ?'

বুড়ী উদাস আশাহীন সুরে বলিল, 'সে অনেক কথা, বাছা। আমাদের দুঃখের কাহিনী কাউকে বলবার নয়। সমাজ আমাদের বিনা দোষে জাতে ঠেলেছে, মুখ তুলে চাইবার কেউ নেই। আর কাকেই বা দোষ দেব, সব দোষ ঐ হতভাগীর কপালের। এমন রূপ নিয়ে জন্মেছিল,—ঐ রূপই ওর শত্তুর।'

চন্দনদাসের কৌতূহল ও উত্তেজনা বাড়িয়াই চলিয়াছিল। সে সাগ্রহে প্রশ্ন করিল, 'কি ব্যাপার আয়ি ? সব কথা খুলেই বল না।'

বুড়ী কিন্তু রাজী হইল না, বলিল, 'কি হবে বাবা আমাদের লজ্জার কথা শুনে ? কিছু তো করতে পারবে না, কেবল মনে দুঃখ পাবে।'

'কে বললে, কিছু পারব না ?'

'না বাবা, সে কেউ পারবে না।—আহা, সোনার প্রতিমা আমার কালই জলে ভাসিয়ে দিতে হবে রে!'—বলিয়া হঠাৎ মুখে কাপড় চাপা দিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

চন্দনদাস বুড়ীর হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, 'আয়ি, আমি বেনের ছেলে, তোর গা ছুঁয়ে বলছি, মানুষের যা সাধ্য আমি তা করব। তোর নাতনীর কি বিপদ বল।'

বুড়ী উত্তর দিবার পূর্বেই, বোধ করি তাহার ক্রন্দনের শব্দে আকৃষ্ট হইয়া সেই বিগতযৌবনা প্রহরিণী বাহির হইয়া আসিল, কর্কশ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, কাঁদছিস কেন রে, বুড়ী ? কি হয়েছে ?'

বুড়ী বিলক্ষণ বুদ্ধিমতী, তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া আমতা আমতা করিয়া বলিল, 'কিছু নয় রে চাঁপা—অমনি। এই ছেলেটি দূর সম্পর্কে আমার নাতি হয়, অনেকদিন পরে দেখলুম, তাই—'

চাঁপা চন্দনদাসের দিকে ফিরিল, বৃহৎ সুবর্তুল চক্ষু তাহার মুখের উপর স্থাপন করিয়া বুড়ির উদ্দেশ্যে বলিল, 'হুঁ নাতি। তোর নাতি আছে, আগে কখনও বলিস নি তো ?'

বুড়ী কম্পিত স্বরে বলিল, 'বললুম না দূর সম্পর্ক। আমার পিসতুত বোনের—'

চাঁপা বলিল, 'বুঝেছি।' তারপর চন্দনদাসকে প্রশ্ন করিল, তোমাকে আজ পথে দেখছি না ?'

চন্দনদাস সটান মিথ্যা কথা বলিল, 'কই, না। আমার তো মনে পড়ছে না।'

চাঁপা তীক্ষ্ণ-চক্ষে আরও কিছুক্ষণ চন্দনদাসকে নিরীক্ষণ করিল, শেষে মুখে একটু হাসি আনিয়া বলিল, 'তবে আমারই ভুল। বুড়ী, তুই তা হ'লে তোর নাতির সঙ্গে কথা ক'—আমি একটু পাড়া বেড়িয়ে আসি। তোর নাতি আজ এখানে থাকবে তো ? দেখিস, ছেড়ে দিসনে যেন, এমন রসের নাতি কালেভদ্রে পাওয়া যায়।'—বলিয়া চোখ ঘুরাইয়া বাহিরের দিকে প্রস্থান করিল।

চাঁপা দৃষ্টিবহির্ভূত হইয়া গেলে চন্দনদাস জিজ্ঞাসা করিল, 'এটি কে ?'

বুড়ীর তখনও হৃদ্‌কম্প দূর হয় নাই, সে বলিল, 'ও মাগী যমের দূত। বাবা, এমন ভয় হয়েছিল—এখনি টুঁটি টিপে ধরত। তুই যা দাদা, আর এখানে থাকিসনি। ওরে, তুই আমাদের কি ভালো করবি ? ভগবান আমাদের ভুলে গেছেন। তুই এখান থেকে পালা, শেষে কি মায়ের নিধি বেঘোরে প্রাণ দিবি ?'

চন্দনদাস বলিল, 'সে কি ঠানদি, নাতিকে কি এমনি করেই তাড়াতে হয় ? একটা পান পর্যন্ত দিতে নেই ? তা ছাড়া চুয়া কিনতে এসেছি, চুয়া না দিয়েই তাড়িয়ে দিচ্ছিস ? তুই কেমন বেনের মেয়ে ?'

বুড়ী এবার হাসিয়া ফেলিল। এই ছেলেটির মুখের কথা যতই সে শুনিতেছিল, ততই তাহার মন ভিজিতেছিল। তাহার প্রাণের একান্তে বিদলিত মুহ্যমান আশা একটু মাথা তুলিল। তবে কি এই শেষ সময়ে ভগবান মুখ তুলিয়া চাহিলেন ?

বুড়ী মনে ভাবিল, যা হয়, তা হয়, একবার শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিব। কে বলিতে পারে, হয়তো অভাগিনীর ভাগ্যে চরম দুর্গতি বিধাতা লেখেন নাই ; নচেৎ নিরাশার গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে এই অপরিচিত বন্ধু কোথা হইতে আসিয়া জুটিল ?

তখন বুড়ী সংকল্প স্থির করিয়া বলিল, 'ও মা, সত্যি তো। চুয়ার কথা মনে ছিল না। তা দেব দাদা—কিন্তু বড় দামী জিনিস, দাম দিতে পারবে তো ?'

'দাম কত ?'

'জীবন-যৌবন-মন-প্রাণ সব দিলেও সে জিনিসের দাম হয় না।'

চন্দনদাস একটু অবাক হইল, কিন্তু হারিবার পাত্র সে নয়, বলিল, 'আচ্ছা, আগে

জিনিস দেখি।'

'এই যে, দেখাই। ওলো ও চুয়া, একবার এদিকে আয় তো, দিদি।'

চন্দনদাস তড়িৎস্পৃষ্টের মতো চমকিয়া উঠিল, তবে মেয়েটির নাম চুয়া! আর সে চুয়া কিনিতে এখানে আসিয়াছে! এ কি দৈব যোগাযোগ।

'কি বলছ ঠান্‌দি?' বলিতে বলিতে চুয়া অন্দরের দরজার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। চন্দনদাসকে দেখিয়া সে চমকিয়া বুকের উপর হাত রাখিল। চন্দনদাস সেই দিকেই তাকাইয়াছিল, দেখিল, চুয়ার কুমুদের মতো গাল দুইটিতে কে যেন কাঁচা সিঁদুর ছড়াইয়া দিল। তারপর ম্রিয়মান লজ্জায় তাহার চোখ দুইটি ধীরে ধীরে নত হইয়া পড়িল। চন্দনদাস বুঝিল, চুয়া তাহাকে চিনিতে পারিয়াছে; পথের ক্ষণিক দেখা মুগ্ধ পান্থকে ভুলে নাই।

বুড়ী বলিল, চুয়া, অতিথি এসেছে; একটু মিষ্টিমুখ করা, পান দে।'

চুয়া মুখ তুলিল না, আস্তে আস্তে চন্দনদাসের সতৃষ্ণ চক্ষুর সম্মুখ হইতে সরিয়া গেল।

কিছুক্ষণ কোন কথা হইল না। চন্দনদাস দ্বারের দিকেই তাকাইয়া রহিল। শেষে বুড়ী বলিল, 'আমার চুয়াকে দেখলে?'

'দেখলাম।' আগেও যে দেখিয়াছে, তাহা আর চন্দনদাস ভাঙিল না। বুড়ীও সে দিক দিয়া গেল না, বলিল, 'কেমন মনে হল!'

'মনে হ'ল—সহসা চন্দনদাস বুড়ীর দিকে ঝুঁকিয়া ব্যগ্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, 'ঠান্‌দি, চুয়ার কি বিপদ আমায় বল। কেন তোমাদের সবাই জাতে ঠেলেছে? ওর এখনও বিয়ে হয়নি কেন?'

ঘরের নিকট হইতে জবাব আসিল, 'কি হবে তোমার শুনে?'

এক হাতে ফুল-কাঁসার ছোট রেকাবির উপর চারিখানি বাতাসা ও দুইটি পান, অন্য হাতে জলের ঘটি লইয়া চুয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। চন্দনদাসের শেষ কথাগুলি সে শুনিতে পাইয়াছিল; শুনিয়া লজ্জায় ধিক্কারে তাহার মন ভরিয়া উঠিয়াছিল। কেন এই অপরিচিত যুবকের এত কৌতূহল? তাহাকে বলিয়াই বা লাভ কি? চুয়া রেকাবি ও ঘটি চন্দনদাসের সম্মুখে নামাইয়া আরক্ত-মুখে অধীর স্বরে বলিল, 'কে তুমি? কোথা থেকে এসেছ? কি হবে তোমার আমাদের কথা শুনে?'

ক্ষণকালের জন্য চন্দনদাস বিস্ময়ে হতবাক হইয়া রহিল; তারপর উঠিয়া দাঁড়াইয়া চুয়ার মুখের উপর চোখ রাখিয়া শান্ত সংযত স্বরে বলিল, 'চুয়া, আমি তোমার স্বজাতি; আমার বাড়ি অগ্রদ্বীপ। নবদ্বীপের ঘাটে আমার ডিঙ্গা বাঁধা আছে। তোমার কি বিপদ আমি জানি না; কিন্তু আমি যদি তোমায় সাহায্য করতে চাই, আমার সাহায্য কি নেবে না?'

চুয়ার মুখ হইতে সমস্ত রক্ত নামিয়া গিয়া মুখখানা সাদা হইয়া গেল। তাহার চোখে পরিত্রাণের ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা ও ক্ষণ-বিস্ফারিত আশার আলো ফুটিয়া উঠিল। কয়েক মুহূর্তের জন্য তাহার মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। তারপর সে রুদ্ধস্বরে বলিয়া উঠিল, 'কেন আমাকে মিছে আশা দিচ্ছ?'—বলিয়া দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

চন্দনদাস বসিয়া পড়িল। কিয়ৎকাল বসিয়া থাকিয়া অন্যমনস্কভাবে একখানা

বাতাসা তুলিয়া লইয়া মুখে দিল ; তারপর আলগোছে ঘটির জল গলায় ঢালিয়া জলপান করিল। শেষে পান দুইটি মুখে পুরিয়া বুড়ীর দিকে তাকাইয়া মৃদুহাস্যে বলিল, ঠানদি, এবার তোমার গল্প বল।'

'বলব, কিন্তু তুমি আগে একটা কথা দাও।'

'কি ?'

'তুমি ওকে উদ্ধার করবে।'

'করব। অন্তত প্রাণপণে চেষ্টা করব।'

'বেশ, উদ্ধার করা মানে ওকে এ দেশ থেকে নিয়ে পালাতে হবে ? পারবে ?'

'পারব—খুব পারব।'

'ভালো। কিন্তু তারপর ?'

'তারপর কি ?'

বুড়ী একটু দ্বিধা করিল ; শেষে বলিল, 'কিছু মনে ক'রো না, সব কথা স্পষ্ট করে বলাই ভালো। তুমি জোয়ান ছেলে, চুয়াও যুবতী মেয়ে, তুমি ওকে চুরি ক'রে নিয়ে যাবে। তারপর ?'

চন্দনদাস জিজ্ঞাসুনেত্রে চাহিয়া রহিল।

বুড়ী তখন স্পষ্ট করিয়া বলিল, 'ওকে বিয়ে করতে পারবে ?'

চন্দনদাসের চোখের সম্মুখে যেন একটা নূতন আলো জ্বলিয়া উঠিল ; সে উদ্ভাসিত মুখে বলিল, 'পারবো।'

'তোমার বাপ মা—'

'তাঁরা আমার কথায় অমত করবেন না।'

বৃদ্ধা কম্পিত স্বরে বলিল, 'বেঁচে থাকো দাদা, তুমি বড় ভাল ছেলে। কিন্তু ছুঁড়ীর যা কপাল—'

বুড়ী তখন চুয়ার কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিল। চন্দনদাস করতলে কপোল রাখিয়া শুনিতে লাগিল। শুনিতে শুনিতে সে টের পাইল, চুয়া কখন চুপি চুপি আসিয়া দ্বারের পাশে দাঁড়াইয়াছে।

চুয়ার বাপের নাম কাঞ্চনদাস। বেনেদের মধ্যে সে বেশ সঙ্গতিসম্পন্ন গৃহস্থ ছিল। চুয়ার বয়স যখন সাত বৎসর, তখন কাঞ্চনদাস বাণিজ্যের জন্য নৌকা সাজাইয়া সমুদ্রযাত্রা করিল। কাঞ্চনদাসের নৌকা গঙ্গার বাঁকে অদৃশ্য হইয়া গেল—আর ফিরিল না। সংবাদ আসিল, নৌকাডুবি হইয়া কাঞ্চনদাস মারা গিয়াছে।

এই ঘটনার এক বৎসর পরে চুয়ার মাও মরিল। তখন বুড়ী ছাড়া চুয়াকে দেখিবার আর কেহ রহিল না। বুড়ী কাঞ্চনদাসের মাসী—আট বছর বয়স হইতে সে হাতে করিয়া চুয়াকে মানুষ করিয়াছে।

নৌকাডুবিতে কাঞ্চনদাসের সমস্ত সম্পত্তিই ভরা-ডুবি হইয়াছিল, কেবল এই ভদ্রাসনটি বাঁচিয়াছিল। বুড়ী দোকান করিয়া কষ্টে সংসার চালাইতে লাগিল।

এইভাবে বৎসরাধিক কাটিল। চুয়ার বয়স যখন দশ বৎসর, তখন এক গৃহস্থের ছেলের সঙ্গে তাহার বিবাহের সম্বন্ধ হইল।

এই সময় একদিন জমিদারের ভ্রাতুষ্পুত্র ঘোড়ায় চড়িয়া এই পথ দিয়া যাইতেছিল। চুয়াকে বাড়ির সম্মুখে খেলা করিতে দেখিয়া সে ঘোড়া হইতে নামিল। দুর্দান্ত

জমিদারের মহাপাষণ্ড ভাইপো মাধবের নাম শুনিয়া দেশের লোক তো দূরের কথা, কাজি সাহেব পর্যন্ত থরথর করিয়া কাঁপে। রাজার শাসন—সমাজের শাসন কিছুই সে মানে না। জাতিতে ব্রাহ্মণ হইলে কি হয়, স্বভাব তার চন্ডালের মতো। সে দশ বছরের চুয়াকে চিবুক তুলিয়া ধরিয়া দেখিল, তারপর বাড়িতে আসিয়া তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। বুড়ী ভয়ে ভয়ে পরিচয় দিল। শুনিয়া মাধব বলিল, এ মেয়ের বিবাহ দেওয়া হইবে না, ইহাকে দৈবকার্যের জন্য মানত করিতে হইবে। ষোল বছর বয়স পর্যন্ত মেয়ে কুমারী থাকিবে, তারপর মাধব আসিয়া তাহাকে লইয়া যাইবে। তান্ত্রিক সাধনায় উত্তরসাধিকার স্থান অধিকার করিয়া কন্যার ষোল বছরের কৌমার্য সার্থক হইবে। সাধক—স্বয়ং মাধব।

এই হুকুমজারি করিয়া মাধব প্রস্থান করিল। বাড়িতে কান্নাকাটি পড়িয়া গেল; তান্ত্রিক সাধনার গূঢ় মর্মার্থ বুঝিতে কাহারও বাকী রহিল না। বণিক-সমাজ মাধবের বিরুদ্ধে কিছু করিতে সাহস করিল না, তাহারা চুয়াকে জাতিচ্যুত করিল। বিবাহও ভাঙিয়া গেল।

ক্রমে চুয়ার বয়স বাড়িতে লাগিল—বারো বছর বয়স হইল। বুড়ী দেশে কাহারও নিকট সাহায্য না পাইয়া শেষে চুয়াকে লইয়া দেশ ছাড়িয়া পলাইবার মতলব করিল। কিন্তু বুড়ীর হাতে পয়সা কম, আত্মীয়বন্ধুরও একান্ত অভাব। তাহার মতলব সিদ্ধ হইল না; মাধবের কানে সংবাদ গেল।

মাধব আসিয়া বুড়ীকে পদাঘাত মুষ্ট্যাঘাত দ্বারা শাসন করিল, তারপর চুয়াকে পাহারা দিবার জন্য চাঁপাকে পাঠাইয়া দিল। নাপিত-কন্যা চাঁপা চুয়ার অভিভাবিকা পদে অধিষ্ঠিত হইল। চাঁপা বয়সকালে তান্ত্রিক সাধন-ভজন করিয়াছিল, এখন যৌবনান্তে ধর্মকর্ম ত্যাগ করিয়াছে। সে চুয়া ও বুড়ীর উপর কড়া নজর রাখিতে লাগিল।

এইভাবে চারি বছর কাটিয়াছে। কয়েকদিন আগে মাধব আসিয়াছিল। সে চুয়াকে দেখিয়া গিয়াছে এবং বলিয়াছে যে আগামী অমাবস্যার রাত্রিতেই চুয়াকে দৈবকার্যে উৎসর্গ করিতে হইবে—সেজন্য যেন সে প্রস্তুত থাকে। অনুষ্ঠানের যাহাতে কোনও ত্রুটি না হয়, এ জন্য মাধব নিজেই সমস্ত বিধান দিয়া গিয়াছে। অমাবস্যার সন্ধ্যার সময় চুয়া গঙ্গার ঘাটে গিয়া স্নান করিবে; স্নানান্তে রক্তবস্ত্র, জবামালা ও রক্তচন্দনের ফোঁটা পরিয়া ঘাট হইতে একেবারে সাধাস্থলে অর্থাৎ মাধবের উদ্যানবাটিকায় উপস্থিত হইবে। সঙ্গে ঢাক ঢোল ইত্যাদি বাজিতে বাজিতে যাইবে। মাধব এইরূপ শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা দিয়া চলিয়া যাইবার পর পাঁচ দিন কাটিয়া গিয়াছে, আজ কৃষ্ণা-চতুর্দশী —কাল অমাবস্যা।

গল্প শেষ করিয়া বুড়ি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, 'দাদা, সব কথা তোমায় বললুম। এখন দেখ, যদি মেয়েটাকে উদ্ধার করতে পার। তুমি ছাড়া ওর আর গতি নেই।'

গল্প শুনিতে শুনিতে চন্দনদাসের বুকের ভিতরটা জ্বালা করিতেছিল, এ দানব-প্রকৃতির লোকটার বিরুদ্ধে ক্রোধ ও আক্রোশ অগ্নিশিখার মতো তাহার দেহকে দাহ করিতেছিল। সে দাঁতে দাঁত চাপিয়া বলিয়া উঠিল, 'আমি যদি চুয়াকে বিয়ে ক'রে কাল আমার নৌকোয় তুলে দেশে নিয়ে যাই—কে কি করিতে পারে?'

ঘরের আড়ালে চুয়ার বুক দুরুদুরু করিয়া উঠিল। কিন্তু বুড়ী মাথা নাড়িয়া ক্ষুণ্ণস্বরে বলিল, 'তা হয় না দাদা। চাঁপা রাক্ষুসী আছে—সে কখনই হতে দেবে না।'

চন্দনদাস বলিল, 'চাঁপাকে সোনায় মুড়ে দেব। তাতে রাজী না হয়, মুখে কাপড় বেঁধে ঘরে বন্ধ ক'রে রাখব।'

বুড়ী কাঁপিতে লাগিল, এতখানি দুঃসাহস তাহার পক্ষে কল্পনা করাও দুষ্কর। কিন্তু বুড়ীর প্রাণে আশা জাগিয়াছিল, আশা একবার জাগিলে সহজে মরিতে চায় না। তবু বুড়ী কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, সে যেন হ'ল, কিন্তু বিয়ে কি করে হবে? বিয়ে দেবে কে?'

'কেন—ন'দের কি পুরুত নেই?'

বৃদ্ধা মাথা নাড়িয়া বলিল, 'তুমি মাধবকে জান না। তার ভয়ে কোনও বামুন রাজী হবে না।'

চন্দনদাস আশ্চর্য হইয়া বলিল, 'এখানকার বামুনরা এত ভীরু?'

'কার ঘাড়ে দশটা মাথা আছে দাদা যে জমিদারের ভাইপোর শত্রুতা করবে? তবে—শুনেছি, জগন্নাথ ঠাকুরের ছেলে নিমাই পণ্ডিত বড় ডাকাবুকো ছেলে, কাউকে ভয় করেন না। বয়স কম কিনা!—কিন্তু, কিন্তু তিনি কি রাজী হবেন?'

চন্দনদাস মহা উৎসাহে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, 'ভালো মনে করিয়ে দিয়েছ ঠানদি,—নিমাই পণ্ডিতই উপযুক্ত লোক। তাকে আমি আজ গঙ্গারঘাটে দেখেছি; ঠিক দেবতার মতো চেহারা—তিনি নিশ্চয় রাজী হবেন।—ঠানদি আমি এখন তাঁর খোঁজে চললাম, ও বেলা সব ঠিক ক'রে আবার আসব। তখন—'

'কিন্তু তিনি যদি রাজী না হন?'

চন্দনদাস চিন্তা করিল, 'যদি রাজি না হন—তিনি রাজি হোন বা না-হোন, রাত্রিতে কোনও সময় আমি আসবই। নাই বা হ'ল বিয়ে? আজ রাত্রিতে চুয়াকে চুরি ক'রে নিয়ে যাব। তারপর দেশে গিয়ে বিয়ে করব—কি বল?'

বুড়ীর মুখে আশঙ্কার ছায়া পড়িল। চন্দনদাসের যে কোনও দুরভিসন্ধি নাই তাহা সে অন্তরে বুঝিতেছিল; কিন্তু তবু—চন্দনদাস একেবারে অপরিচিত। সেও যে একজন ধূর্ত প্রবঞ্চক নয়, তাহা বুড়ী কি করিয়া জানিবে। বার বার দাগা পাইয়া বুড়ীর মন বড় সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। সে ইতস্তত করিতে লাগিল।

এই সময় চুয়া দরজার আড়াল হইতে বাহির হইয়া আসিল। সংশয় সংকোচ করিবার তাহার আর সময় ছিল না। এক দিকে অবশ্যম্ভাবী সর্বনাশ, অন্যদিকে সম্ভাবনা। চুয়া সজল চক্ষু চন্দনদাসের মুখের উপর রাখিয়া কম্পিতস্বরে কহিল, 'তুমি আজ রাত্তিরে এস। নিমাই পণ্ডিত যদি রাজী না হন তবু, তোমার ধর্মের ওপর বিশ্বাস ক'রে আমি তোমার সঙ্গে যাব।'

চন্দনদাসের বুক নাচিয়া উঠিল; সে আনন্দের উচ্ছ্বাসে কি বলিতে যাইতেছিল—এমন সময় বাধা পড়িল।

গলির ভিতর দ্রুত অশ্বক্ষুর ধ্বনি শুনা গেল। চুয়া একটা আর্ত চিৎকার গলার মধ্যে রোধ করিয়া ছুটিয়া পলাইয়া গিয়া ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দিল; বুড়ী থরথর করিয়া কাঁপিয়া হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজিয়া বসিয়া পড়িল।

পরক্ষণেই একজন অশ্বারূঢ় ব্যক্তি বাড়ির সম্মুখে আসিয়া ঘোড়া থামাইল। লোকটার গায়ে লাল রঙের কোর্তা, কোমরে তরবারি, মাথায় পাগ নাই, ঝাঁকড়া রুক্ষ চুল কাঁধ পর্যন্ত পড়িয়াছে; কপালে প্রকাণ্ড একটা সিন্দুরের ফোঁটা। ফোঁটার নিচে বিশাল ভাঁটার মতো চোখ দুটাও প্রায় অনুরূপ রক্তবর্ণ। মুখে ঘনকৃষ্ণ গোঁফ এবং গালে গালপাট্টা। বয়স বোধ করি পঁয়তাল্লিশ।

এই ভীষণাকৃতি লোকটার মুখের প্রতি অবয়বে যেন জীবনব্যাপী দুষ্কৃতি ও পাপ পঙ্কিল রেখায় অঙ্কিত হইয়া আছে। এমন দুষ্কার্য নাই—যাহা সে করে নাই, এমন মহাপাতক নাই—যাহা সে করিতে পারে না। একটা ঘৃণার শিহরণ চন্দনদাসের দেহের উপর দিয়া বহিয়া গেল; সে চিনিল, ইনিই জমিদারের দুর্দান্ত ভ্রাতুষ্পুত্র মাধব।

মাধব একলাফে ঘোড়া হইতে নামিয়া ঘোড়া ছাড়িয়া দিয়া দালানের উপর উঠিল। সম্মুখেই চন্দনদাস; রক্তচক্ষু দ্বারা আপাদমস্তক তাহাকে নিরীক্ষণ করিয়া স্বভাব কর্কশ ভয়ঙ্কর সুরে মাধব প্রশ্ন করিল, 'তুই কে?'

চন্দনদাসের ইচ্ছা হইল, মাধবের দম্ভস্ফীত পৈশাচিক মুখে একটা লাথি মারে; কিন্তু সে তাহা করিল না। তাহার মাথার মধ্যে বিদ্যুতের মতো চিন্তাকার্য চলিতেছিল। মাধবের অভাবনীয় আবির্ভাবে তাহার সমস্ত মতলব পণ্ড হইয়া গিয়াছিল; সে ভাবিতেছিল, এ অবস্থায় কি করিলে সর্বদিক রক্ষা হয়? মাধবের সঙ্গে একটা গণ্ডগোল বাধাইলে লাভ হইবে না, বরং অনিষ্টের সম্ভাবনা উপস্থিত। এ ক্ষেত্রে কোনও হাঙ্গামা না করিয়া অপসৃত হওয়াই সুবিবেচনার কাজ। অথচ এই পাষণ্ডটার মুখ দেখিলে ও কথা শুনিলে মেজাজ ঠিক রাখা দুষ্কর। চুয়ার সর্বনাশ করিবার জন্যই এই নরপশু তাহাকে ছয় বৎসর জিয়াইয়া রাখিয়াছে, ভাবিতে চন্দনদাসের চোখের দৃষ্টি পর্যন্ত রক্তাভ হইয়া উঠিল।

তবু সে যথাযোগ্য আত্মদমন করিয়া মাধবের কথার উত্তর দিল, বলিল, 'সে খোঁজে তোমার দরকার কি?'

মাধব একটা অকথ্য গালি দিয়া বলিল, 'তুই এখানে কি চাস?'

চন্দনদাস আর ধৈর্য রাখিতে পারিল না, তাহার মাথার মধ্যে খুন চাপিয়া গেল। সে প্রত্যুত্তরে মাধবের নাসিকায় বজ্রসম কিল বসাইয়া দিয়া বলিল, 'এই চাই।'

এই নিরীহ-দর্শন যুবকের নিকট হইতে মাধব এত বড় দুঃসাহসিক কার্য একেবারে প্রত্যাশা করে নাই, সে সরিষার ফুল দেখিয়া মাটিতে বসিয়া পড়িল।

চন্দনদাস দেখিল, আর বিলম্ব করা সমচীন নয়; সে নিরস্ত্র, মাধবের কোমরে তরবারি রহিয়াছে। ঘোড়াটা সম্মুখেই দাঁড়াইয়া ছিল, সে দালান হইতে লাফ দিয়া তাহার পিঠে চড়িয়া বসিল। এই সময় মাধব ষণ্ডের মতো গর্জন করিয়া কোমর হইতে তরবারি বাহির করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু তাহার নাগালে পৌঁছিবার পূর্বেই চন্দনদাস তেজী ঘোড়ার পেট দুই পায়ে চাপিয়া ধরিয়া সবেগে ঘোড়া ছুটাইয়া দিল।

কেহ কেহ লুকাইয়া পাপাচরণ করে। কিন্তু ধর্ম ও সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া পাশবিক বলে প্রকাশ্যভাবে পাপানুষ্ঠান করিতে যাহারা অভ্যস্ত, তাহাদের অপরাধ-ক্লান্ত জীবনে এমন অবস্থা আসে, যখন কেবলমাত্র রমণীর সর্বনাশ করিয়া

আর তাহারা তৃপ্তি পায় না। তখন তাহারা পাপাচারের সহিত ধর্মের ভণ্ডামি মিশাইয়া তাহাদের দুষ্কার্যের মধ্যে একপ্রকার নূতন রস ও বিলাসিতা সঞ্চারের চেষ্টা করে। মাধব এই শ্রেণীর পাপী।

চন্দনদাস তাহার ঘোড়ায় চড়িয়া তাহাকে ফাঁকি দিয়া পলায়ন করিবার পর মাধব নিষ্ফল আক্রোশে আর কাহাকেও সম্মুখে না পাইয়া বুড়ীকে ধরিল; বুড়ীর চুলের মুটি ধরিয়া তলোয়ার দিয়া তাহাকে কাটিতে উদ্যত হইল। কিন্তু কাটিতে গিয়া তাহার মনে হইল, বুড়ীকে মারিলে হয়তো সেই ধৃষ্ট যুবকের পরিচয় অজ্ঞাত থাকিয়া যাইবে। কিল খাইয়া কিল চুরি করিবার লোক মাধব নয়; তখনও তাহার নাকের রক্তে গোঁফ ভাসিয়া যাইতেছিল। সে বুড়ীর চুল ধরিয়া টানিতে টানিতে ভিতরে লইয়া চলিল।

আঙিনার মাঝখানে বুড়ীকে আছড়াইয়া ফেলিয়া তাহার শীর্ণ হাতে একটা মোচড় দিয়া মাধব বলিল, 'হারামজাদী বুড়ী, ও ছোঁড়া তোর কে বল?'

পূর্বেই বলিয়াছি, বুড়ী বুদ্ধিমতী; তাই ভয়ে প্রাণ শুকাইয়া গেলেও তাহার চিন্তা করিবার শক্তি ছিল। সে বুঝিয়াছিল, কোনও কথা না বলিলেও প্রাণ যাইবে এবং ষড়যন্ত্র প্রকাশ করিয়া ফেলিলেও প্রাণ যাইবে, সুতরাং মধ্য পথ অবলম্বন করাই যুক্তিসঙ্গত। সর্বনাশ উপস্থিত হইলে পণ্ডিতগণ অর্ধেক ত্যাগ করেন, বুড়ীও তেমনই ষড়যন্ত্রের অংশটা বাদ দিয়া আর সব সত্য কথা বলিবে স্থির করিল। তাহাতে আর কিছু না হউক, মাধবের হাতে প্রাণটা বাঁচিয়া যাইতে পারে।

বুড়ী তখন অকপটে চন্দনদাসের যতটা পরিচয় জানিতে পারিয়াছিল, তাহা মাধবের গোচর করিল। চাঁপা পাছে অনর্থক হাঙ্গামা করে, এই ভয়ে মিছিমিছি চন্দনদাসকে নাতি বলিয়া পরিচিত করিয়াছিল, তাহাও স্বীকার করিল। কাঁদিতে কাঁদিতে অনেক মাথার দিব্য, চোখের দিব্য দিয়া বলিল যে, চন্দনদাসকে সে পূর্বে কখনও দেখে নাই, আজ প্রথম সে তাহার দোকানে আসিয়া মিষ্ট কথায় তাহার সহিত আলাপ করিতে আরম্ভ করে। তাহার কোনও দুরভিসন্ধি ছিল কিনা, তাহাও বুড়ীর অজ্ঞাত।

চাঁপা মাধবের বাড়িতে খবর দিতে গিয়াছিল, এতক্ষণে এক ঝাঁক পাইক সঙ্গে লইয়া পদব্রজে ফিরিল। পাইকদের হাতে সড়কি, ঢাল; জাতিতে তেঁতুলে বাগ্দী। ইহাদের বাহুবলে মাধব দেশটাকে সন্ত্রস্ত করিয়া রাখিয়াছিল। প্রভু ও ভৃত্যে অবস্থা-ভেদ ছাড়া প্রকৃতিগত পার্থক্য বিশেষ ছিল না।

বুড়ীকে নানা প্রশ্ন করিয়া শেষে বোধহয় মাধব তাহার গল্প বিশ্বাস করিল। চাঁপা যাহা বলিল, তাহাতে বুড়ীর কথা সমর্থিত হইল। তাছাড়া মাধবের রক্তচক্ষুর সম্মুখে বুড়ী মিথ্যা কথা বলিবে, ইহাও দাম্ভিক মাধব বিশ্বাস করিতে পারে না। সে এদিক-ওদিক তাকাইয়া বলিল, 'তোর নাতনী কোথায়?'

বুড়ী বলিল, 'ঘরেই আছে বাবা।'

মাধব চাঁপাকে হুকুম করিল, 'দেখে আয়।'

চাঁপা দেখিয়া আসিয়া বলিল, চুয়া ঘরেই আছে বটে।

মাধবের তখন বিশ্বাস জন্মিল, চুয়া সম্বন্ধে ভয়ের কোনও কারণ নাই। তবু সে দুইজন পাইককে বুড়ীর বাড়ি পাহারা দিবার জন্য নিযুক্ত করিল, বলিল, 'কাল

সন্ধ্যে পর্যন্ত এ বাড়িতে কাউকে ঢুকতে দিবিনে। যদি কেউ ঢুকতে চায় তার গলায় সড়কি দিবি।'

এইরূপে বাড়ির সুব্যবস্থা করিয়া মাধব বাহিরে আসিল। এই সময় একবার তাহার মনে হইল, আর বৃথা দেরি না করিয়া আজকে চুয়াকে নিজের প্রমোদ-উদ্যানে টানিয়া লইয়া যায়। কিন্তু তাহা হইলে এত বৎসর ধরিয়া যে চরম বিলাসিতার আয়োজন করিয়াছে, তাহা ব্যর্থ হইয়া যাইবে। মাধব নিরস্ত হইল। তৎপরিবর্তে যে স্পর্ধিত বেনের ছেলেটা তাহার গায়ে হাত তুলিতে সাহস করিয়াছে, তাহার নৌকা লুঠ করিয়া তাহাকে নিজের চক্ষুর সম্মুখে কোমর পর্যন্ত মাটিতে পুঁতিয়া কুকুর দিয়া খাওয়াইবার আয়োজনে দিনটা সদ্ব্যয় করিতে মনস্থ করিল। এটাও একটা মন্দ বিলাসিতা নয়।

বাহিরে আসিয়া মাধব তাহার সর্দার পাইককে বলিল, 'বদন, তুই দশ জন পাইক নিয়ে গঙ্গাঘাটে যা। সেখানে চন্দনদাস বেনের নৌকা আটক কর্। আমি যাচ্ছি।'—বলিয়া আর একজন পাইককে ঘোড়া আনিতে পাঠাইল।

বদন সর্দার প্রভুর আজ্ঞা শিরোধার্য করিয়া যখন ঘাটে পেঁীছিল, তখন চন্দনদাসের নৌকা দুখানি ভাগীরথীর বক্ষে পাল উড়াইয়া উজান বহিয়া চলিয়াছে; বহুপদ-বিশিষ্ট বিরাট জল-পতঙ্গের মতো তাহাদের দাঁড়গুলি যেন গঙ্গার উপর তালে তালে পা ফেলিতেছে।

ওদিকে চন্দনদাস তীরবেগে ঘোড়া ছুটাইয়া দিয়াছিল। দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে, পথে লোকজন কম। চন্দনদাস ধাবমান ঘোড়ার পিঠে বসিয়া চিন্তা করিতেছিল—এখন কর্তব্য কি? প্রথমত চুয়াকে রক্ষা করিতে হইবে। মাধবের নাকে কিল মারার ফলে তাহার ক্রোধ কোন্ পথ লইবে, অনুমান করা কঠিন; মাধব চুয়ার কথা ভুলিয়া তাহার প্রতি ধাবমান হইতে পারে; তাহাতে চুয়া কিছুক্ষণের জন্য রক্ষা পাইবে। দ্বিতীয়ত তাহার নৌকা বাঁচাইতে হইবে। ক্রোধান্ধ মাধব প্রথমে তাহাকেই ধরিতে আসিবে; তখন তাহার অমূল্য পণ্য ও সোনাদানায় বোঝাই নৌকা লুণ্ঠিত হইবে। মাধব রেয়াৎ করিবে না।

ঘাটে পেঁীছিবার পূর্বেই চন্দনদাস কর্তব্য স্থির করিয়া ফেলিল। অশ্বত্থ-শাখায় ঘোড়া বাঁধিয়া সে দ্রুতপদে নৌকায় উঠিল; দেখিল, মাঝি-মাল্লারা আহার করিতে বসিয়াছে। চন্দনদাস সর্দার-মাঝিকে ডাকিয়া পাঠাইয়া বলিল, 'এখনি নৌকো খুলতে হবে।'

হতবুদ্ধি মাঝি বলিল, 'এখনি কিন্তু—'

'কোনো তর্ক করার সময় নেই। এই দণ্ডে নৌকো খোলা—পাল আর দাঁড় দুই লাগাও। আজ সন্ধ্যে পর্যন্ত যতদূর সম্ভব উজান বেয়ে যাবে, তারপর গাঙের মাঝখানে নোঙর ফেলবে। আমি যতদিন না ফিরি, সেইখানে অপেক্ষা করবে। বুঝলে?'

'আপনি সঙ্গে যাবেন না?'

'না। এখন যাও, আর দেরি ক'রো না। যতদিন আমি না ফিরি সাবধানে নৌকো পাহারা দিও।'

'যে আজ্ঞা।'—বলিয়া প্রাচীন মাঝি চলিয়া গেল। মুহূর্ত পরে দুই নৌকার

মাঝি-মাল্লার হাঁকডাক ও পাল তোলার হুড়াহুড়ি আরম্ভ হইল। এই অবকাশে চন্দনদাস নৌকার পশ্চাতে মাণিকভাণ্ডারে গিয়া কিছু জিনিস সংগ্রহ করিয়া লইল প্রথমে সিন্দুক হইতে মোহর-ভরা একটা সর্পাকৃতি লম্বা থলি বাহির করিয়া কোম জড়াইয়া লইল। যে-কাজে যাইতেছে, তাহাতে কত অর্থের প্রয়োজন কিছুই স্থিরত নাই ; অথচ বোঝা বাড়াইলে চলিবে না। চন্দনদাস ভাবিয়া চিন্তিয়া একছড়া মহামূল সিংহলী মুক্তার হার গলায় পরিয়া লইল। যদি মোহরে না কুলায়, হার বিক্র করিলে যথেষ্ট অর্থ পাওয়া যাইবে।

এছাড়া আরও দুইটি জিনিস চন্দনদাস সঙ্গে লইল। একটি ইস্পাতের উপ সোনার কাজ করা ছোট ছোরা ; এটি সে কোচিনে এক আরব বনিকের নিক কিনিয়াছিল। দ্বিতীয়, এক কাফ্রির উপহার একটি লোহার কাঁটা। কৃষ্ণবর্ণ দ্বিভুজ লোহার কাঁটা, সেকালে শৌখিন স্ত্রী-পুরুষ এইরূপ কাঁটা চুলে পরিত। এই কাঁটা বিশেষত্ব এই যে, ইহার তীক্ষ্ম অগ্রভাগ শরীরের কোনও অংশে ফুটিলে তিনবার নিশ্বা ফেলিত যতক্ষণ সময় লাগে, ততক্ষণের মধ্যে মৃত্যু হইবে। চন্দনদাস কাঁটার সূক্ষ্মা সোনার খাপে ঢাকিয়া সাবধানে নিজের চুলের মধ্যে গুঁজিয়া লইল।

নৌকা হইতে নামিয়া চন্দনদাস নগরের ভিতর দিয়া আবার হাঁটিয়া চলিল ঝাঁ-ঝাঁ দ্বিপ্রহর, আশে-পাশে দোকানের মধ্যে দোকানী নিদ্রালু ; মধ্যাকাশ হইতে সূর্যদেব প্রখর রৌদ্র ঢালিয়া দিতেছেন। গাছ-পালা পর্যন্ত নিঝুম হইয়া পড়িয়াছে মানুষ গৃহতলের ছায়ায় আশ্রয় লইয়াছে।

কিছুদূর যাইবার পর একটা মোড়ের মাথায় পৌঁছিয়া চন্দনদাস এবার কোন পথে যাইবে ভাবিতেছে, এমন সময় তাহার চোখে পড়িল, একটা নয়-দশ বছরে কটিবাস-পরিহিত শীর্ণকায় বালক প্রচণ্ড মার্তণ্ড-ময়ূখ সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয় পথের মধ্যে একাকী ডাণ্ডাগুলি খেলিতেছে। চন্দনদাস হাতছানি দিয়া তাহাকে ডাকিল। বালক ক্রীড়ায় বিরাম না দিয়া, যষ্টির আঘাতে ক্ষুদ্র কাষ্ঠখণ্ডটিকে চন্দনদাসের দিকে তাড়িত করিতে করিতে তাহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল তারপর প্রবীণের মতো তীক্ষ্মদৃষ্টিতে চন্দনদাসের বেশভূষা নিরীক্ষণ করিয়া বলিল 'সওদাগর ! সমুন্দর থেকে আসছ—ন্যাঃ ?'

বালকের ভাষা ও বাক্‌প্রণালী অতি অদ্ভুত—আমরা তাহা সরল ও সহজবোধ করিয়া দিলাম।

চন্দনদাস বলিল, 'হ্যাঁ। নিমাই পণ্ডিতের বাড়ি কোথায় জানিস ?'

বালক বলিল, 'হিঃ—জানি।'

'আমাকে সেখানে নিয়ে চল্।'

বালকের ধূর্ত মুখে একটু হাসি দেখা দিল ; সে এক চক্ষু মুদিত করিয়া বলিল 'ডাংগুলি খেলছি যে।'

'পয়সা দেব।'

আকর্ণ দন্তবিকাশ করিয়া বালক হাত পাতিল, আগে দাও।'

চন্দনদাস তাহাকে একটা কপর্দক দিল, তখন আবার ডাংগুলি খেলিতে খেলিতে পথ দেখাইয়া লইয়া চলিল।

বেশি দূর যাইতে হইল না ; নিম্ববৃক্ষচিহ্নিত একটা বাড়ি যষ্টি-নির্দেশে দেখাইয়া

দিয়া বালক প্রস্থান করিতেছিল ; চন্দনদাস তাহাকে ফিরিয়া ডাকিল, বলিল, 'তুই যদি আর একটা কাজ করতে পারিস ; তোকে চারটে পয়সা দেব।'

'কি ?'

'কাঞ্চন বেনের বাড়ি জানিস ?'

বালকের চক্ষু উজ্জ্বল হইল, 'চুয়া ? মাধবের কইমাছ ? জানি—হি-হি।' চন্দনদাসের ইচ্ছা হইল অকালপক্ক ছোঁড়ার গালে একটা চপেটাঘাত করে ; কিন্তু সে কষ্টে ক্রোধ সংবরণ করিয়া বলিল, 'হ্যাঁ, চুয়া। শোন, তার বাড়ির সামনে দিয়ে যাবি, কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা করবি না, কেবল দেখে আসবি, সেখানে কি হচ্ছে। পারবি ?'

বালক বলিল, 'হিঃ—পয়সা দাও।'

চন্দনদাস মাথা নাড়িয়া বলিল, 'না, আগে খবর নিয়ে আসবি তবে পয়সা পাবি। আমি এইখানে থাকব।'

বালক ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া মনে মনে গবেষণা করিল, চন্দনদাসকে বিশ্বাস করা যাইতে পারে কি না। শেষে ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইয়া পূর্ববৎ ডাংগুলি খেলিতে খেলিতে প্রস্থান করিল।

চন্দনদাস তখন নিমাই পণ্ডিতের গৃহে প্রবেশ করিল। সম্মুখেই টোলের আটচালা। ছাত্রেরা কেহ নাই, নিমাই পণ্ডিত একাকী বসিয়া আছেন। তাঁহার কোলে তুলটের একখানি নূতন পুঁথি ; পাশে লেখনী ও মসীপাত্র। চন্দনদাসের পদশব্দে নিমাই পণ্ডিত মুখ তুলিলেন ; প্রশান্ত বিশাল চক্ষু হইতে শাস্ত্র-চিন্তাজনিত স্বপ্নাচ্ছন্নতা দূর করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কাকে চান ?'

চন্দনদাস বলিল, 'নিমাই পণ্ডিতকে।'

'আমিই নিমাই পণ্ডিত।'

পাদুকা খুলিয়া চন্দনদাস গিয়া নিমাই পণ্ডিতকে প্রণাম করিল। নিমাই পণ্ডিত বয়সে তাহার অপেক্ষা ছোট হইলেও ব্রাহ্মণ। তুলসীপাতার ছোট বড় নাই।

নিমাই পণ্ডিত প্রণাম গ্রহণ করিয়া বলিলেন, 'দেখেছি ব'লে মনে হচ্ছে—আপনিই কি আজ দুখানি নৌকা নিয়ে সমুদ্রযাত্রা থেকে ফিরেছেন ?'

চন্দনদাস বিনীতভাবে বলিল, 'আজ্ঞে হাঁ, আমিই।'

নিমাই পণ্ডিত হাসিয়া বলিলেন, 'আজ আপনার নৌকার ঢেউয়ে নবদ্বীপের একটি অমূল্য রত্ন ভেসে যাচ্ছিল, অনেক কষ্টে রক্ষা করা গিয়েছে। যাহোক্, আপনি— ।'

চন্দনদাস নিজের পরিচয় দিয়া শেষে করজোড়ে বলিল, 'আপনি ব্রাহ্মণ এবং মহাপণ্ডিত, আমাকে আপনি, সম্বোধন করলে আমার অপরাধ হয়।'

নিমাই পণ্ডিত বলিলেন, 'বেশ, কি ব্যাপার বল তো ?'

চন্দনদাস বলিল, 'একটা কাজে আপনার সাহায্য চাইতে এসেছি। নবদ্বীপে কাউকে আমি চিনি না, কেবল আপনার নাম শুনেছি। শুনেছি, আপনি শুধু অপরাজেয় পণ্ডিত নন, সৎকার্য করবার সাহসও আপনার অদ্বিতীয়। আমাকে সাহায্য করবেন কি ?'

নিমাই পণ্ডিত বুঝিলেন, বণিকতনয় আজ গুরুতর কোনও কাজ আদায় করিতে আসিয়াছে, মৃদুহাস্যে বলিলেন, 'তোমার নম্রতা আর বিনয় দেখে ভয় হচ্ছে। যা হোক্ প্রস্তাবটা কি শুনি ?'

চন্দনদাস হাসিল ; বুঝিল, নিমাই পণ্ডিতকে মিষ্ট চাটুকথায় বিগলিত করা চলিবে না, তাঁহার সহিত অকপট ব্যবহার করাই শ্রেয়ঃ। সে ক্ষণেক চিন্তা করিয়া বলিল, আপনি কাঞ্চন বেনের মেয়ে চুয়াকে জানেন ?

নিমাই পণ্ডিত তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চন্দনদাসের মুখের পানে চাহিলেন। তাঁহার মুখ ঈষৎ গম্ভীর হইল, বলিলেন, 'চুয়ার কথা নবদ্বীপের সকলেই জানে।'

চন্দনদাস বলিয়া উঠিল, 'তবু তাকে উদ্ধারের চেষ্টা কেউ করে না ?'

নিমাই পণ্ডিত স্থির হইয়া রহিলেন, কোনও উত্তর দিলেন না।

চন্দনদাস তখন বলিল, 'আমি চুয়াকে বিয়ে করতে চাই। আপনি সহায় হবেন কি ?'

নিমাই পণ্ডিত বিস্মিত হইলেন। কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া কোল হইতে পুঁথি নামাইয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, 'কিন্তু চুয়া সম্বন্ধে সব কথা তুমি জান কি ?'

'যা জানি, আপনাকে বলছি।'—এই বলিয়া আজ নৌকা হইতে নামিবার পর এ পর্যন্ত যাহা ঘটিয়াছিল সমস্ত সবিস্তারে বর্ণনা করিল ; শেষে কহিল, 'এই নির্বান্ধব পুরীতে চুয়া যেমন একা, আমিও তেমনি একা। এখন আপনি যদি সাহায্য করেন, তবেই কিছু করতে পারি। নচেৎ একটি বালিকার সর্বনাশ হয়।'

নিমাই পণ্ডিত ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া চিন্তামগ্ন হইলেন।

এই সময় সেই বালক ডাংগুলি হস্তে ফিরিয়া আসিল। চন্দনদাস সাগ্রহে তাহাকে কাছে ডাকিতেই সে বলিল, 'চুয়ার বাড়ির সামনে দুটো পাইক ব'সে আছে ; যে যাচ্ছে, তাকে হুমকি দিচ্ছে।'

'আর কি দেখলি ?'

'চুয়া আর তার ঠানদি ঘরে আছে। চাঁপা নাপতিনী বুড়ীর সঙ্গে কোঁদল করছে।'

'আর কিছু ?'

'আর মাধাই চন্নন বেনের ডিঙ্গি লুঠ করতে গেছে। পয়সা দাও।'

খুশি হইয়া চন্দনদাস বালককে চার পয়সার স্থলে দু'গন্ডা দিল। হৃষ্ট বালক তীক্ষ্ণস্বরে একবার 'উ—' বলিয়া উল্লাস জ্ঞানপূর্বক ডাংগুলি খেলিতে খেলিতে প্রস্থান করিল।

বালককে বিদায় করিয়া চন্দনদাস নিমাই পণ্ডিতের দিকে ফিরিতে তিনি উদ্দীপ্ত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, 'আমি তোমাকে সাহায্য করব। তোমার উদ্যম প্রশংসনীয় ; আমরা গাঁয়ের লোক যা করিনি, তুমি বিদেশী তাই করতে চাও। তোমার স্বার্থ আছে জানি, কিন্তু তাতে তোমার মহত্ত্বের কিছুমাত্র হানি হয় না ; আমি কি করতে পারি বল।'

চন্দনদাস বলিল, 'তা আমিও জানি না। আপাতত পরামর্শ দিতে পারেন।'

'বেশ এস, পরামর্শ করা যাক্। মাধব যে রকম দুর্ধর্ষ পাষন্ড, তার বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগে কোনও ফল হবে না। আমার মনে হয়—'

চন্দনদাস বলিল, 'একটি নিবেদন আছে। আমার বড় তৃষ্ণা পেয়েছে ; ব্রাহ্মণবাড়ি একটু পাদোদক পেতে পারি ?'

নিমাই সচকিত হইয়া বলিলেন, 'তুমি এখনও আহার করনি ?'

চন্দনদাস হাসিয়া বলিল, 'না, কেবল চুয়ার দেওয়া একখানি বাতাসা খেয়েছি।'

'কি আশ্চর্য! এতক্ষণ বলনি কেন? দাঁড়াও, আমি দেখি।'—বলিয়া খড়ম পরিয়া ত্বরিতে অন্দরে প্রবেশ করিলেন।

বেলা তখন তৃতীয় প্রহর। বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী ভৃত্য-পরিজন সকলকে খাওয়াইয়া নিজে আহারে বসিতে যাইতেছিলেন, নিমাই গিয়া বলিলেন, 'একজন অতিথি এসেছে। খেতে দিতে পারবে?'

বিষ্ণুপ্রিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, 'পারব।' তারপর ক্ষিপ্রহস্তে দালানে জল ছড়া দিয়া পিঁড়ি পাতিয়া নিজের অন্নব্যঞ্জক অতিথির জন্য ধরিয়া দিয়া স্বামীর মুখের পানে চাহিলেন।

নিমাই দাঁড়াইয়া দেখিতেছিলেন, স্মিতমুখে চন্দনদাসকে ডাকিতে গেলেন। এই নীরব কর্মপরায়ণা অনাদৃতা বধূটি ক্ষণকালের জন্য নিমাই পণ্ডিতের মন হইতে লক্ষ্মীদেবীর স্মৃতি মুছিয়া দিল।

অতঃপর চন্দনদাস পরিতোষপূর্বক ব্রাহ্মণগৃহে প্রসাদ পাইল।

পরামর্শ স্থির করিতে অপরাহ্ণ গড়াইয়া গেল। যে সকল ছাত্র টোলে পড়িতে আসিল, নিমাই পণ্ডিত তাহাদের ফিরাইয়া দিলেন।

সংকল্প স্থির করিয়া নিমাই বলিলেন, 'এ ছাড়া আর তো কোনও উপায় দেখি না। তৃতীয় ব্যক্তিকে দলে টানিতে ভয় করে। কথা জানাজানি হয়ে যদি মাধবের কানে ওঠে, তা হ'লে আর কোনও ভরসা থাকবে না।'

চন্দনদাস জিজ্ঞাসা করিল, 'এ দেশের মাঝি-মাল্লাদের বিশ্বাস করা যেতে পারে?'

'অন্য ব্যাপারে বিশ্বাস করা যায়, কিন্তু যে ব্যাপারে মাধব আছে, তাতে কাউকে বিশ্বাস করা চলে না। ঘুণাক্ষরে আমাদের মতলব টের পেয়ে তারা আমাদেরই মাধবের হাতে ধরিয়ে দেবে।'

'তা হ'লে—'

নিমাই হাসিয়া বলিলেন, 'হ্যাঁ, মাঝি-মাল্লার কাজ আমাকেই করতে হবে। কাণভট্টের আশীর্বাদ দেখছি এর মধ্যে ফলতে আরম্ভ করেছে।'

চন্দনদাস বলিল, 'চুয়াকে খবর আমি দেব। শেষ রাত্রির দিকে পাইকরা ঘুমিয়ে পড়বে—সেই উপযুক্ত সময়। কি বলেন?'

'হ্যাঁ। তুমি তোমার নৌকা পাঠিয়ে দিয়ে বড় বুদ্ধিমানের কাজ করেছ। মাধব নিশ্চিন্ত থাকবে, হয়তো রাত্রিতে চুয়ার বাড়িতে পাহারা নাও থাকতে পারে।'

'অতটা ভরসা করি না। যা হোক্ দেখা যাক্।'

সন্ধ্যার প্রাক্কালে দুইজন বাহির হইলেন। ব্রাহ্মণ পল্লী হইতে অনেকটা উত্তরে গঙ্গাতীরে নৌ-কর সূত্রধরের বাস। সেখানে উপস্থিত হইয়া দুইজনে দেখিলেন, রাশি রাশি স্তূপীকৃত শাল, পিয়াল, সেগুণ, জারুল কাষ্ঠের প্রাকারের মধ্যে ছোট বড় নানাবিধ নৌকা তৈয়ার হইতেছে। কোনটির কঙ্কালমাত্র গঠিত হইয়াছে, কোনটি পাটাতনে শোভিত হইয়া পূর্ণাঙ্গ হইয়া উঠিতেছে। বড় বড় বজরা—পঞ্চাশ দাঁড়ের নৌকো—কাহারও হাঙ্গর-মুখ, কেহ-বা ময়ূরপঙ্খী, কেহ-বা হংসমুখী। আবার ক্ষুদ্রকায় ডিঙ্গি, সংকীর্ণদেহ ছিপও আছে। কোনটি সম্পূর্ণ হইয়াছে, কোনটি এখন অসম্পূর্ণ।

দুইজনে অনেক নৌকা দেখিয়া শেষে একটি ছোট ডিঙ্গি পছন্দ করিলেন। ডিঙ্গির সুন্দর গঠন, আড়াই হাত চওড়া, আট হাত লম্বা—শোলার মত হালকা। মাত্র চারিজন লোক তাহাতে বসিতে পারে।

নিমাই পন্ডিত ছুতারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'দাম কত?'

ছুতার কিন্তু ডিঙ্গি বেচিতে রাজী হইল না, বলিল, 'ফরমাশী ডিঙ্গি।'

চন্দনদাস জিজ্ঞাসা করিল, 'এ ডিঙ্গির জন্যে কত দাম পাবে?'

ছুতার একটু বাড়াইয়া বলিল, 'তিন তঙ্কা।'

চন্দনদাস নিঃশব্দে তাহার হাতে এক মোহর দিল। ছুতার স্বপ্নেও এত মূল্য কল্পনা করে নাই, সে কিছুক্ষণ হতবাক্ থাকিয়া মহানন্দে ডিঙ্গির মালিকত্ব চন্দন-দাসকে সমর্পণ করিল।

ডিঙ্গি তৎক্ষণাৎ গঙ্গার জলে ভাসানো হইল। নিমাই পন্ডিত ও চন্দনদাস তাহাতে আরোহণ করিয়া দুই জোড়া দাঁড় হাতে লইলেন। দাঁড়ের আঘাতে ডিঙ্গি জ্যা-মুক্ত তীরের মত জলের উপর ছুটিয়া গেল।

কিছুক্ষণ গঙ্গা বক্ষে দাঁড় টানিয়া উভয়ে দেখিলেন, ডিঙ্গি নির্দোষ ও অতি সহজে নিয়ন্ত্রণযোগ্য। দুইজনে সন্তুষ্ট হইয়া তীরে ফিরিলেন। তারপর নৌকা ছুতারের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া নিমাই পন্ডিত বললেন, কাল বৈকালে আমি এসে ডিঙ্গি নিয়ে যাব।

ছুতার আহ্লাদে একদিনের জন্য নৌকা রাখিতে সম্মত হইল।

অতঃপর নিমাই পন্ডিত গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন। চন্দনদাসের তখনও কাজ শেষ হয় নাই, সে গঙ্গার ধার দিয়া ঘাটের দিকে চলিল।

যে ঘাটে দ্বিপ্রহরে নৌকা বাঁধিয়াছিল, সেই ঘাটে যখন উপস্থিত হইল, তখন সন্ধ্যার ছায়া ঘনীভূত হইয়া আসিতেছে। ঘাঠে কয়েকটি ক্ষুদ্র ডিঙ্গি বাঁধা ছিল; চন্দনদাস কয়েকজন মাঝিকে জিজ্ঞাসা করিল, 'বাপু, তোমরা জেলে তো?'

'আজ্ঞে, কর্তা।'

'তোমাদের মোড়ল কে?'

একজন বৃদ্ধ-গোছের জেলে বলিল, 'আজ্ঞে কর্তা, আমি মোড়ল। আমার নাম শিবদাস।'

'বেশ। তোমার সঙ্গে আমি কিছু কারবার করতে চাই। এখানে যত জেলে আছে, সবাই তোমার অধীন তো?'

'আজ্ঞে।'

'কত জেলে-ডিঙ্গি তোমাদের আছে?'

'তা—ত্রিশ-চল্লিশখানা হবে।'

'বেশ। শোনো; তোমাদের যত জেলে-ডিঙ্গি আছে, সব আমি ভাড়া করলাম। তোমরা জেলে-মাঝির দল কাল বেলা তিন পহরের সময় বেরুবে; বেরিয়ে সটান স্রোতের মুখে দক্ষিণে গিয়ে শান্তিপুরের ঘাটে নৌকা বাঁধবে। তারপর সেখানে আমার জন্যে অপেক্ষা করবে। সন্ধ্যে পর্যন্ত আমি যদি না যাই, তা হ'লে আবার ফিরে আসবে।—বুঝলে?'

'বুঝলাম কর্তা। কিন্তু কাজটা কি, তা তো এখনও জানতে পারিনি।'

'কাজের কথা শান্তিপুরের ঘাটে জানতে পারবে। কেমন রাজী আছ ?'

'আজ্ঞে, গররাজী নই। কিন্তু ধরুন, শান্তিপুরের ঘাটে যদি আপনার দেখা না পাই ?'

'বলেছি তো, তা হ'লে ফিরে আসবে।'

কিন্তু আমাদের যাওয়া-আসা যে তা হ'লে না-হক হয়রানি হয়, কর্তা আপনাকে তখন পাব কোথায় ? আপনাকে চিনি না।'

চন্দনদাস হাসিয়া বলিল, 'তা হ'লেও তোমাদের লোকসান হবে না। তোমাদের অর্ধেক ভাড়া আমি আগাম দিয়ে যাব। সব নৌকো শান্তিপুরে যাওয়া-আসার জন্য কত ভাড়া লাগবে ?'

শিবদাস মোড়ল বিবেচনা করিয়া বলিল, 'আজ্ঞে দশটি তঙ্কার কম হবে না।'

চন্দনদাস একটু ব্যবসাদারি করিল। কারণ এক কথায় রাজী হইয়া গেলে জেলেরা কিছু সন্দেহ করিতে পারে। কিছুক্ষণ কষা-মাজার পর নয় তঙ্কা ভাড়া ধার্য হইল। চন্দনদাস পাঁচ তঙ্কা শিবদাস মোড়লের হাতে দিয়া বলিল, 'এই নাও। কিন্তু কথার নড়চড় যেন না হয়।'

'আজ্ঞে'—শিবদাস মুদ্রা গণিয়া লইল, 'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন কর্তা, ঠিক সময়ে আমরা শান্তিপুরের ঘাটে হাজির থাকব।'

'সব ডিঙ্গি নিয়ে যাবে, একখানাও বাদ না পড়ে।'

'আজ্ঞে, একখানাও বাদ পড়বে না।'

এইরূপে নবদ্বীপ হইতে সমস্ত ডিঙ্গি তফাৎ করিবার বন্দোবস্ত করিয়া চন্দনদাস কতকটা নিশ্চিন্ত মনে নিমাই পণ্ডিতের গৃহে ফিরিল। সেইখানেই তাহার রাত্রিতে থাকিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল।

রাত্রি তিন প্রহরে চুয়ার বাড়ির দালানে পাইক দুইজন বসিয়া বসিয়াই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। একজন দেওয়ালে ঠেস দিয়া পদযুগল প্রসারিত করিয়া দিয়াছিল। দ্বিতীয় ব্যক্তি ঘুমের ঘোরে কখন কাৎ হইয়া শুইয়া পড়িয়াছিল, তাহার নাসারন্ধ্র হইতে কামারের হাপরের মতো একপ্রকার শব্দ নির্গত হইতেছিল।

চারিদিকে গাঢ় অন্ধকার; কিন্তু অন্ধকারে চক্ষু অভ্যস্ত হইলে কিছু কিছু দেখা যায়; চন্দনদাস নিঃশব্দে ছায়ার মতো দালানে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার বাঁ হাতে সেই ক্ষুদ্র ছোরা। কিয়ৎকাল মূর্তির মতো দাঁড়াইয়া সে পাইকের নাসিকাধ্বনি শুনিল, তারপর দালানের গাঢ়তর অন্ধকারের ভিতর তাহার চক্ষু বস্তু নির্বাচন করিতে আরম্ভ করিল।

যে পাইকটা বসিয়া বসিয়া ঘুমাইতেছে, তাহার পদদ্বয় ঠিক দরজার সম্মুখে প্রসারিত; ভিতরে প্রবেশ করিতে হইলে তাহাকে লঙ্ঘন করিয়া যাইতে হইবে। তাছাড়া দরজার কপাট ভেজানো রহিয়াছে, ভিতর হইতে অর্গলবদ্ধ কি না, বুঝা যাইতেছে না। চন্দনদাস ধীরে ধীরে অতি সন্তর্পণে হাত বাড়াইয়া কপাট একটু ঠেলিল। মরিচা-ধরা হাঁসকলে ছুঁচার ডাকের মতো শব্দ হইল। দরজা ঈষৎ খুলিল।

হাঁসকলের শব্দে পাইকের হাপর হঠাৎ বন্ধ হইল। চন্দনদাস স্পন্দিত বক্ষে ছোরা দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কিন্তু পাইক জাগিল না, আবার তাহার নাক ডাকিয়া উঠিল।

চন্দনদাস তখন আবার কপাট একটু ঠেলিল, কপাট খুলিয়া গেল। এবারও একটু শব্দ হইল বটে, কিন্তু কেহ জাগিল না। তখন চন্দনদাস ইষ্টদেবতার নাম স্মরণ করিয়া নিঃশব্দে পাইকের পদযুগল লঙ্ঘন করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল।

আঙ্গিনায় উপস্থিত হইয়া চন্দনদাস চারিদিকে চাহিল। সম্মুখে কয়েকটা ঘর অস্ফুটভাবে দেখা যাইতেছে। কিন্তু কোন্ ঘরে চুয়া ঘুমাইতেছে? চাঁপাও বাড়িতে আছে; চুয়াকে খুঁজিতে গিয়া যদি চাঁপা জাগিয়া উঠে, তবেই সর্বনাশ! চন্দনদাস কি করিবে ভাবিতেছে, এমন সময় তাহার হাতে মৃদু স্পর্শ হইল।

চন্দনদাস চমকিয়া উঠিয়া অজ্ঞাতসারেই ছোরা তুলিল। এই সময় তাহার কানের কাছে মৃদু শব্দ হইল, 'এসেছো?'

'চুয়া!' কোমরে ছোরা রাখিয়া চন্দনদাস দুই হাতে চুয়ার হাত ধরিল, বলিল, 'চুয়া! এসেছি।'

চুয়ার নিশ্বাসের মতো মৃদু চাপা স্বর থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, সে বলিল, 'তুমি আসবে বলেছিলে, তাই আমি তোমার জন্যে সারারাত জেগে আছি।'

অন্য সময় কথাগুলি অভিসারিকার প্রণয়বাণীর মতো শুনাইত; কিন্তু বিপদের মাঝখানে দাঁড়াইয়াও চন্দনদাসের মনে হইল, এত মধুর শব্দসমষ্টি সে আর কখনও শুনে নাই। চুয়ার মুখখানি দেখিবার জন্য তাহার প্রাণে দুর্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা জাগিতে লাগিল। অথচ অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না। চন্দনদাস চুয়ার কানে কানে বলিল, 'চুয়া একটা আলো জ্বালতে পার না? তোমাকে বড় দেখতে ইচ্ছা হচ্ছে।'

দুইজনে অন্ধকারে হাত ধরাধরি করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, চুয়া ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিল, 'আচ্ছা, এস!'—বলিয়া হাত ধরিয়া লইয়া চলিল। চন্দনদাস তেমনই মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, 'চাঁপা কোথায়?'

'ঘুমুচ্ছে।'

'ঠানদি?'

'ঠানদিও ঘুমিয়ে পড়েছে।'

গোয়ালের মতো একটা পরিত্যক্ত ঘরে লইয়া গিয়া চুয়া চকমকি ঠুকিয়া আলো জ্বালিল। তখন প্রদীপের ক্ষীণ আলোকে চুয়ার মুখ দেখিয়া চন্দনদাস চমকিয়া উঠিল—চোখ দুইটি জবাফুলের মত লাল, চোখের কোলে কালি পড়িয়াছে; আশা, আশঙ্কা ও তীব্রোৎকণ্ঠার দ্বন্দ্বে চুয়ার অনুপম রূপ যেন ছিঁড়িয়া একাকার হইয়া গিয়াছে।

চন্দনদাসের বুকে বেদনাশূল বিঁধিল, সে বাষ্পাকুল কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, 'চুয়া!'

চুয়া মাটিতে বসিয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল; বেদনারুদ্ধ স্বরে বলিল, 'তোমার নৌকা চলে গেছে শুনে এত ভয় হয়েছিল!'

চন্দনদাস চুয়ার পাশে বসিয়া আর্দ্র কণ্ঠে বলিল, 'চুয়া, আর ভয় নেই। তোমার উদ্ধারের সমস্ত ব্যবস্থা করেছি।'

চুয়া চোখ মুছিয়া মুখ তুলিল, 'কি?'

চন্দনদাস বলিল, 'বলছি। আগে বল দেখি, তুমি সাঁতার কাটতে জান?'

অবসাদ-ভরা সুরে চুয়া বলিল, 'জানি। তাই তো ডুবে মরতে পারিনি। কতবার

সে চেষ্টা করেছি।'

চন্দনদাসের ইচ্ছা হইল, চুয়াকে বুকে জড়াইয়া লইয়া সান্ত্বনা দেয়। কিন্তু সে লোভ সংবরণ করিল, বলিল, ও কথা ভুলে যাও, চুয়া বুকে সাহস আন। আমি এসেছি দেখেও তোমার সাহস হয় না ?'

চুয়া কেবল তাহার কালিমালিপ্ত চোখ দুইটি তুলিয়া চন্দনদাসের মুখের পানে চাহিয়া রহিল ; হয়তো নিজের একান্ত নির্ভরশীলতার কথা প্রকাশ করিয়া বলিতে চাহিল, কিন্তু বলিতে পারিল না। চন্দনদাস তখন সংক্ষেপে প্রাঞ্জলভাবে উদ্ধারের উপায় বিবৃত করিয়া বলিল, চুয়া ব্যগ্র বিস্ফারিত নয়নে শুনিল। শুনিতে শুনিতে তাহার চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

চন্দনদাসের বিবৃতি শেষ হইলে চুয়া কিছুক্ষণ হেঁটমুখে নীরব হইয়া রহিল। লজ্জা করিবার সে অবকাশ পায় নাই—হৃদয়ের তুমুল আন্দোলনের মধ্যে এই তরুণ উদ্ধার কর্তাটিকে সে যে কি দৃষ্টিতে দেখিয়াছে, তাহা নিজেই জানিতে পারে নাই। তাই উদ্ধারের আশা যখন তাহার সংশয়ময় চিত্তে আগুনের মতো জ্বলিয়া উঠিল, তখন সে আর আত্মসংবরণ করিতে পারিল না, চন্দনদাসের পায়ের উপর আছড়াইয়া পড়িল। দুই হাতে পা জড়াইয়া কাঁদিয়া কহিল, 'একটা কথা বল।'

চন্দনদাস চুয়ার মুখ তুলিয়া ধরিবার চেষ্টা করিতে করিতে বলিল, 'চুয়া, চুয়া, কি কথা ?'

'বল আমায় বিয়ে করবে ? তুমি আমায় প্রবঞ্চনা করছ না ?'

চন্দনদাস জোর করিয়া চুয়ার মুখ তুলিয়া তাহার চোখের উপর চোখ রাখিয়া বলিল, 'চুয়া, আমার মায়ের নামে শপথ করছি, তোমাকে যদি বিয়ে না করি, যদি আমার মনে অন্য কোনও অভিসন্ধি থাকে, তবে আমি কুলাঙ্গার।'

চুয়ার মাথা আবার মাটিতে লুটাইয়া পড়িল। তারপর সে চোখ মুছিয়া উঠিয়া বসিল, 'তবে আমাকে এখনই নিয়ে যাচ্ছ না কেন ?'

চন্দনদাসের ইচ্ছা হইতেছিল, এখনই এই কারাগার হইতে চুয়াকে মুক্ত করিয়া পলায়ন করে। কিন্তু সুবিদ্ধি নিষেধ করিল। রাত্রি শেষ হইয়া আসিতেছে, ধরা পড়িবার সম্ভাবনা বড় বেশি। সে মাথা নাড়িয়া বলিল, 'না, এখন ভরসা হয় না। বাড়ির দোরে পাহারা, যদি ওরা জেগে ওঠে।—কিন্তু' আমার এখানে আর থাকা বোধহয় নিরাপদ নয়– চাঁপার ঘুম ভাঙতে পারে।'—বলিয়া চন্দনদাস অনিচ্ছাভরে উঠিয়া দাঁড়াইল।

চুয়ার মনে আবার ভয় প্রবেশ করিল। সম্মুখে সমস্ত দিন পড়িয়া আছে। কি জানি কি হয়। সে ভয়-কাতর চক্ষু দুইটি তুলিয়া বলিল, 'যাচ্ছ ?—কিন্তু—'

'কোনও ভয় নেই চুয়া।'

'কিন্তু—যদি বিঘ্ন হয়—যদি—একটা জিনিস দিতে পারবে ?'

'কি ?'

'একটু বিষ। যদি কিছু বিঘ্ন হয়—'

চন্দনদাস কিছুক্ষণ শক্ত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর ধীরে ধীরে নিজের চুল হইতে সেই কাঁটা বাহির করিয়া দিল। গাঢ়স্বরে বলিল, 'চুয়া, যদি দেখ কোনও আশা নেই, তবেই ব্যবহার ক'রো, তার আগে নয়।'—বলিয়া কাঁটার ভয়ঙ্কর কার্য-

কারিতা বুঝাইয়া দিল।

চন্দনদাসের মুখে কিন্তু হাসির প্রতিবিম্ব পড়িল না। সে চুয়ার দুই হাত লইয়া নিজের বুকের উপর রাখিয়া বলিল, 'চুয়া—'

বাক্‌পটু চন্দনদাস ইহার অধিক আর কথা খুঁজিয়া পাইল না।

চুয়া অশ্রু-আর্দ্র হাসিমুখ একবার চন্দনদাসের বুকের উপর রাখিল, অস্ফুটস্বরে কহিল, চুয়া নয়—চুয়া-বউ। এই আমাদের বিয়ে।'

ঘরের বাহিরে আসিবার পর একটা কথা চন্দনদাসের মনে পড়িল, সে বলিল, 'ঠান্‌দির কথা ভুলে গিয়েছিলাম। তাকে ব'লো—কাল সন্ধ্যের পর বাড়ি থেকে পালিয়ে যেন নিমাই পণ্ডিতের বাড়িতে যায়। সেখানে দু-একদিন লুকিয়ে থাকবে, তারপর আমি তাকে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করব।'

গ্রীষ্মের হ্রস্ব রাত্রি তখন শেষ হইয়া আসিতেছে। কাক-কোকিল ডাকে নাই, কিন্তু বাতাসে আসন্ন প্রভাতের স্পর্শ লাগিয়াছে। পূর্বাকাশে শুকতারা দপ দপ করিয়া জ্বলিতেছে।

আঙ্গিনায় দাঁড়াইয়া চন্দনদাস আর একবার চুয়ার দুই হাত নিজের বুকে চাপিয়া লইল। তারপর যে ভাবে আসিয়াছিল, সেইভাবে ছায়ামূর্তির মতো বাহির হইয়া গেল।

পাইক দুইজন শেষ রাত্রির গভীর ঘুম ঘুমাইতে লাগিল।

অমাবস্যার সংশয়পূর্ণ দিবস ধীরে ধীরে ক্ষয় হইয়া আসিল। অপ্রত্যাশিত কিছু ঘটিল না। কেবল দ্বিপ্রহরে মাধব চুয়ার গৃহে আসিয়া তদারক করিয়া গেল ও জানাইয়া গেল যে, তাহার প্রদত্ত শাস্ত্রীয় বিধান যেন যথাযথ পালিত হয়।

এখানে চাঁপার কাজ শেষ হইয়াছিল; মাধবের অনুমতি পাইয়া সে প্রমোদ-উদ্যানে পূজার আয়োজন করিতে গেল।

সায়াহ্নে নবদ্বীপের ঘাটে স্নানার্থীর বিশেষ ভিড় ছিল না। দুই-চারিজন নারী গা ধুইয়া যাইতেছিল, কেহ কেহ কলসে ভরিয়া গঙ্গাজল লইয়া যাইতেছিল। পুরুষের সংখ্যা অল্প। কেবল একজন পুরুষ অধীরভাবে সোপানের উপর পদচারণ করিতেছিল ও মাঝে মাঝে স্থির হইয়া উৎকর্ণভাবে কি শুনিতেছিল। তাহার গলায় মুক্তাহার বিলম্বিত—অন্যথা সাধারণ বাঙালীর বেশ। বলা বাহুল্য, সে চন্দনদাস।

ক্রমে সূর্য নদীর পরপারে অস্তমিত হইল। নিদাঘকালের দ্রুত সন্ধ্যা যেন পক্ষ বিস্তার করিয়া আসিয়া ভাগীরথীর জলে ধূসর ছায়া বিছাইয়া ছিল। পাশে নৌকাঘাট নির্জন ও নিস্তব্ধ। জেলে-ডিঙ্গি একটিও নাই। দুই-খানি স্থূল-কলেবর মহাজনী কিস্তি নিঃসঙ্গ অসহায়ভাবে বিস্তীর্ণ ঘাটে লাগিয়া আছে।

গঙ্গাবক্ষেও নৌকা নাই। কেবল দূরে উত্তরে একটি ক্ষুদ্র ডিঙ্গি স্রোতের মুখে ভাসিয়া আসিতেছে। অস্পষ্ট আলোকে মনে হয়, একটি লোক দাঁড় ধরিয়া তাহাতে বসিয়া আছে।

ক্রমে ডিঙ্গি মাঝগঙ্গা দিয়া ঘাটের সম্মুখীন হইল; কিন্তু ঘাটের নিকটে আসিল না, গঙ্গবক্ষে স্থির হইয়া রহিল। নৌকারূঢ় ব্যক্তি মাঝে মাঝে দাঁড় টানিয়া নৌকা ভাসিয়া যাইতে দিল না।

চন্দনদাস চিন্তিত মুখে অধীরপদে ঘুরিতে ঘুরিতে হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইয়া

পড়িল—ঐ আসিতেছে। পথে দূরাগত বাদ্যোদ্যম শুনা গেল। চন্দনদাস একবার গঙ্গাবক্ষস্থ ডিঙ্গির দিকে তাকাইল, তারপর স্পন্দিতবক্ষে একটা গোলাকার বুরুজের উপর গিয়া বসিল।

বাদ্যধ্বনি ক্রমশ কাছে আসিতে লাগিল। মহারোলে কাঁসর-ঘন্টা শিঙা ঢোল বাজিতেছে। তামাসা দেখিবার জন্য বহু স্ত্রী-পুরুষ বালক জুটিয়াছিল, তাহাদের কলরব সেই সঙ্গে মিশিয়া কোলাহল তুমুল হইয়া উঠিয়াছে।

ঘাটের শীর্ষে আসিয়া কোলাহল থামিল; বাজনা বন্ধ হইল। চন্দনদাস দেখিল, কৌতূহলী জনতাকে দ্বিধাবিভক্ত করিয়া দুই সারি ঢাল-সড়কিধারী পাইক নামিয়া আসিতেছে। তাহাদের দুই সারির মধ্যস্থলে মুক্তকেশী জবামাল্য-পরিহিতা চুয়া। চন্দনদাসও কৌতূহলী দর্শকের মতো দাঁড়াইয়া উঠিয়া এই বিচিত্র শোভাযাত্রা দেখিতে লাগিল।

পাইকগণ সদম্ভে অস্ত্র আস্ফালন করিয়া দর্শকদের ঠেলিয়া সরাইয়া দিয়া ঘাটের দিকে নামিতে আরম্ভ করিল। তাহাদের মধ্যবর্তিনী চুয়া মন্থরপদে এদিকে ওদিকে চাহিতে চাহিতে সোপান অবরোহণ করিতে লাগিল।

তারপর চন্দনদাসের সঙ্গে তাহার চোখাচোখি হইল। নিমেষের দৃষ্টি বিনিময়ে যে ইঙ্গিত খেলিয়া গেল, আর কেহ তাহা দেখিল না।

বুরুজের পাশ দিয়া যাইবার সময় চন্দনদাস অগ্রগামী পাইককে উচ্চৈঃস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, 'হ্যাঁ সর্দার, এ তোমাদের কিসের মিছিল?'

বদন সর্দার প্রশ্নকারীর দিকে ভ্রূকুটি করিয়া তাকাইল, তাহার গলায়, দোদুল্যমান মুক্তার হার দেখিল, তারপর রূঢ়স্বরে কহিল, 'তোর অত খবরে' দরকার কি?'

চন্দনদাস মুখে বিনীতভাব প্রকাশ করিয়া বলিল, 'না, তাই জিজ্ঞাসা করছি।' মনে মনে বলিল, 'মালিক আর চাকরের রা দেখি একই রকম। দাঁড়াও, তোমার মুণ্ডপাতের ব্যবস্থা করছি!'

পরবর্তী পাইকগণ সকলেই চোখ পাকাইয়া চন্দনদাসের দিকে তাকাইল; তাহার গলায় লোভনীয় মুক্তাহার কাহারও দৃষ্টি এড়াইল না। দুর্দান্ত প্রভুর উচ্ছৃঙ্খল ভৃত্য —হারছড়া কাড়িয়া লইবার জন্য সকলেরই হাত নিশপিশ করিতে লাগিল।

জলের কিনারায় গিয়া পাইকের দল থামিল। চুয়া সোপান হইতে ঝুঁকিয়া গঙ্গাজল মাথায় দিল, তাহার ঠোঁট দুইটি অব্যক্ত প্রার্থনায় একটু নড়িল। তারপর সে ধীরে ধীরে জলে অবতরণ করিল। প্রথম এক হাঁটু, ক্রমে এক কোমর, শেষে বুক পর্যন্ত জলে গিয়া দাঁড়াইল। গলার মালা জলে ভাসাইয়া দিয়া ডুব দিল।'

পাইকেরা কিনারায় কেহ বসিয়া, কেহ দাঁড়াইয়া গল্প করিতে করিতে গোঁফে মোচড় দিতে লাগিল।

এই একটি ক্ষুদ্র ব্যাপার ঘটিল। চন্দনদাস ইতিমধ্যে বুরুজ হইতে নামিয়া পাইকদের পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, হঠাৎ ব্যাকুলস্বরে বলিয়া উঠিল, 'ঐ যাঃ।'

একজন পাইক ফিরিয়া দেখিল, চন্দনদাসের গলার মুক্তাহার ছিঁড়িয়া গিয়াছে এবং মুক্তাগুলি সুতা হইতে ঝরঝর করিয়া ঘাটের শানের উপর ঝরিয়া পড়িতেছে। সে লাফাইয়া আসিয়া মুক্তা কুড়াইতে লাগিল। তাহাকে মুক্তা কুড়াইতে দেখিয়া বাকি কয়জন পাইক হুড়মুড় করিয়া আসিয়া পড়িল। মুক্তার হরির লুট—এমন

সুযোগ বড় ঘটে না। সকলে কাড়াকাড়ি করিয়া মুক্তা গুনিতে লাগিল, ঠেলা খাইয়া চন্দনদাস বাহিরে ছিটকাইয়া পড়িল।

পাইকরা মুক্তা কুড়াইতেছে, দর্শকেরা তাহাদের ঘিরিয়া লুব্ধচক্ষে দেখিতেছে। কেহ লক্ষ্য করিল না যে, সেই অবকাশে চন্দনদাস গঙ্গায় নামিল। চুয়া সাঁতার দিতে আরম্ভ করিয়াছে।

চুয়া ও চন্দনদাস পাশাপাশি সাঁতার কাটিয়া চলিল। অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে; তাহাদের কালো মাথা দুইটি কেবল জলের উপর দেখা যাইতেছে। চুয়া চন্দনদাসের পানে তাকাইল, তাহার সিক্ত মুখের উচ্ছ্বলিত হাসি চন্দনদাসকে পুরস্কৃত করিল।

তাহারা যখন ঘাট হইতে প্রায় চল্লিশ হাত গিয়াছে, তখন ঘাটে একটা হৈ হৈ শব্দ উঠিল। তারপর 'ধর্ ধর্, পালাল, পালাল' বলিয়া কয়েকজন পাইক জলে লাফাইয়া পড়িল, কয়েকজন নৌকার সন্ধানে ছুটিল। কিন্তু নৌকা কোথায়? বদন সর্দার ষাঁড়ের মতো চেঁচাইতে লাগিল।

গঙ্গার বুকে যে ছোট ডিঙ্গি আসিতেছিল, তাহা ক্রমে নিকটবর্তী হইতে লাগিল। চন্দনদাস বলিল, 'চুয়া যদি হাঁপিয়ে প'ড়ে থাক, আমার কাঁধ ধর।'

চুয়া বলিল, 'না, আমি পারব।'

চন্দনদাস পিছু ফিরিয়া দেখিল, যে পাইকগুলো জলে ঝাঁপ দিয়াছিল, তাহারা সজোরে সাঁতারিয়া আসিতেছে। কিন্তু তাহারা এখনও অনেক দূরে, নৌকা সম্মুখেই। কয়েক মুহূর্ত পরে দুইজনে একসঙ্গে গিয়া নৌকার কানা ধরিল।

নিমাই পণ্ডিত দাঁড় ছাড়িয়া চুয়াকে ধরিয়া নৌকায় তুলিলেন। চন্দনদাস তাহার পরে উঠিল।

যে পাইকটা সর্বাগ্রে আসিতেছিল,সে প্রায় বিশ হাতের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছিল। সে হাত তুলিয়া ভাঙা গলায় চিৎকার করিয়া কি একটা বলিল। প্রত্যুত্তরে চন্দনদাস উচ্চ হাসিয়া দুইখানি দাঁড় হাতে তুলিয়া লইল। নিমাই পণ্ডিতও দাঁড় হাতে লইলেন।

দুইজনে একসঙ্গে দাঁড় জলে ডুবাইয়া টানিলেন। প্রদোষের ছায়ালোকে ক্ষুদ্র ডিঙ্গি পাখির মতো উড়িয়া চলিল।

নবদ্বীপ হইতে পাঁচ ক্রোশ উত্তরে গঙ্গাবক্ষে চন্দনদাসের দুই সমুদ্রতরী নোঙর করা ছিল—অন্ধকারে তাহাদের একচাপ গাঢ়তর অন্ধকারের মতো দেখাইতেছিল।

রাত্রি এক প্রহরকালে ক্ষুদ্র নৌকা গিয়া চন্দনদাসের মধুকর ডিঙ্গার গায়ে ভিড়িল। মাঝিরা সজাগ ও সতর্ক ছিল; মুহূর্ত মধ্যে সকলে বড় নৌকায় উঠিলেন।

নিমাই পণ্ডিত বলিলেন, 'আমার কাজ তো শেষ হ'ল, আমি এবার ফিরি।'

চন্দনদাস হাত জোড় করিয়া বলিল, 'ঠাকুর এত দয়া করলেন, একটু বিশ্রাম ক'রে যান।'

নৌকায় দুইটি কুঠুরি—একটি মাণিকভাণ্ডার, অপরটি চন্দনদাসের শয়নকক্ষ। শয়নকক্ষের মেঝের রাঙন পক্ষ্মল সুতীর আস্তরণ। ঘরে দীপ জ্বলিতেছিল; সকলে তাহাতে প্রবেশ করিলেন। চুয়া এককোণে জড়সড় হইয়া অর্ধশুষ্ক বসন গায়ে জড়াইয়া দাঁড়াইল। চন্দনদাস তাড়াতাড়ি পেঁটারা হইতে নিজের একখানা ক্ষৌমবস্ত্র বাহির করিয়া চুয়ার গায়ে ফেলিয়া দিল। চুয়া কাপড় লইয়া পাশের ঘরে গেল।

নিমাই পণ্ডিত আস্তরণের উপর আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন ; চুয়া প্রস্থান করিলে চন্দনদাস চুপি চুপি বলিল, 'ঠাকুর, বিয়েটা আজ রাতেই দিয়ে দিলে ভালো হয়।'

নিমাই হাসিয়া বলিলেন, 'এত তাড়া কিসের ?' বাড়ি গিয়ে বিয়ে ক'রো।'

চন্দনদাস ভারি ভালোমানুষের মতো বলিল, 'না ঠাকুর, চুয়া যদি কিছু মনে করে ?—তাছাড়া, নৌকোয় একটি বই শোবার ঘর নেই।'

নিমাই বলিলেন, 'কিন্তু বিয়ে দিই কি ক'রে ? উপকরণ কই ?'

'ঠাকুর, আপনি পণ্ডিত মানুষ, সামান্য পুরুত তো নন। আপনি ইচ্ছে করলে শুধু হাতেই বিয়ে দিতে পারেন।'

নিমাই স্মিতমুখে চিন্তা করিয়া বলিলেন, 'মন্দ কথা নয়। তুমি কন্যাকে হরণ ক'রে এনেছ, সুতরাং তোমাদের রাক্ষস বিবাহ হতে পারে। রাক্ষস বিবাহে কোনও অনুষ্ঠানের দরকার নেই।'

চন্দনদাস মহা উল্লাসে উঠিয়া গিয়া চুয়ার হাত ধরিয়া লইয়া আসিল ; বলিল, 'চুয়া, ঠাকুর এখনই আমাদের বিয়ে দেবেন।'

পট্টাম্বরপরিহিতা চুয়া নত-নয়নে রহিল। নিমাই হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'চন্দনদাস নাছোড়বান্দা, আজ বিয়ে ক'রে তবে ছাড়বে।' চুয়ার মুখে অরুণরাগ দেখিয়া বুঝিলেন, তাহার অমত নাই। বলিলেন, 'বেশ। ফুলের মালা তো হবে না, দু ছড়া হার যোগাড় কর।'

পুলকিত চন্দনদাস মাণিকভাণ্ডার হইতে দুইগাছা মুক্তার মালা বাহির করিয়া দিল। তখন বিবাহ-ক্রিয়া আরম্ভ হইল।

নিমাই একটি হার চুয়ার হাতে দিয়া বলিলেন, 'দুজনে দুজনের গলায় দাও।'

উভয়ে মালা-বদল করিল।

নিমাই বলিলেন, 'ঈশ্বর সাক্ষী ক'রে গঙ্গার বুকের উপর ব্রাহ্মণ-সাক্ষাতে আজ তোমরা স্বামী-স্ত্রী হ'লে। আশীর্বাদ করি, তোমাদের মঙ্গল হোক্।'

উভয়ে নতজানু হইয়া ভক্তিপুত-চিত্তে এই দেবকল্প তরুণ ব্রাহ্মণের পদধূলি লইল।

তারপর উঠিয়া চন্দনদাস বলিল, 'ঠাকুর এ বিয়ে লোকে মানবে তো ?'

নিমাই পণ্ডিতের নাসা স্ফুরিত হইল, তিনি গর্বিতস্বরে বলিলেন, 'নিমাই পণ্ডিত যে বিয়ের পুরুত, সে বিয়ে অমান্য করে কে ?'

চন্দনদাস তখন নিমাই পণ্ডিতের পদতলে একমুঠি মোহর রাখিয়া বলিল, 'দেবতা, আপনার দক্ষিণা।'

নিমাই একবার হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন, 'ঐটি পারব না। যাক্, আজ উঠলাম। বউকে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা শীগগির ক'রো। আর বাড়ি গিয়ে যথারীতি লৌকিক বিবাহ ক'রো। অধিকন্তু না দোষায়।'

'তা করব। কিন্তু ঠাকুর আপনি ক্লান্ত, পাঁচ-ছ ক্রোশ দাঁড় টেনে এসেছেন ; আজ রাত্রিটা নৌকোয় কাটিয়ে গেলে হ'ত না ?'

'না, আজই আমায় ফিরতে হবে ; রাত্রিতে না ফিরলে মা চিন্তিত হবেন। তা ছাড়া, তোমার নৌকোয় তো একটি বই ঘর নেই।'—বলিয়া মৃদু হাসিলেন।

চন্দনদাস একটু লজ্জিত হইল।

তারপর সেই মসীকৃষ্ণ অমাবস্যার মধ্যযামে নিমাই পণ্ডিত ডিঙ্গিতে উঠিয়া একাকী নবদ্বীপের পানে ফিরিয়া চলিলেন। যতক্ষণ তাঁহার দাঁড়ের শব্দ শুনা গেল, চুয়া ও চন্দন জোড়হস্তে তদ্‌গতচিত্তে নৌকার পাশে দাঁড়াইয়া বাহিরের দিকে তাকাইয়া রহিল।

ভল্লু সর্দার

গোড়াতেই স্বীকার করিতে হইবে যে, ভল্লুক বয়ঃক্রম ছয় বৎসর। তাহার কার্যকলাপ দেখিয়া এ বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে; কিন্তু সন্দেহ করিলে চলিবে না। আমরা ঠিকুজী-কোষ্ঠীর সহিত অপরিচিত।

ভল্লুর জীবনযাত্রা বোধ করি আরও কয়েক বৎসর অল্পসল্প দুষ্টামী করিয়া অপেক্ষাকৃত বৈচিত্রহীনভাবেই কাটিয়া যাইত; কিন্তু হঠাৎ একদিন বায়স্কোপ দেখিতে গিয়া সব ওলটপালট হইয়া গেল। সে অপূর্ব কয়েকটি আইডিয়া লইয়া বায়স্কোপ হইতে ফিরিয়া আসিল।

প্রধান আইডিয়া, সে নিজে একজন দুর্দান্ত ডাকাতের সর্দার। যেমন-তেমন সর্দার নয়—একদিকে যেমন দুর্ধর্ষ বীর, অন্যদিকে তেমনি ন্যায়পরায়ণ—দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করাই তার ধর্ম। যদিচ, তাহার একজোড়া ভয়ঙ্কর গোঁফ নাই, এই এক অসুবিধা। কিন্তু ভাবিয়া দেখিতে গেলে, গোঁফ ডাকাতের সর্দারের একটা অপরিহার্য্য অঙ্গ নয়। কারণ দারোয়ান ছেদী সিঙের গোঁফ তো আছেই, উপরন্তু গালপাট্টা আছে; কিন্তু তবু তাহাকে কোনও দিন দুষ্টের দমন কিংবা শিষ্টের পালন করিতে দেখা যায় নাই। আসল কথা, আচরণ ডাকাত সর্দারের মত হওয়া চাই, গোঁফ না থাকিলেও আসে যায় না।

কিন্তু সর্দার হইতে হইলে ডাকাতের দল চাই। বায়স্কোপে সর্দারের প্রকাণ্ড দল ছিল, তাহারা হুকুম পাইবামাত্র নানাবিধ অসমসাহসিক কাজ করিয়া ফেলিত, অত্যাচারী জমিদারের বাড়ি লুট করিয়া তাহাকে গাছের ডালে লটকাইয়া দিত। ভল্লুর সেরকম দল কোথায়? অনুগত অনুচরের মধ্যে তিন বছরের অনুজা লিলি, আর একটি নিংলে কুকুরছানা—গামা। অদূর ভবিষ্যতে এই কুকুরশাবকটি মহাশক্তিশালী হইয়া উঠিবে—এই আশায় তাহার উক্তরূপ নামকরণ হইয়াছিল।

ইহারা দুইজনেই ভল্লুর একান্ত অনুগত বটে, কিন্তু আদেশ পাইবামাত্র কোনও অসমসাহসিক কাজ করিবে কি না তাহাতে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। একবার একটা হুলো বিড়ালকে আক্রমণ করিবার জন্য ভল্লু গামাকে বহুপ্রকারে উত্তেজিত করিয়াছিল, কিন্তু গামা সম্মত হয় নাই, বরঞ্চ অত্যন্ত কাতরভাবে পুচ্ছ সঙ্কুচিত করিয়া বিপরীতমুখে প্রস্থান করিয়াছিল। আর লিলি—সে একে মেয়েমানুষ, তায় দৌড়াইতে পারে না; দৌড়াইতে গেলেই পড়িয়া যায়। তাহাকে দিয়া কোনও কাজ হইবে না।

কিন্তু এত বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও ভল্লু ভগ্নোৎসাহ হইল না। অনুচর না থাকে, না থাক্—সে নিঃসঙ্গভাবেই সর্দার বনিবে। যদি তার ডাক শুনিয়া কেহ না আসে সে একলা চলিবে। বায়স্কোপেও তো ডাকাত সর্দার একাকী দুর্গপ্রাকার লঙ্ঘন করিয়া

বন্দিনী তরুণীকে উদ্ধার করিয়াছিল।

সে যা হোক, কিন্তু সর্দার বনিয়া সে কোন্ কোন্ দুষ্টের দমন করিবে? কারণ শিষ্টের পালন পরে করিলও ক্ষতি নাই, কিন্তু দুষ্টের দমন প্রথমেই করা দরকার। সর্বাগ্রে তাহার মাস্টার মহাশয়ের কথা মনে পড়িল। দুষ্ট লোক বলিতে যাহা-কিছু বুঝায়, সব দোষই মাস্টার মহাশয়ের বিদ্যমান। ভোর হইতে না হইতে তিনি আসিয়া হাজির হন। পাঠ্যপুস্তকের প্রতি ভল্লুর অনুরাগ কিছু কম, বিশেষত অংকশাস্ত্রে সে একেবারেই কাঁচা। তাই, পরবর্তী দুই ঘন্টা ধরিয়া যে দারুণ অত্যাচার উৎপীড়ন চলিতে থাকে তাহা বলাই বাহুল্য। এতবড় অত্যাচারীকে শাসন করা ডাকাত সর্দারের প্রথম কর্তব্য।

কিন্তু ভাবিয়া চিন্তিয়া ভল্লু মাস্টার মহাশয়কে পরিত্যাগ করিল। তাঁহার চেহারা এতই নিরেট, দেহের দৈর্ঘ-প্রস্থও এত বিপুল যে, টিনের তরবারি দিয়া তাঁহার মুণ্ড কাটিয়া লওয়া একেবারেই অসম্ভব। তাঁহাকে দাঁড় দিয়া বাঁধিয়া গাছের ডালে ফাঁসি দেওয়াও ভল্লুর সাধ্যাতীত। দুঃখিতভাবে ভল্লু তাঁহাকে অব্যাহতি দিল?

আর শাস্তিযোগ্য কে আছে? ছেদী সিং দারোয়ান? ভল্লু মনে মনে মাথা নাড়িল। ছেদী সিঙের চেহারাটা দুশমনের মত বটে; কিন্তু কেবলমাত্র চেহারা দেখিয়া তাহার বিচার করিলে অন্যায় করা হইবে। সে প্রায়ই পেয়ারা, কুল, কামরাঙা আহরণ করিয়া আনিয়া চুপিচুপি ভল্লুকে খাওয়ায়; মাঝে মাঝে কাঁধে চড়াইয়া বেড়াইতে লইয়া যায়। অধিকন্তু সন্ধ্যার সময় কোলের কাছে বসাইয়া অতি অদ্ভুত রোমাঞ্চকর কাহিনী-কেচ্ছা বলে—শুনিতে শুনিত তন্ময় হইয়া যাইতে হয়। না, ছেদী সিং দারোয়ানকে পাপিষ্ঠ দুষ্কৃতকারীর পর্যায়ে ফেলা যায় না।

তবে—আর কে আছে? বাবা? ভল্লু অনেকক্ষণ গালে হাত দিয়া চিন্তা করিল। অভাবপক্ষে বাবাকে পাপিষ্ঠ বলিয়া ধরা যাইতে পারে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে বাবা লোকটি নেহাৎ মন্দ নয়। মারধোর তিনি একেবারেই করেন না, নিজের লেখাপড়া লইয়াই সর্বদা ব্যাপৃত থাকেন (যদিও অত লেখাপড়া করা পাপিষ্ঠের লক্ষণ কি না তাহাও বিবেচনার বিষয়)। উপরন্তু ভল্লুর মাতার সহিত তাঁহার বিশেষ সদ্ভাব আছে বলিয়া মনে হয়। প্রায়ই তাঁহাদের মধ্যে হাস্য-পরিহাস ও অন্তরঙ্গের মত কথাবার্তা হইয়া থাকে—ভল্লু তাহা লক্ষ্য করিয়াছে। আবার মাঝে মাঝে উভয়ের মধ্যে ঝগড়াও হয়,—তখন ভল্লুর মা চোখে আঁচল দিয়া অস্পষ্ট ভগ্নস্বরে কি বলিতে থাকেন, অধিকাংশ বোঝাই যায় না এবং বাবা মুখ ভারি করিয়া ধীরে ধীরে এমন দু-একটি বাক্যবান প্রয়োগ করেন যে মায়ের কান্না আরও বাড়িয়া যায়। অতঃপর ঝগড়া থামিয়া গেলে বাবা নিভৃতে মাকে অনেক আদর ও খোসামোদ করিতেছেন ইহাও ভল্লুর চক্ষু এড়ায় নাই।

এরূপ ক্ষেত্রে কি করা যায়? ভল্লু বড় দ্বিধায় পড়িল। বাবাকে অন্তরের সহিত বদ্ লোক বলা চলে না, অথচ তাঁহাকে বাদ দিলে আর শাস্তি দিবার লোক কোথায়? তবে কি কেবলমাত্র দুষ্ট লোকের অভাবেই একজন মহাপ্রাণ ডাকাত সর্দারের জীবন ব্যর্থ হইয়া যাইবে? মুণ্ড কাটিয়া ফেলিবার মত লোকই যদি পৃথিবীতে না থাকে তবে ডাকাত হইয়া লাভ কি?

শীতের দ্বিপ্রহরে চিলের কোঠায় একাকী বসিয়া ভল্লু এইরূপ গভীর চিন্তায় মগ্ন

ছিল। এখন সে ধীরে ধীরে উঠিল। এই নৈষ্কর্মের অবস্থা তাহার ভাল লাগিল না। একটা কিছু করিতে হইবে। যদি একান্তই পাষণ্ড লোক না পাওয়া যায়—

ভল্লু দ্বিতলে অবতরণ করিল। কেহ কোথাও নাই—বাড়ি নিস্তব্ধ। মা বোধহয় লিলিকে ঘুম পাড়াইয়া নিজেও একটু শুইয়াছেন। ভল্লু মা'র ঘর অতিক্রম করিয়া চুপিচুপি কাকিমার ঘরে উঁকি মারিল। দেখিল, কাকিমা পালঙ্কের উপর বুকের তলায় বালিশ দিয়া শুইয়া করতলে চিবুক রাখিয়া উদাস-চক্ষে জানালার বাহিরে তাকাইয়া আছেন।

এই ঘরটি কাকিমার শয়নকক্ষ বটে, কিন্তু ব্যাপার-গতিকে ভল্লুরও শয়নকক্ষ হইয়া পড়িয়াছিল। পূর্বে ভল্লু মার কাছে শয়ন করিত, এই ঘরটা ছিল কাকার। মাস দেড়েক পূর্বে কাকার বিবাহ হইল ; তারপর কি একটা গণ্ডগোল হইয়া গেল,—ফলে কাকা নিজের ঘর ছাড়িয়া বাহিরের ঘরে আশ্রয় লইলেন এবং নবপরিণীতা কাকিমা তাঁহার ঘর দখল করিলেন। ভল্লু বোধকরি কাকিমার রক্ষক হিসাবেই তাঁহার শয্যায় শয়ন করিতে লাগিল।

সুতরাং কাকিমার শয়নকক্ষটিকে ভল্লুর শয়নকক্ষ বলা যাইতে পারে। এই ঘরেই তাহার যাবতীয় খেলার উপকরণ ও অস্ত্র শস্ত্র লুক্কায়িত ছিল। ডাকাত সর্দারের প্রধান আয়ুধ—একটি টিনের তরবারি, তাহাও এই ঘরে পালঙ্কের নীচে থাকিত। তরবারিটা বাড়িশুদ্ধ লোকের চক্ষুশূল ; সকলেরই আশঙ্কা, ভল্লু ঐ তরবারি দিয়া কখন কাহার চোখে খোঁচা দিবে। তাই ভল্লু সেটিকে অতি সঙ্গোপনে পালঙ্কের নীচে কম্বল চাপা দিয়া লুকাইয়া রাখিয়াছিল।

ভল্লু কিছুক্ষণ দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর নিঃশব্দে পা টিপিয়া প্রবেশ করিল। কাকিমার মাথার কাপড় খোলা, তাঁহার খোঁপার সোনার শিকলে বাঁধা কাঁটাগুলি ভল্লু দেখিতে পাইল। কিন্তু কাকিমার উদাস দৃষ্টি জানালার বাহিরে প্রসারিত ; কি জানি কি ভাবিতেছেন। তিনি ভল্লুর আগমন জানিতে পারিলেন না।

সাবধানে ভল্লু পালঙ্কের তলায় প্রবেশ করিল, কিন্তু তরবারি কম্বলের ভিতর হইতে বাহির করিতে গিয়া ঠং করিয়া একটু শব্দ হইয়া গেল। কাকিমা চমকিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, 'কে রে। ভল্লু বুঝি? খাটের তলায় কি করছিস?'

ধরা পড়িয়া গিয়া ভল্লু বলিল, 'কিচ্ছু না।' তারপর তরবারি হস্তে খাটের তলা হইতে হামাগুড়ি দিয়া বাহির হইয়া আসিল।

ডাকাত সর্দারকে কাকিমার সম্মুখে হামাগুড়ি দিতে হইল বলিয়া ভল্লু মনে মনে একটু ক্ষুব্ধ হইল, কিন্তু বাহিরে গর্বিত গাম্ভীর্য অবলম্বন করিয়া বীরত্বব্যঞ্জক ভঙ্গীতে দাঁড়াইল।

তারপরই সে স্তম্ভিত হইয়া দেখিল, কাকিমার সুন্দর চোখ দুটিতে জল টল্‌টল্‌ করিতেছে।

কাকিমা চট করিয়া আঁচলে চোখ মুছিয়া ফেলিয়া বলিলেন, 'কি করছিলি?'

'কিচ্ছু না।'—কাকিমার মুখের উপর সুবর্তুল চোখের দৃষ্টি স্থাপন করিয়া বলিল, 'তুমি কাঁদছ কেন?'

কাকিমা লজ্জিতভাবে মুখখানাকে আর একবার আঁচল দিয়া মুছিয়া বলিলেন, 'কই কাঁদছি? তুই সারা দুপুর রোদ্দুরে রোদ্দুরে ঘুরে বেড়াচ্ছিস তো? আয়,

আমার কাছে এসে শো।'

'না।—ভল্লুর কৌতূহল তখনও দূর হয় নাই, সে পুনরায় প্রশ্ন করিল, কাঁদছিলে কেন বল না। ক্ষিদে পেয়েছে বুঝি?'

স্ত্রীজাতি ক্ষুধার উদ্রেক হইলেই কাঁদে—ইহা সে লিলির উদাহরণ দেখিয়া অনুমান করিয়া লইয়াছিল।

'দূর।'

'তবে?'

'কিচ্ছু না। তুই তলোয়ার নিয়ে কোথায় যাচ্ছিস? আয় আমার কাছে।

'না, আমি এখন যাচ্ছি একটা কাজ করতে।'—বলিয়া ভল্লু দ্বারের দিকে পা বাড়াইল।

কাকিমা তাহাকে ডাকিলেন, 'ভল্লু, শুনে যা একটা কথা।'

ভল্লু অনিশ্চিতভাবে ফিরিয়া দাঁড়াইল, 'কি?'

'কাছে আয়।'

ভল্লু সন্দিগ্ধভাবে কাকিমাকে নিরীক্ষণ করিল। তাহাকে ধরিয়া বিছানায় শোয়াইয়া রাখিবার অভিসন্ধি তাঁহার নাই তো? নাঃ, কাকিমা ভাল লোক, তিনি এমন নির্দয় ব্যবহার কখনই করিবেন না।

ভল্লু কাছে আসিয়া অধীরভাবে বলিল, 'কি?'

কাকিমার মুখ একটু লাল হইল; তিনি ভল্লুর হাত ধরিয়া তাহাকে খুব কাছে টানিয়া আনিলেন, তারপর প্রায় তাহার কানে কানে বলিলেন, 'তোর কাকা কোথায় রে?'

ভল্লু তাচ্ছিল্যভরে বলিল, 'জানি না। বোধহয় নীচে আছেন।'

কাকিমা আরও নিম্নস্বরে বলিলেন, 'দেখে এসে আমায় বলতে পারবি? কাউকে কিছু বলিস নি, শুধু দেখে আসবি।'

'আচ্ছা।'···বলিয়া ভল্লু প্রস্থান করিল। এই সামান্য বিষয়ে এত গোপনীয় কি আছে সে বুঝিতে পারিল না।

নীচে নামিয়া ভল্লু বাহিরের দিকে চলিল। বাহিরের একটা ঘরে তক্তপোশের উপর ফরাস পাতা; তাহার উপর চিত হইয়া শুইয়া কাকা বৈরাগ্যপূর্ণ চক্ষে কড়িকাঠের দিকে তাকাইয়া আছেন। ভল্লু দু-একবার ঘরের সম্মুখ দিয়া যাতায়াত করিল, কিন্তু কাকার ধ্যানভঙ্গ হইল না; তখন ভল্লু কাকিমাকে খবরটা দিয়া আসিবে ভাবিতেছে, এমন সময় তাহার কুকুর গামা কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে ঘিরিয়া লাফাইতে লাগিল এবং তরুণ অপরিণত কণ্ঠে ঘেউ ঘেউ করিয়া আনন্দজ্ঞাপন করিতে লাগিল।

গামার বয়ঃক্রম তিন মাস, চেহারা অতিশয় কৃশ ও দুর্বল। সে যে কালক্রমে ভয়ঙ্কর তেজস্বী বিলাতী কুকুর হইয়া দাঁড়াইবে—এই বিষয়ে কেবল ভল্লুর মনে কোনও সংশয় ছিল না। গামার গলায় একটি বক্‌লস কিনিয়া দিবার জন্য সে বাড়ির সকলের কাছে জনে জনে মিনতি করিয়াছিল, কিন্তু কেহই তাহার কথায় কর্ণপাত করে নাই।

চেঁচামেচিতে কাকা বিরক্তিপূর্ণ চোখ কড়িকাঠ হইতে নামাইয়া ভল্লুর দিকে

চাহিলেন। ভল্লু তাড়াতাড়ি গামাকে লইয়া সরিয়া গেল।

গামা দীর্ঘকাল পরে প্রভুর সাক্ষাৎ পাইয়াছে—তাহার ক্ষীণ শরীরে যেন আ আনন্দ ধরে না। সে একবার বাগানের দিকে ছুটিয়া যায়, আবার ফিরিয়া আসিয় ভল্লুর পায়ের-উপর থাবা রাখিয়া সাগ্রহে তাহার মুখের পানে তাকায়, তাহার মনে ভাবটা—চল না, বাগানে যাই। এমন দুপুরবেলা ঘরের মধ্যে বন্ধ থাকতে তোমা ভাল লাগছে? চল চল, বাগানে কেমন ছুটোছুটি করব।

ভল্লু একটু ইতস্তত করিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত গামার আমন্ত্রণ অবহেলা ধরিতে পারিল না। কাকিমাকে কাকার সংবাদ পরে দিলেও চলিবে—এত তাড়াতাড়িই ব কি! বিশেষত কাকা তো কিছুই করিতেছেন না, কেবল চিত হইয়া শুইয়া আছেন এই সংবাদ দু-ঘন্টা পরে দিলেও কোন ক্ষতি হইবে না। ভল্লু গামাকে লইয় বাগানে চলিল।

বাড়ির সংলগ্ন বাগানটা বেশ বিস্তৃত। মাঝে মাঝে আম, লিচু, গোলাপ-জামে গাছ—বাকিটা ফুলের গাছে ভরা। বর্তমানে বিলাতী মরশুমি ফুলের শোভা বাগান আলো হইয়া আছে। কোথাও একরাশ পপি উগ্র রূপের ছটায় মৌমাছিদে আকর্ষণ করিয়া লইয়াছে। ওদিকে সুইট-পী'র ঝাড় পরস্পর জড়াজড়ি করিয় সহস্র ফুলের প্রজাপতি ফুটাইয়া রাখিয়াছে। স্থানে স্থানে দু-একটা চন্দ্রমল্লিকা কোঁকড় মাথা দুলাইয়া নিষ্কলঙ্ক শুভ্র হাসি হাসিতেছে।

কিন্তু উদ্যান শোভার দিকে ভল্লুর দৃষ্টি নাই। তাহার হাতে তরবারি, পশ্চাতে ভক্ত অনুচর। সে খুঁজিতেছে অ্যাডভেঞ্চার, কিন্তু হায়, এই ফুলের মরুভূমিতে অ্যাড্‌ভেঞ্চার কোথায়? সে বিমর্ষভাবে কয়েকটা ডালিয়া ফুলের পাপড়ি ছিঁড়িয় চারিদিকে ছড়াইয়া দিল।

কিন্তু ঐকান্তিক ইচ্ছা থাকিলে জগতে কোনও জিনিসই দুষ্প্রাপ্য হয় না, শত্রুও অচিরাৎ আসিয়া দেখা দেয়। অবশ্য কল্পনার জোর থাকা চাই। ভল্লু শত্রুর অন্বেষণে ঘুরিতে ঘুরিতে হঠাৎ একটি চন্দ্রমল্লিকা গাছের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। গাঢ় লাল রঙের চন্দ্রমল্লিকা—একটি কঞ্চির ঠেকনোতে ভর দিয়া সগর্বে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। ভল্লু কল্পনার চক্ষে দেখিতে পাইল—এ চন্দ্রমল্লিকা নয় মহাপাপিষ্ঠ জমিদার। ইহার অত্যাচারে বাগানের অন্য সমস্ত ফুল ভয়ে জড়সড় হইয়া আছে; উহার রক্তচক্ষুর সম্মুখে অদূরে ঐ ভূলুণ্ঠিতা পরটুলাক্কার ফুলটি বন্দিনী তরুণীর মত ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িয়াছে।

উত্তেজনায় ভল্লুর চোখ জ্বলজ্বল করিয়া জ্বলিতে লাগিল। সে পাঁয়তারা করিয়া একবার শত্রুর চারিদিকে প্রদক্ষিণ করিল, তারপর আস্ফালন করিয়া কঠোর স্বরে কহিল, 'ওড়ে নড়াধম'—

উত্তেজিত হইলে ভল্লুর উচ্চারণ কিছু বিকৃত হইয়া পড়িত।

নরাধম কোনও জবাব দিল না, কেবল আরক্ত চক্ষে চাহিয়া রহিল। গামা উৎসাহিতভাবে বলিল, 'ভুক্ ভুক্—'

ভল্লু পদদাপ করিয়া বলিল, 'ওড়ে নড়াধম, তুই জানিস আমি কে? আমি ভল্লু সর্দার—তোর যম।'

এতবড় দুঃসংবাদেও নরাধম বিন্দুমাত্র বিচলিত হইল না। ভল্লু তখন গর্জন

করিয়া বলিল—'পাজি উল্লুক গাধা, এই তোর মুণ্ডু কেটে ফেললুম।' বলিয়া সবেগে তরবারি চালাইল।

দুর্বিনীত নরাধমের মুণ্ডু কাটিয়া মাটিতে পড়িল।

'ভল্লু।'

হঠাৎ পিছন হইতে গুরু-গম্ভীর আহ্বান শুনিয়া ভল্লুর ক্ষাত্র-তেজের উত্তাপ এক মুহূর্তে নির্বাপিত হইল; সে সভয়ে ঘাড় বাঁকাইয়া দেখিল—কাকা। কাকার বৈরাগ্যপূর্ণ ললাটে বৈশাখীর মেঘের মত ভ্রূকুটি। তিনি ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া আসিতেছেন।

গামা কাকার আগমনের সাড়া পাইয়া কাপুরুষের মত আগেই সরিয়াছে। উপায় থাকিলে ভল্লুও সরিত, কিন্তু কাকা এত কাছে আসিয়া পড়িয়াছেন যে, পলায়নের চেষ্টা বৃথা। কালবৈশাখীর ঝড়টা তাহার মাথার উপর দিয়াই যাইবে।

কাকা আসিয়া উপস্থিত হইলেন; ভল্লুর শ্রবণেন্দ্রিয় ধারণ করিয়া বলিলেন, 'এ কি করেছিস?'

ভল্লু বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিল না। বাগানের ফুল ছেঁড়া বারণ—এ কথা সে বরাবরই জানে এবং সাধ্যমত এ নিষেধ মান্য করিয়া আসিয়াছে। তবে যে আজ কোন্ দুরন্ত কর্তব্যের তাড়নায় ঐ ফুলটাকে বৃন্তচ্যুত করিয়াছে, তাহা কাকাকে কি করিয়া বুঝাইবে? ফুলটা যে ফুল নয়—একটা মহাপাপিষ্ঠ নরাধম, এ কথা কাকা বুঝিবেন কি? সকলের কল্পনাশক্তি সমান নয়, ভল্লু জানিত, কাকা বুঝিবেন না। অরসিকেষু রহস্য নিবেদনং—তার চেয়ে নীরব থাকাই শ্রেয়। ভল্লু নীরব রহিল।

কাকা ভল্লুর হাত হইতে তরবারি কাড়িয়া লইয়া দূরে নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, 'কেন ফুল ছিঁড়লি?'

ভল্লু এবারেও জবাব দিল না। কাকা তখন তাহার কান ছাড়িয়া চুলের মুঠি ধরিলেন, সজোরে নাড়া দিয়া বলিলেন, 'পাজি উল্লুক গাধা, কতবার তোকে মানা করেছি বাগানের ফুলে হাত দিসনি। কেন ছিড়লি, বল্।'

বার বার একই প্রশ্নে ভল্লু উত্যক্ত হইয়া উঠিল। তার উপর চুলের যন্ত্রণা। কাকার বজ্রমুষ্ঠি ক্রমে ক্রমে যেরূপ দৃঢ়তর হইতেছে, হয়তো শেষ পর্যন্ত চুলগুলো তাঁহার মুঠিতেই থাকিয়া যাইবে। অথচ ভাব-গতিক দেখিয়া মনে হইতেছে, একটা কোনও উত্তর না পাইলে কাকা শান্ত হইবে না; যন্ত্রণা ও উগ্র প্রয়োজনের তাড়ায় ভল্লুর মাথায় এক বুদ্ধি গজাইল। সে সজল চক্ষে চিঁ চিঁ করিয়া বলিল, 'কাকিমার জন্যে ফুল তুলেছি।'

ইন্দ্রজালের মত কাজ হইল। সচকিতভাবে কাকা চুল ছাড়িয়া দিলেন, হতবুদ্ধির মত বলিলেন, কি বললি?'

এতটা ভল্লুও প্রত্যাশা করে নাই; কিন্তু যে পথে সুফল পাওয়া গিয়াছে সেই পথে চলাই ভাল। সে আবার বলিল, 'কাকিমার জন্যে ফুল তুলেছি।'—বলিয়া ভূপতিত ফুলটা সযত্নে তুলিয়া লইল; তারপর আবার আরম্ভ করিল, 'কাকিমা বললেন—'

'কি বললেন?'

খুল্লতাতের জেরায় পড়িবার ইচ্ছা ভল্লুর আদৌ ছিল না, বিশেষত মোকাবিলায়

মিথ্যা ধরা পড়িবার সম্ভাবনা যখন সম্পূর্ণ বিদ্যমান। বয়ঃপ্রাপ্ত লোকদের একটা মহৎ দোষ, তাহারা প্রত্যেকটি কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য না পাইলে চটিয়া যায়; কল্পনা বলিয়া যে ঐশী শক্তি মাথার মধ্যে নিহিত আছে তাহার সদ্ব্যবহার করিতে চায় না। ভল্লু কাকার প্রশ্নটা এড়াইয়া গিয়া বলিল, 'কাকিমা বড্ড ফুল ভালবাসেন; রোজ খোঁপায় তিনটে-পাঁচটা ফুল পরেন—'

খুল্লতাত অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। আর বিলম্ব করা অনুচিত বুঝিয়া ভল্লু প্রস্থানোদ্যত হইল।

কাকা ডাকিলেন, 'ভল্লু, শোন্।'

ভল্লু খানিক দূরে গিয়াছিল, সেখান হইতে ঘাড় বাঁকাইয়া বলিল, 'আর কাকিমা তোমায় ডাকছিলেন—তুমি কোথায় আছ দেখতে বললেন।' বলিয়া ক্ষুদ্র পদযুগল সবেগে চালিত করিয়া দিল।

* * * *

বাগানের নৈঋত কোণে একটি বড় আমগাছের নিম্নতম শাখায় ভল্লুর স্থায়ী আড্ডা ছিল। স্থূল শাখাটি ভূমির সমান্তরালে কাণ্ড হইতে বাহির হইয়া গিয়াছিল; তাহার ডগার দিকে বসিয়া দোল দিলে শাখাটি মন্দ মন্দ দুলিত।

এই শাখায় ঘনপল্লবিত ডগায় বসিয়া একটা বড় রকম দোল দিয়া বিক্ষুব্ধচিত্ত ভল্লু ভাবিতে আরম্ভ করিল। গামা এতক্ষণ নিরুদ্দেশ ছিল; এখন যেন কিছুই হয় নাই এমনই ভাবে ল্যাজ নাড়িতে নাড়িতে গাছের তলায় আসিয়া বসিল। ভল্লু একবার ভর্ৎসনাপূর্ণ চক্ষে তাহার পানে তাকাইল। অনুচরের ভীরুতা তাহার মর্মে দারুণ আঘাত করিয়াছিল।

তারপর পুনরায় সে ভাবিতে আরম্ভ করিল।

প্রদীপের নীচেই অন্ধকার। দুষ্টের দমনব্রত গ্রহণ করিয়া ভল্লু চারিদিকে দুষ্ট অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছে—অথচ দুষ্ট, অত্যাচারী, দুর্বৃত্ত বলিতে যাহা কিছু বুঝায় তাহার মূর্তিমান বিগ্রহ ভল্লুর সম্মুখেই হাজির রহিয়াছে। এতক্ষণ এটা সে দেখিতে পায় নাই কেন? কাকার মত মহাপাপিষ্ঠ নরাধম পৃথিবী খুঁজিয়া আর কোথায় পাওয়া যাইবে?

শুধু আজিকার এই ঘটনার জন্য নয়, কাকা যে একজন অবিমিশ্র পাষণ্ড, ইহা তাহার অনেকদিন আগেই জানা উচিত ছিল। প্রথমত তিনি ডাক্তার—ডাক্তারেরা যে জাতিবর্ণনির্বিশেষে বদ লোক, এ কথা শিশুসমাজে কে না জানে? লিলি পর্যন্ত জানে। ভল্লুর সামান্য একটু পেটের অসুখ হইতে না হইতে কাকা তাহার সমস্ত প্রিয় খাদ্য বন্ধ করিয়া এমন সব কটু তিক্ত কষা ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা করেন যে, সে কথা স্মরণ করিলেই অন্নপ্রাসনের অন্ন ঊর্ধ্বগামী হয়। তাহার উপর তিনি একজন কঠোর ব্রহ্মচারী, মাথায় একটি ক্ষুদ্র টিকি আছে। ভোর পাঁচটা বাজিতে না বাজিতে তিনি শয্যাত্যাগ করিয়া স্নান করেন; তারপর ঠাকুরঘরে ঢুকিয়া এমন ঘোর রবে কাঁসর-ঘণ্টা বাজাইতে আরম্ভ করেন যে, পাড়ার ত্রিসীমানার মধ্যে আর কাহারও ঘুমাইবার উপায় থাকে না।

শুধু ইহাই নয়, নব-পরিণীতা কাকিমার সঙ্গে তাঁহার দুর্ব্যবহার স্মরণ করিলেও তাঁহার নৈতিক দুর্গতি সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে না। বিবাহের পূর্বে বাড়িসুদ্ধ লোকের

সহিত কাকার কথা-কাটাকাটি বকাবকি চলিয়াছিল—এ কথা ভল্লুর বেশ মনে আছে। যা হোক, শেষ পর্যন্ত কাকা হাড়ির মত মুখ করিয়া বিবাহ করিতে গেলেন। কিন্তু বিবাহ করিয়া আসিয়া তিনি অন্দরমহলের সংস্রব একেবারে ত্যাগ করিয়াছেন। এই লইয়া বাড়িতে অশান্তির শেষ নাই; ভল্লুর মার সহিত কাকার প্রায়ই বাগবিতণ্ডা হয়। কাকা বায়স্কোপের দুষ্ট জমিদারের মত তির্যক হাসি হাসিয়া বলেন, 'আমি তো আগেই ব'লে দিয়েছিলুম।'

অথচ কাকিমা অতিশয় ভাল লোক; এতদিন তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়া ভল্লুর তাহা বুঝিতে বাকি নাই। লজেঞ্চুস্ কিনিবার জন্য পয়সার প্রয়োজন হইলে তিনি চুপিচুপি তাহাকে পয়সা দেন; এমন কি, চোরাই মাল তাহার কাছে গচ্ছিত রাখিলে তিনি কাহাকেও বলিয়া দেন না। একবার কতকগুলি ডাঁসা কুল ও খানিকটা কাসুন্দি চুরি করিয়া ভল্লু কাকিমার জিম্মায় রাখিয়াছিল, তিনি সমস্ত কুল ও কাসুন্দি যথাসময়ে তাহাকে প্রত্যর্পণ করিয়াছিলেন, একটি কুল বা একবিন্দু কাসুন্দিও আত্মসাৎ করেন নাই। এরূপ গুণবতী নারী আজকালকার দিনে কোথাও পাওয়া যায়? অন্তত ভল্লুর জানাশোনার মধ্যে এমন আর দ্বিতীয় নাই।

এ হেন কাকিমাকে কাকা অবহেলা করেন। শুধু অবহেলা করিলে ক্ষতি ছিল না, পরন্তু তিনি যে কাকিমার উপর অন্যায় উৎপীড়ন করিয়া থাকেন তাহাও সহজে অনুসন্ধান করা যায়। পূর্বে দু-একবার কাকিমাকে বালিশে মুখ গুঁজিয়া ফুঁপাইতে শুনিয়া ভল্লুর ঘুম ভাঙিয়া গিয়াছে। আজ সে কাকিমার চক্ষে জল দেখিয়াছে। এসব কি মিছামিছি? ভল্লুর দৃঢ় ধারণা জন্মিল, কাকা সুবিধা পাইলেই আসিয়া কাকিমার কান মলিয়া চুল ধরিয়া ঝাঁকানি দিয়া যান। নচেৎ কাকিমা অকারণ কাঁদিবেন কেন?

যেদিক দিয়াই দেখা যাক, কাকার মত দুর্নীতিপরায়ণ দমনযোগ্য ব্যক্তি আর নাই।

কিন্তু দমন করিবার উপায় কি? দড়ি দিয়া বাঁধিয়া গাছে ঝুলাইয়া দেওয়া বা তরবারি দিয়া মুণ্ডচ্ছেদ সম্ভব নয়। সে চেষ্টা করিতে গেলে ভল্লুর জীবনের সুখ-শান্তি চিরতরে নষ্ট হইয়া যাইবে। ক্রুদ্ধ কাকা হয়তো ভল্লুকে চিরজীবন ধরিয়া ভাতডালের পরিবর্তে গাঁদালের ঝোল ও বোতলের সুতিক্ত ঔষধ খাওয়াইবার ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। সুতরাং তাহাতে কাজ নাই।

ভল্লু দীর্ঘকাল বদনমণ্ডল কুঞ্চিত করিয়া চিন্তা করিল, কিন্তু কাকাকে জব্দ করিবার কোনও সহজ পন্থাই আবিষ্কৃত হইল না। তখন সে শাখা হইতে নামিয়া চিন্তাকুল চিত্তে ধীরে ধীরে বাড়ির দিকে চলিল। গামা এতক্ষণ বৃক্ষতলে লম্বমান হইয়া নিদ্রাসুখ উপভোগ করিতেছিল, এখন উঠিয়া ডন ফেলার ভঙ্গিতে আলস্য ভাঙিয়া প্রভুর অনুগামী হইল।

চন্দ্রমল্লিকা ফুলটি এতক্ষণ ভল্লুর হাতেই ছিল, অন্যমনস্কভাবে সে তাহার গোটা কয়েক পাপড়ি ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছিল; তবু ফুলের সৌষ্ঠব একেবারে নষ্ট হয় নাই। বাড়িতে পৌঁছিয়া ভল্লু কিছুক্ষণ বিরাগপূর্ণ নেত্রে তাহার দিকে তাকাইয়া রহিল, তারপর অনিচ্ছাভরে উপরে কাকিমার ঘরের উদ্দেশ্যে চলিল।

বাড়ি তখনও নিঃশব্দ—বিশ্রামকারীরা বিশ্রাম করিতেছে। কাকিমার দরজার

নিকট পর্যন্ত পেঁছিয়া ভল্লু থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। কাকার কণ্ঠস্বর। কাকা চাপা অথচ উদাস স্বরে কথা কহিতেছেন। ভল্লু দরজার বাহিরে দেয়ালের সঙ্গে একেবারে সাঁটিয়া গিয়া শুনিতে লাগিল। কাকা বলিতেছেন, 'সংসারে আমার রুচি নেই। আমি একলা থাকতে চাই—ছেলেবেলা থেকেই আমার প্রতিজ্ঞা স্ত্রীলোকের সংসর্গে আসব না। কারণ, দেখেছি, যারা স্ত্রীর প্রলোভনে প'ড়ে সংসারে জড়িয়ে পড়েছে, তাদের দ্বারা আর কোনও বড় কাজ হয় না।'

কাকা নীরব হইলেন; কিছুক্ষণ পরে কাকিমার অশ্রুরুদ্ধ অস্পষ্ট কণ্ঠ শুনা গেল, 'তবে বিয়ে করেছিলে কেন?'

'দাদা আর বউদিদির কথা এড়াতে পারলাম না, তাই বিয়ে করতে হয়েছে। তাঁদের সঙ্গে এই শর্ত হয়েছিল যে, বিয়ে করেই আমি খালাস, তারপর আমার আর কোনও দায়িত্ব থাকিবে না। কিন্তু এখন দেখছি, তাঁরা আমায় ঠকিয়েছেন, শর্তের কথা তাঁদের মনে নেই। কিন্তু সে যাক, একটা কথা তোমায় ব'লে দিই, মনে রেখো—আমার কাছে তোমার কোনদিন কিছুর প্রয়োজন হবে না, সুতরাং আমাকে ডাকাডাকি ক'রে মিছে উত্যক্ত ক'রো না।'

'আমি তো তোমাকে ডাকিনি।'

ভল্লু দেখিল, তাহার স্থান-ত্যাগ করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। সে ধীরে ধীরে অপসৃত হইয়া নীচে চলিল। তাহার সামান্য একটা কথার সূত্র ধরিয়া কাকা কাকিমাকে তিরস্কার করিতেছেন, এখনই হয়তো সাক্ষী দিবার জন্য তাহার তলব পড়িবে। কাকার মত দুর্জনের নিকট হইতে দূরে থাকাই নিরাপদ।

সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতে ভল্লু শুনিতে পাইল, তাহার মা নিজের ঘর হইতে বাহির হইয়া কাকাকে উদ্দেশ্য করিয়া বিস্ময়োৎফুল্ল স্বরে বলিতেছেন,—'ওমা—একি! সন্ন্যিসি ঠাকুর একেবারে বউয়ের ঘরে ঢুকে পড়েছে যে!'

নীচে নামিয়া ভল্লু দেখিল, বাড়ির ঝি বামা ভীষণ চেঁচামেচি শুরু করিয়া দিয়াছে ও একগোছা ঝাঁটা লইয়া গামাকে চারিদিকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। তাহার কথা হইতে ভল্লু বুঝিল যে, বামা ভাঁড়ার-ঘরের দাওয়ায় রৌদ্রে শুইয়া হাঁ করিয়া ঘুমাইতেছিল, গামা গিয়া সস্নেহে তাহার মুখগহ্বরের অভ্যন্তরে জিহ্বা প্রবিষ্ট করাইয়া তাহার আলজিভ চাটিয়া লইয়াছে; বামা গামার উদ্দেশে যে সব বিশেষণ নিক্ষেপ করিতেছে, তাহা শুনিলে কুকুরেরও কর্ণেন্দ্রিয় লাল হইয়া উঠে।

ভল্লু নিঃশব্দে গামাকে খুঁজিতে আরম্ভ করিল। বামার আলজিভ চাটিয়া লওয়া যে গামার অন্যায় হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তবু সব দোষ কি গামার? বামা হাঁ করিয়া ঘুমায় কেন? আর গামার গলায় একটা বগলস্ থাকিলে তো এমন ব্যাপার ঘটিতে পারিত না, গামাকে তখন স্বচ্ছন্দে বাঁধিয়া রাখা চলিত। দোষ গামার নয়—দোষ বাড়ির লোকের। তাহারা একটা বগলস্ কিনিয়া দেয় নাই কেন?

খুঁজিতে খুঁজিতে বাহিরের ঘরে কাকার তক্তপোষের তলায় ভল্লু গামাকে আবিষ্কার করিল। গামা নিদ্রার ভান করিয়া এক চক্ষু ঈষৎ খুলিয়া মিটিমিটি চাহিতেছিল, ভল্লুকে দেখিয়া বাহির হইয়া আসিল।

ভল্লু গামার কান মলিয়া দিয়া চাপা তর্জনে বলিল, 'পাজি কোথাকার! বামার মুখ এঁটো ক'রে দিয়েছিস কেন?'

গামা বিনীতভাবে ল্যাজ নাড়িয়া অপরাধ স্বীকার করিল।

ভল্লু বলিল, 'মজা দেখাচ্ছি দাঁড়াও, এবার থেকে তোমায় বেঁধে রাখব।'

গামা পুচ্ছস্পন্দনে কাতরতা জ্ঞাপন করিল।

ভল্লু কিন্তু শাসনে কঠোর। খানিকটা ছেঁড়া কাপড়ের পাড় সে অন্য প্রয়োজনে সংগ্রহ করিয়াছিল, এখন তাহা পকেট হইতে বাহির করিল। সেটা আমার গলায় বাঁধিতে যাইবে, এমন সময় হঠাৎ কাকার শয্যার উপর বালিশের পাশে একটা জিনিস দেখিয়া তাহার চক্ষু পলকহীন হইয়া গেল। কাকার হাতঘড়িটা রহিয়াছে, ঘড়িতে চামড়ার বগলস্ সংলগ্ন। ব্যাণ্ডসুদ্ধ রিস্ট-ওয়াচ সে পূর্বে কখনও দেখে নাই এমন নয়, বহুবার দেখিয়াছে; কিন্তু এখন তাহার মুগ্ধ নেত্র ঐ জিনিসটার উপর নিশ্চল হইয়া রহিল।

এক-পা এক-পা করিয়া অগ্রসর হইয়া সন্তর্পণে ভল্লু সোনার ঘড়িটি হাতে তুলিয়া লইল; তারপর ঘড়ি হইতে বগলস্ পৃথক করিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু কৃতকার্য হইল না। তখন ভল্লু একবার দরজার দিকে তাকাইয়া ঘড়িসুদ্ধ বগলস্ গামার গলায় পরাইয়া দিল। দিব্যি মানাইয়াছে। ঘড়িটি গামার লোমে ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে—দেখা যায় না। ভল্লু আগ্রহ-কম্পিত হস্তে কাপড়ের পাড় বগলসে বাঁধিয়া অনিচ্ছুক গামাকে টানিতে টানিতে বাহির হইয়া পড়িল।

কাকা তখনও ফিরেন নাই, বোধহয় মার সহিত তর্ক করিতেছেন। এই অবসরে ভল্লু বাগান অতিক্রম করিয়া একেবারে রাস্তায় গিয়া পড়িল।

* * *

ভল্লু যখন বেড়াইয়া বাড়ি ফিরিল, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। ভ্রমণের ফলে বিলক্ষণ ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছিল; ভল্লু গামাকে একটি নিভৃত স্থানে বাঁধিয়া রাখিয়া বাড়ির ভিতর প্রবেশ করিল।

বাড়িতে ঢুকিতেই মাংস রান্নার সুগন্ধ তাহার নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিল। সে সটান রান্নাঘরে গিয়া বলিল, 'মা ক্ষিদে পেয়েছে।'—বলিয়া একটা পিঁড়ি পাতিয়া বসিয়া গেল। মা মাংস ও রুটি তাহার সম্মুখে ধরিয়া দিলেন।

নিবিষ্ট মনে আহার করিতে করিতে ভল্লু শুনিতে পাইল, বাড়িতে একটা কিছু গণ্ডগোল চলিতেছে। সে উৎকর্ণ হইয়া শুনিল। কাকা চাকরদের ধমকাইতেছেন; একবার 'সোনার ঘড়ি' কথাটা শুনা গেল; ভল্লুর বুকের ভিতর ছ্যাৎ করিয়া উঠিল।

তারপরেই বামা ঝি রান্নাঘরের দ্বারের কাছে আসিয়া উপুড় হইয়া বসিল, ভারি গলায় বলিল, 'এ ঐ দারোয়ান ড্যাকরার কাজ, ব'লে দিলুম বড়মা, দেখে নিও। ও ছাড়া এত বুকের পাটা আর কারুর নয়।—কি অনাসৃষ্টি কাণ্ড মা, ছোট দাদাবাবুর বিছানার ওপর থেকে সোনার ঘড়ি চুরি! আমি তো বারবাড়ি মাড়াইনে সবাই জানে। রান্নাঘর মুক্ত ক'রে, বাসন মেজে, কাপড় কেচে, উঠোন ঝাঁট দিতেই বেলা কেটে যায়—তা বাইরে যাব কখন? আর এই এগারো বছর এ বাড়িতে আছি, একটা কুটো হারিয়েছে কেউ বলতে পারে না।—এ ঐ ঝ্যাঁটাখেগো দরোয়ানের কাজ; মিনসের মরণ-পালক উঠেছে কিনা, তাই মালিকের সোনার ঘড়িতে হাত দিতে গেছে।

দারোয়ানের সঙ্গে বামার চিরশত্রুতা।

মা রান্না করিতেছিলেন, বামার সাফাই শুনিতে পাইলেও উত্তর দিলেন না।

ভল্লুরও মুখ দেখিয়া মনের অবস্থা বুঝা গেল না। কিন্তু তাহার গলায় মাংসের টুকরো আটকাইয়া যাইতে লাগিল। সে অতি কষ্টে আর কিছু খাদ্য গলাধঃকরণ করিয়া উঠিয়া পড়িল, পাতের ভুক্তাবশিষ্ট মাংস ও হাড় বাটিতে লইয়া ধীরে সুস্থে রান্নাঘর ত্যাগ করিল। প্রত্যহ দুইবেলা নিজের উচ্ছিষ্ট প্রসাদ সে স্বহস্তে গামাকে খাওয়াইত।

গামাকে খাওয়াইতে খাওয়াইতে ভল্লু শুনিল, কাকার কণ্ঠস্বর ও মেজাজ উত্তরোত্তর চড়িতেছে,—তিনি পুলিসে খবর দিবেন বলিয়া চাকরদের ভয় দেখাই-তেছেন। বাবাও সেই সঙ্গে যোগ দিয়াছেন। চাকরেরা ভয়ে আড়ষ্ট ও নির্বাক হইয়া আছে। ব্যাপার অতিশয় গুরুতর হইয়াছে।

ভল্লু কর্তব্য স্থির করিয়া ফেলিল। গামার আহার শেষ হইলে সে তাহাকে লইয়া গুটি গুটি কাকার ঘরের দিকে অগ্রসর হইল। ওদিকের বারান্দায় চেঁচামেচি চলিতেছে, এদিকে কেহ নাই। ভল্লু এপাশ ওপাশ চাহিয়া কাকার ঘরে ঢুকিয়া পড়িল। ঘরটি অন্ধকার; ভল্লু অন্ধকারে লুকাইয়া তাড়াতাড়ি গামার গলা হইতে ঘড়ি ও বগলস্ খুলিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিল; কিন্তু বগলস্ গামার গলায় আঁটিয়া বসিয়া গিয়াছে—বোধ করি, গামা মাংস খাইয়া মোটা হইয়াছে। ভল্লু অনেক চেষ্টা করিয়াও বগলস্ খুলিতে পারিল না, যতই তাড়াতাড়ি খুলিবার চেষ্টা করে, ততই হাত জড়াইয়া যায়। এদিকে সময় অতিশয় সংক্ষিপ্ত—এখনই হয়তো কেহ ঘরে আসিয়া ঢুকিবে।

ত্রস্ত ভল্লু কি করিবে ভাবিতেছে, এমন সময় অতি সন্নিকটে কাকার গলা শুনিয়া সে চমকিয়া উঠিল। সর্বনাশ! মুহূর্ত মধ্যে সে গামাকে তুলিয়া কাকার বিছানায় লেপের তলায় চাপা দিল, তারপর ঘরের সবচেয়ে অধন্কার কোণে গিয়া দাঁড়াইল।

কিছুক্ষণ রুদ্ধশ্বাসে কাটিয়া গেল। কাকা কিন্তু ঘরে প্রবেশ করিলেন না, বকিতে বকিতে অন্যদিকে চলিয়া গেলেন।

এইবার ভল্লুর সমস্ত সাহস হঠাৎ তাহাকে ত্যাগ করিল। তাহার যেন দম বন্ধ হইয়া আসিতে লাগিল। তস্করবৃত্তি আপাত-লোভনীয় বটে, কিন্তু চিত্তের শান্তি-বিধায়ক নয়। কাকার কণ্ঠস্বর দূরে চলিয়া গেলে ভল্লু ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িল। আর কোনদিকে দৃকপাত না করিয়া একেবারে দ্বিতলে নিজের শয়নকক্ষে গিয়া উপস্থিত হইল। কাকীমা ঘরে ছিলেন, তাহাকে জুতা-মোজা ও গরম জামা খুলিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আজ পড়তে বসিল না ভল্লু, এখনি শুতে এলি যে?'

'বড্ড ঘুম পাচ্ছে।'—বলিয়া ভল্লু লেপের ভিতর ঢুকিয়া পড়িল।

ওদিকে গামাও নরম বিছানায় লেপের মধ্যে শয়নের ব্যবস্থা দেখিয়া নিঃশব্দে পরম পরিতৃপ্তির সহিত কুণ্ডলী পাকাইয়া নিদ্রার আয়োজন করিল।

*   *   *   *

ভল্লু ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। প্রায় দু-তিন ঘন্টা ঘুমাইবার পর হঠাৎ একটা বিরাট গর্জন শুনিয়া তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। কাকীমাও ইতিমধ্যে খাওয়া-দাওয়া শেষ করিয়া তাহার পাশে আসিয়া শুইয়াছিলেন—তিনিও চমকিয়া উঠিলেন।

ঘরে আলো জ্বলিতেছিল; ভল্লু চোখ মেলিয়া দেখিল, কাকার রুদ্রমূর্তি ঠিক

খাটের পাশেই দাঁড়াইয়া আছে—হাতে একটা মোটা লাঠি। ভল্লু প্রথমটা কিছু বুঝিতে পারিল না, তারপর তাহার সব কথা মনে পড়িয়া গেল।

কাকা দন্ত ঘর্ষণ করিয়া বলিলেন, 'ভুলো, বেরিয়ে আয় শিগ্‌গির লেপ থেকে। 'আজ তোকে—'

ভল্লুর মুণ্ড এতক্ষণ লেপের বাহিরে ছিল, এখন তাহা ভিতরে অদৃশ্য হইয়া গেল। সে কাকিমার বুকের কাছে ঘেঁষিয়া শুইল।

রাত্রি তখন মাত্র দশটা। ভল্লুর মা বাবা শয়ন করিতে গেলেও নিদ্রা যান নাই; তাঁহারা চেঁচামেচি শুনিয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিলেন। মা ঘরে ঢুকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি হয়েছে ঠাকুরপো?'

'হয়েছে আমার মাথা! ভুলো, বেরিয়ে আয় বলছি—'

মা শঙ্কিত হইয়া বলিলেন, 'কি করেছে ভল্লু?'

কাকা ক্রোধে হস্তদ্বয় আস্ফালন করিয়া বলিলেন, 'কি করেছে? ওর ঐ হতভাগা কুকুরটাকে আমার বিছানায় শুইয়ে রেখেছিল; শুতে গিয়ে দেখি লক্ষ্মীছাড়া পেটরোগা কুকুর লেপ-বিছানায় সর্বনাশ ক'রে রেখেছে। বমি ক'রে সব ভাসিয়ে দিয়েছে।'

শুনিয়া ভল্লুর মাথার চুল পর্যন্ত কণ্টকিত হইয়া উঠিল। সে কাকিমার বুকের মধ্যে মাথা গুঁজিয়া একেবারে নিস্পন্দ হইয়া রহিল। কাকিমার শরীরটা এইসময় একবার সজোরে নড়িয়া উঠিল, যেন তিনি হাসি চাপিবার চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু এরকম ভয়ঙ্কর ব্যাপারে হাসিবার কি আছে তাহা ভল্লু ভাবিয়া পাইল না। গুরুভোজনের ফলে গামা যে এমন বিদ্‌ঘুটে কাণ্ড করিয়া বসিবে তাহা ভল্লু দুঃস্বপ্নেও কল্পনা করে নাই।

কাকা পূর্ববৎ বলিতে লাগিলেন, 'শুধু কি তাই! কুকুরটাকে ঘাড় ধ'রে তুলতে গিয়ে দেখি, তিনি আমার রিস্ট-ওয়াচ গলায় প'রে ব'সে আছেন।'

ঘরের বাহিরে বাবা হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন; মার কলকণ্ঠ সেই সঙ্গে যোগ দিল। লেপের মধ্যে কাকীমার সর্বশরীর চাপা হাসির আবেগে ফুলিয়া ফুলিয়া দুলিয়া দুলিয়া উঠিতে লাগিল।

কাকা বলিলেন, 'তোমাদের হাসি পাচ্ছে? ঐ ঘড়ির জন্যে চাকরগুলোকে শুধু মারতে বাকি রেখেছি। ভাগ্যে পুলিসে খবর দেওয়া হয়নি, নয় তো কেলেঙ্কারির একশেষ হ'ত; পুলিস এসে দেখত, কুকুরের গলায় ঘড়ি বাঁধা রয়েছে।—না, এসব হাসির কথা নয়; ভুলোর বজ্জাতি বন্ধ করা দরকার।'

মা হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'তা বেশ তো, কাল সকালে ওকে শাসন ক'রো।'

কাকা বলিলেন, 'না বউদি, সে হবে না। তুমি ওকে এখনি লেপের ভেতর থেকে বার ক'রে আন।'

মা মুখে আঁচল দিলেন, তারপর বলিলেন, 'কেন, তুমিই আন না।'

'না না, তুমি ওকে বিছানা থেকে বার ক'রে আন, তারপর আমি—'

'কেন বল তো? বিছানা ছুঁলে কি তোমার জাত যাবে?'

'না না মানে—। আচ্ছা বেশ, কাল সকালেই হবে,' দ্বারের দিকে এক পা বাড়াইয়া কাকা দাঁড়াইলেন—'কিন্তু আমার বিছানা! আমি আজ শোব কোথায়?'

মা জিজ্ঞাসা করলেন, 'বিছানা কি একেবারে গেছে?'

'শুধু বিছানা। সে ঘরে ঢোকে কার সাধ্য?'

মা হাসিভরা মুখ গম্ভীর করিবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন, 'তাই তো বাড়িতে তো আর লেপও নেই। তা হ'লে তোমাকে এই ঘরেই শুতে হয়।'

কাকা বলিলেন, 'এত রাত্রে ঠাট্টা ভাল লাগে না বউদি। একটা লেপ বার ক'রে দাও, বৈঠকখানায় ফরাসের ওপরেই শুয়ে থাকব।'

'আর তো লেপ নেই।'

'নেই!'

'একখানা বাড়তি ছিল, সেটা তুমি গায়ে দিচ্ছিলে। আর কোথায় পাব?'

কাকা রাগিয়া বলিলেন, 'এ তোমার দুষ্টুমি—আসল কথা দেবে না! উঃ, এই মেয়েমানুষ জাতটা! বেশ, র‍্যাপার গায়ে দিয়ে শোব! বলিয়া তিনি প্রস্থানোদ্যত হইলেন।

মা তাহার হাত ধরিয়া ফেলিয়া বলিলেন, 'ছি, ঠাকুরপো, ছেলেমানুষি ক'রো না, আজ এই ঘরেই শোও। এই শীতে কেবল র‍্যাপার গায়ে দিয়ে শুলে অসুখে পড়বে যে।'

'তা হোক—হাত ছাড়।'

'লক্ষ্মী ভাই আমার, আজ রাতটা শোও—আমি ভল্লুকে আমার বিছানায় নিয়ে যাচ্ছি।'

'—না!'

'তুমি সব বিষয়ে এত বুদ্ধিমান বিচক্ষণ, আর এই সামান্য বিষয়ে এত অবুঝ হচ্ছ। ধর্ম-কর্মে তোমার এত নিষ্ঠা, আর যাকে মন্ত্র পড়ে বিয়ে করেছ তাকে হেনস্থা করলে পাপ হয়, এটা বুঝতে পার না?'

'সে দোষ আমার নয়—তোমাদের। আমি বিয়ে করতে চাই নি।'

'বেশ, দোষ আমাদের, আমি ঘাট মানছি। কিন্তু বউ তো কোন দোষ করে নি।'

কাকা উত্তর দিলেন না, হাত ছাড়াইয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিলেন।

তিনি চলিয়া গেলে মা কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন, তারপর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, 'মায়া জেগে আছ নাকি?'

কাকিমাও একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, 'হ্যাঁ।'

মা কিছু বলিলেন না, আরও কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া আবার একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করিয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান করিলেন।

চারিদিক হইতে এই দীর্ঘনিশ্বাস ফেলাফেলি দেখিয়া ভল্লুর খুল্লতাতভীতি অনেকটা কাটিয়া গেল। সে লেপের ভিতর হইতে মুণ্ড বাহির করিল। দেখিল, কাকিমা আলোর দিকে তাকাইয়া আছেন, তাঁহার দুই চক্ষু জলে ভাসিয়া যাইতেছে।

কাকার নিষ্ঠুরতাই এই অশ্রুজলের হেতু তাহাতে সংশয় নাই। ভল্লু বিছানায় উঠিয়া বসিল, আবেগপূর্ণ স্বরে বলিল, 'কাকিমা।'

চোখ মুছিয়া কাকিমা বলিলেন, 'কি?'

ভল্লু বলিল, 'কাকা নরাধম—না?'

কাকিমা উত্তর দিলেন না।

ভল্লু আবার বলিল, 'কাকা কারুর কথা শোনে না। মার কথা শোনে না, বাবার কথা শোনে না, তোমার কথা শোনে না- খালি আমাকে বকে। কাকা নরাধম।'

কাকিমা এবারও তাহার কথায় সায় দিলেন না, তাহাকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া ভাঙা ভাঙা গলায় বলিলেন, 'ঘুমো ভল্লু, অনেক রাত হয়েছে।'

ভল্লু শুইল বটে, কিন্তু তাহার ঘুম আসিল না। কাঁচা ঘুমের উপর কাকার উগ্র অভিযানে তাহার ঘুম চটিয়া গিয়াছিল; সে নীরবে শুইয়া ভাবিতে লাগিল।

ক্রমে এগারোটা বাজিয়া গেল। ঠং করিয়া সাড়ে এগারোটা বাজিল। তবু ভল্লুর চোখে ঘুম নাই। সে উত্তপ্ত মস্তিষ্কে চিন্তা করিতেছে। কাকিমা অনেকক্ষণ জাগিয়া থাকিয়া মাঝে মাঝে বুক ভাঙা নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে শেষে বোধ করি ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। ভল্লু একবার ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল, তাঁহার চক্ষু মুদিত, তিনি শান্তভাবে নিশ্বাস ফেলিতেছেন।

কাকিমার মুখের দিকে চাহিয়া ভল্লুর কাকার উপর ক্রোধ ও বিদ্বেষ আরও বাড়িয়া গেল। ডাকাত সর্দারের আর কত সহ্য হয়। আজ দ্বিপ্রহর হইতে যে অমানুষিক অত্যাচার তাহার উপর হইয়াছে, তাহা না হয় সে সহ্য করিয়াছে; তাহার সাধের তরবারিটা ভাঙিয়া ব্যবহারের অযোগ্য হইয়া গিয়াছে, তবু সে কিছু বলে নাই। কিন্তু কাকিমার প্রতি এই নিষ্ঠুরতা—নারী নির্যাতন ঃ সে কি করিয়া বরদাস্ত করিবে? ভল্লুর ক্ষুদ্র প্রাণের সমস্ত 'সিভালরি' সঙ্গিন উঁচাইয়া খাড়া হইয়া উঠিল। যায় প্রাণ যাক প্রাণ—ভল্লু কাকাকে শাসন করিবেই।

কিন্তু—

প্রতিহিংসার কল্পনায় রাত্রি জাগরণ যত সহজ, কল্পনাকে কার্যে পরিণত করা অত সহজ নয়। উপায় চিন্তা করিতে করিতে ভল্লুর ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হইল।

অবশেষে দীর্ঘ জটিল চিন্তার পর ভল্লু সিদ্ধান্তে উপনীত হইল। তাহার অধরে একটু হাসি দেখা দিল।

কাকা কাকিমার উপর অত্যাচার করেন বটে, কিন্তু দূর হইতে। ইহার প্রকৃত কারণ, তিনি কাকিমাকে ভয় করেন। বাড়ির মধ্যে কাকা কেবল কাকিমাকেই ভয় করেন। প্রমাণ—কাকিমা এ বাড়িতে আসার পর হইতে কাকা নিজের ঘর ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছেন; এমন কি বিছানা স্পর্শ করিবার সাহস পর্যন্ত তাঁহার নাই। মুখে তিনি যতই বীরত্ব প্রকাশ করুন না কেন, কাকিমার ভয়ে তিনি সর্বদা সন্ত্রস্ত হইয়া আছেন। নচেৎ বাড়িসুদ্ধ লোকের এত সাধ্য-সাধনা সত্ত্বেও তিনি কাকিমার সংস্পর্শে আসিতে গররাজী কেন?

এরূপ ক্ষেত্রে কাকাকে জব্দ করিবার একমাত্র উপায়—

ভল্লুর মুখের হাসি আরও বিস্তার লাভ করিল। সে ধীরে ধীরে শয্যা হইতে নামিল। কাকিমা জাগিলেন না। ঘড়িতে বারোটা বাজিল।

বিছানা ও লেপের তপ্ত আয়েশ ত্যাগ করিতে তাহার কষ্ট হইল, কিন্তু সংকল্পিত কর্তব্য পালন করিতে ভল্লু কোন সময়েই পরাঙ্মুখ নয়। সে নিঃশব্দ পদক্ষেপে ঘরের বাহির হইল।

বাড়ি অন্ধকার। কোন্ অদৃশ্য স্থান হইতে একটা মট্ মট্ শব্দ আসিতেছে, যেন কে অন্ধকারে বসিয়া আঙুল মটকাইতেছে। ভল্লুর বুক দুরদুর করিয়া উঠিল ; সে কিছুক্ষণ দুই মুঠি শক্ত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

শব্দটা অপ্রকৃতি নয়, একটা দরজার তক্তার কীট গর্ত করিতেছে। ভল্লু ধীরে ধীরে রুদ্ধ নিশ্বাস মোচন করিল। কিন্তু ভয় বস্তুটা এমনই যে, বাস্তব-অবাস্তবের অপেক্ষা রাখে না, অন্ধকারে নিজের পদশব্দও আতঙ্কের সৃষ্টি করে। ভল্লুর প্রবল ইচ্ছা হইল, ফিরিয়া গিয়া বিছানায় শুইয়া পড়ে—কাজ নাই আর কাকাকে শাসন করিয়া। কিন্তু সে দাঁতে দাঁত চাপিয়া মনে মনে বলিল, 'আমি ভল্লু সর্দার। আমি কাউকে ভয় করি না ; কিচ্ছু ভয় করি না।'

তথাপি, চক্ষুদুটি দৃঢ়ভাবে বন্ধ করিয়াই ভল্লু সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া চলিল। নিতান্ত পরিচিত পথ, তাই কোন দুর্ঘটনা ঘটিল না। অবশেষে শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে সে বৈঠকখানায় উপস্থিত হইল।

ঘরে মৃদু আলো জ্বলিতেছে। ভল্লু দেখিল আপাদমস্তক র‍্যাপার মুড়ি দিয়া কাকা প্রায় গামার মতই কুণ্ডলিত হইয়া শুইয়া আছেন।

ভল্লু কাকার গা ঠেলিয়া ডাকিল, 'কাকা!'

কাকা চমকিয়া উঠিলেন, 'অ্যাঁ—কে!' ভল্লুকে দেখিয়া ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিলেন, 'কি হয়েছে রে?'

শীতের সহিত অন্যান্য মানসিক আবেগ মিশ্রিত হইয়া ভল্লুর দন্তবাদ্য আরম্ভ হইয়াছিল, সে বলিল, 'কাকিমার অসুখ করেছে—তু—তুমি শিগগির চল!'

'কি হয়েছে?'

ভল্লু বিপদে পড়িল। রোগের লক্ষণ সম্বন্ধে সে আগে চিন্তা করে নাই অথচ কাকা ডাক্তার, তাঁহাকে বাজে কথা বলিয়া প্রতারিত করা চলিবে না। পূর্বে কয়েক-বার কাল্পনিক রোগের উল্লেখ করিয়া ভল্লু ধরা পড়িয়া গিয়াছে।

হঠাৎ তাহার একটা রোগের কথা মনে পড়িয়া গেল। কয়েক মাস আগে লিলির ঐ রোগ হইয়াছিল (স্যান্টোনিন প্রয়োগে আরাম হয়)। লিলির যে রোগ হইয়াছিল, তাহা কাকিমার হইতে বাধা নাই—বিশেষত যখন উভয়েই মেয়ে মানুষ? ভল্লু ঢোক গিলিয়া বলিল, 'দাঁত কিড়মিড় করছেন।'

দাঁত কিড়মিড় করিতেছে। হিস্টিরিয়া? কাকা ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। এত রাত্রে! বিচিত্র নয়। আজ রাত্রে ঐসব বকাবকির পর হয়তো—

কাকা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আর কি করছে?'

'আর কিছু না, শুয়ে আছেন।'

হুঁ, হিস্টিরিয়াই বটে। কাকা একটু দ্বিধা করিলেন। কিন্তু অনুতপ্ত মানুষের নিকট কঠোর ব্রহ্মচারীর পরাজয় হইল। তিনি আলমারি হইতে একটা বেঁটে সবুজ রঙের শিশি লইয়া সংক্ষেপে বলিলেন, 'চল্।'

ভল্লুর বুকের ভিতর ধড়াস-ধড়াস করিতে লাগিল, কঠিন ও বিপজ্জনক কার্য ফলনোন্মুখ হইলে এরূপ সকলেরেই হয়। সে নিঃশব্দে কাকার অনুসরণ করিল।

কাকা উপরে উঠিয়া ঘরের দ্বারের সম্মুখে একবার দাঁড়াইলেন ; তারপর ভিতরে প্রবেশ করিলেন।

খাটের পাশে দাঁড়াইয়া রোগিণীর অনাবৃত মুখের দিকে চাহিতেই একটা অজ্ঞাতপূর্ব মধুর অনুভূতি তাঁহার সর্বাঙ্গের উপর দিয়া বহিয়া গেল। কিন্তু তিনি তখনই মনকে যথোচিত কঠিন করিয়া হস্তস্থ শিশির মুখ খুলিয়া রোগিণীর নাকের সম্মুখে ধরিলেন।

কাকিমা শিহরিয়া জাগিয়া উঠিলেন। ঠিক এই সময় দ্বারের কাছে খুট করিয়া শব্দ হইল। কাকা ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলেন, দ্বার বন্ধ; ভল্লু ঘরে নাই;

তিনি এক লাফে গিয়া দরজায় টান মারিলেন—দরজা খুলিল না। বাহির হইতে শিকল লাগানো।

কাকা চাপা গর্জ্জনে বলিলেন, 'ভল্লু, শিগগীর দোর খোল্ পাজি—নইলে খুন করব।'

কিন্তু ভল্লু তখন পাশের ঘরে গিয়া বাবার লেপের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়াছে।

* * * *

পরদিন ভোর হইতে না হইতে ভল্লুর ঘুম ভাঙিল।

মা বাবা তখনও সুপ্ত; ভল্লু চুপি চুপি উঠিয়া বাহিরে আসিল।

কাকিমার দরজা তেমনই বাহির হইতে শিকল লাগানো, অর্থাৎ কাকা সারারাত্রি বাহির হইতে পারেন নাই। বিজয়গর্বে ভল্লু সর্দারের মুখ উৎফুল্ল হইয়া উঠিল; সে নিজ মনে একবার কিরাতনৃত্য নাচিয়া লইল। ভবিষ্যতে তাহার ভাগ্যে যাহা আছে তাহা তো আছেই, তাই বলিয়া বর্তমানের বিজয়োল্লাস তো আর দমন করিয়া রাখা যায় না।

কিন্তু কাকা কিরূপ নির্যাতন ভোগ করিতেছেন, তাহা স্বচক্ষে দেখিবার লোভও সে সম্বরণ করিতে পারিল না। জানালায় একটি ক্ষুদ্র ছিদ্র ছিল, ভল্লু তাহাতে চোখ লাগাইয়া উঁকি মারিল।

যাহা দেখিল, তাহাতে স্তম্ভিত বিস্ময়ে চক্ষু চক্রাকার করিয়া ভল্লু সরিয়া আসিল। তারপর দৌড়াইতে দৌড়াইতে মার ঘরে ফিরিয়া গেল। ঘুমন্ত মাকে নাড়া দিয়া জাগাইতে জাগাইতে উত্তেজনা-সংহত কণ্ঠে বলিল, 'মা! মা! কাকা কাকিমাকে তিনটে-পাঁচটা চুমু খাচ্ছেন।'

হাসি কান্না

অধরোষ্ঠ প্রসারিত করিয়া দন্তনিষ্কাশনপূর্বক সশব্দে অথবা নিঃশব্দে মুখের এক প্রকার ভঙ্গি করার নাম হাসি। আবার, ঠিক উক্ত প্রকারে অধরোষ্ঠ প্রসারণ ও দন্ত বিকাশ করিয়া প্রায় অনুরূপ মুখভঙ্গি করিলে উহা কান্না অভিহিত হইয়া থাকে। উভয়বিধ অভিব্যক্তির মধ্যে সীমারেখা অতিশয় সূক্ষ্ম। তবে মৎসদৃশ বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরা সহজেই উহাদের পার্থক্য ধরিয়া ফেলিতে পারেন।

অপিচ, হাসির সহিত আনন্দ নামক মনোভাবের একটা নিত্য-সম্বন্ধ মনে করিবার সঙ্গত কারণ আছে বলিয়া আমার মনে হয় না। আমি একটি মহিলাকে জানিতাম, মনে কোন প্রকার ক্লেশ উপস্থিত হইলেই তিনি হাসিতেন এমন কি মৃত্যুকালেও তিনি হাসিয়াছিলেন। কিন্তু সে যাক।

আজ রুচিরার হাসি-কান্নার কাহিনী বলব। রুচিরা মেয়েটি সামান্য নয়। তাহার বয়স উনিশ বছর, কলেজের বি. এ. ক্লাশের ছাত্রী এবং—কিন্তু সে কালো। তাহাকে কালো বলিলেই সে হাসিত।

কালো মেয়ে বাংলাদেশে অনেক আছে, সেজন্য ক্ষতি ছিল না। কিন্তু দৈব পরিহাস এই যে, রুচিরার খুড়তুত বোন ছন্দা, অপূর্ব সুন্দরী, ডানা কাটা পরী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। দুজনে সমবয়স্কা, একসঙ্গে পড়ে, এক বাড়িতে থাকে, দুজনেরই পিতা বর্তমান এবং একান্নবর্তী। ইহাতেও বোধ করি ক্ষতি ছিল না, কিন্তু একটি আগন্তুক কোথা হইতে আসিয়া রুচিরার হাসি-কান্নার সহিত মিশিয়া গিয়া ব্যাপারটা যৎপরোনাস্তি জটিল করিয়া তুলিয়াছিল।

এই আগন্তুকের কথা আনুপূর্বিক বলা প্রয়োজন। একদিন সন্ধ্যাকালে ছন্দা ও রুচিরা কোন একটি কৃত্রিম হ্রদের উপকণ্ঠে বসিয়া নিজেদের পড়াশুনার অসম্পূর্ণতার কথা লইয়া তর্ক করিতেছিল। বাৎসরিক পরীক্ষা সমাগত প্রায় অথচ দুজনেরই এমন অ-প্রস্তুত অবস্থা যে. পরীক্ষায় প্রকাশ্যভাবে অপ্রস্তুত হইবার সম্ভাবনা অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছে। এরূপ ক্ষেত্রে একজন গৃহশিক্ষকের সাহায্য যে একান্ত প্রয়োজন, ইহাই দুই বোন একমত হইয়া তর্ক করিতেছিল। মেয়েদের তর্ক করিবার ইহাই রীতি, তাহারা একমত হইলেও তর্ক শেষ হয় না।

ছন্দা বলিল, ‘ইংরেজী আর বাংলা কোনও রকমে চালিয়ে নেব, কিন্তু আমার মাথা খাবে—সংস্কৃত। মৃচ্ছকটিক পড়েছিস? কিছু বুঝতে পারিস?’

রুচিরা আকাশের দিকে তাকাইয়া বলিল, ‘আমার মাথা খাবে—ফিলজফি। ভোলিশান আর রিফ্লেক্‌স্‌ অ্যাকশনের তফাত বুঝতে পারিস?

ছন্দা বলিল, ‘কিছু না; ঝাড়া মুখস্থ করেছি। কিন্তু সংস্কৃত যে ছাই মুখস্থও হয় না?’

গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া রুচিরা বলিল, ‘মাস্টার—একটা মনের মতন মাস্টার না হ’লে দুজনেই গেলুম।’

তাহাদের পিছনে রাস্তার পাশে মোটর দাঁড়াইয়া ছিল। মোটরে তাহারা বায়ু সেবন করিতে আসিয়াছে, মোটরেই ফিরিবে। রুচিরা উঠিবার উপক্রম করিল।

ছন্দা তাহার আঁচল ধরিয়া বসাইবার চেষ্টা করিয়া বলিল, ‘কিন্তু এমন মনের মতন মাস্টার পাবি কোথায়?’

রুচিরা মাথা নাড়িল, ‘নেই। আমার সঙ্গে ইয়ার্কি দেবার চেষ্টা করবে না, তোর পানে ফ্যালফ্যাল ক’রে চেয়ে থাকবে না—কেবল সংস্কৃত আর ফিলজফি পড়াবে—এমন মাস্টার ভূ-ভারতে নেই। চল্‌ বাড়ি যাই।’

দুজনে উঠিয়া দাঁড়াইল, তারপর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বসিয়া পড়িল।

অনতিদূরে আর একটা বেঞ্চির উপর একজন লোক বসিয়া আছে, তাহা ইতি-পূর্বে কেহই লক্ষ্য করে নাই। এখন লোকটি তাহাদের সম্মুখে আসিয়া একেবারে করযুগল যুক্ত করিয়া দাঁড়াইল, গম্ভীর স্বরে বলিল, মাফ করবেন, আপনারা কি মাস্টার রাখতে চান?’

ছন্দা ও রুচিরা নির্বাক হইয়া লোকটির পানে তাকাইয়া রহিল। টুইলের হাফশার্ট পরা যুবক, মাথার চুল এলোমেলো। চোখের দৃষ্টিতে গাম্ভীর্য,

অধরোষ্ঠে একটু ছেলেমানুষি ভাব।

কিছুক্ষণ দম লইয়া রুচিরা ক্ষীণস্বরে প্রশ্নের উত্তর দিল ; বলিল, 'হ্যাঁ।'

যুবক বলিল, 'তা হ'লে যদি আপত্তি না থাকে, আমি আপনাদের পড়াতে পারি। মৃচ্ছকটিক একটি বস্তুতান্ত্রিক নাটক ; ইবসেন অমন নাটক লিখতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করতেন। আর ভোলিশন এবং রিফ্লেক্স অ্যাক্সনের তফাত আমি এক মিনিটে বুঝিয়ে দিতে পারি।'

'ছন্দা আচ্ছন্নের মত বলিল, 'আপনি—আপনি কে ?'

যুবক বলিল, আমার নাম সরিৎ হালদার। আমি একজন বেকার যুবক, অর্থাৎ কোনোও কাজই করি না। তবে সুযোগ পেলে কাজ করতে রাজী আছি।

রুচিরা দ্বিধা-জড়িত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনি কি এম. এ. পাস করেছেন ?'

সরিৎ বলিল, 'দুবার। ফিলজফিতে এবং সংস্কৃতে।'

দুই বোন পরস্পর মুখের পানে চাহিল।

ছন্দা বলিল, 'বেশ। কাল আমাদের বাড়িতে গিয়ে দেখা করবেন।' বলিয়া নিজেদের ঠিকানা দিল। যুবকের চোখের গাম্ভীর্য ও অধরোষ্ঠের ছেলেমানুষি গাঢ়তর হইল ; সে একবার মাথা ঝুঁকাইয়া প্রস্থান করিল।

গাড়িতে বাড়ি ফিরিতে ফিরিতে ছন্দা একসময় গাড়ির ভিতরকার আলো জ্বালিয়া রুচিরার দিকে চাহিয়া খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। রুচিরাও মুখ টিপিয়া হাসিল।

রুচিরার হাসিটা বড় মিষ্ট। আর ছন্দার—ছন্দার কথা বলিতে গেলেই রবীন্দ্রনাথের রামেন্দ্র-প্রশস্তির কথা মনে পড়ে—তোমার হাস্য সুন্দর, তোমার চাহনি সুন্দর, ইত্যাদি।

পরদিন হইতে সরিৎ হালদার ছন্দা ও রুচিরার মাস্টার নিযুক্ত হইল। কর্তারা বুঝিলেন, ছোকরা দুঃস্থ এবং পণ্ডিত। মেয়েরা দেখিল, দুঃস্থ এবং পণ্ডিত হইলেও মাস্টার সাধারণ লোক নয়। সে রুচিরার সহিত ইয়ার্কি দিবার চেষ্টা করিল না, ছন্দার দিকে ফ্যালফ্যাল করিয়া তাকাইয়া রহিল না। চোখে গাম্ভীর্য ও অধরোষ্ঠে ছেলেমানুষি ভাব লইয়া ছাত্রীদের সংস্কৃত ও ফিলজফি শিখাইতে লাগিল।

মাস্টারের বয়স বোধ করি চব্বিশের বেশি নয়। মাথার চুল এলোমেলো, বেশ-ভূষার পরিপাট্য নাই, প্রত্যহ দাড়ি কামাইবার কথাও স্মরণ থাকে না। কিন্তু অদ্ভুত তাহার পড়াইবার ক্ষমতা। শুধু সে কঠিন বিষয়কে সহজ করিয়া বুঝাইয়া দিতে পারে তাহাই নয়, শিক্ষার্থিনীদের মনের মধ্যে কঠিন বস্তুকে তরল করিয়া তাহাদের সত্তার সহিত মিশাইয়া দিতে পারে। বিদ্যা তখন কেবল জ্ঞানের পর্যায়ে থাকে না, উপলব্ধির পর্যায়ে গিয়া উপস্থিত হয়। ছাত্রী দুটি ক্রমে লেখাপড়ার মধ্যে তন্ময় হইয়া গেল।

কিন্তু চিরন্তনী শবরী তো লেখাপড়ার মধ্যে তন্ময় থাকে না। পরমা প্রকৃতির বিধিবিধান অনুরূপ। ছন্দা ও রুচিরার সুগহন অন্তলোকে হয়তো গোপনে গোপনে যে দ্বন্দ্বের প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইয়া যায়, তাহা তাহারা নিজেরাও ভাল করিয়া জানিতে পারে না।

জলের ভিতর দিয়া বৈদ্যুতিক স্রোত প্রেরণ করিলে জল বিপরীতধর্মী দুটি বাষ্পে পরিণত হয়; হাইড্রোজেন আগুনের সংস্পর্শে জ্বলিয়া উঠে, অক্সিজেন নিজে না জ্বলিয়া অগ্নিকে আরও দীপ্তিমান করিয়া তোলে। আশ্চর্য প্রকৃতির ইন্দ্রজাল। ছন্দা ও রুচিরা এতদিন জলের মত ওতপ্রোতভাবে পরস্পর মিশিয়া ছিল, যেন বিদ্যুতের সংস্পর্শে দ্বিধা হইয়া গেল। কবে এবং কখন এইসব বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া ঘটিল, তাহা কেহ জানিল না।

দুজনের পড়িবার ঘর একই; একটি টেবিলের দুপাশে বসিয়া দুজনে পড়াশুনা করে। মাস্টার আসিয়া তৃতীয় দিকে বসেন এবং নিরপেক্ষভাবে দুই ছাত্রীর পানে পর্যায়ক্রমে তাকাইয়া শিক্ষা দান করেন, মাস্টারের এই অটল নিরপেক্ষতা বুঝি বা অন্তরে অন্তরে অনর্থের সৃষ্টি করে। নিরপেক্ষতা খুবই উচ্চ অঙ্গের চিত্তবৃত্তি; কিন্তু পক্ষপাতিত্বের একটা সুবিধা এই যে, কোনও পক্ষের মনেই সংশয়ের অবকাশ থাকে না।

মাস্টার সকালবেলায় পড়াইতে আসেন। ছাত্রীরা আগে হইতেই পড়ার ঘরে বসিয়া তাঁহার জন্য প্রতীক্ষা করে। কোনও দিন হয়তো ছন্দার একটু দেরি হইয়া যায়, সে তাড়াতাড়ি পড়ার ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখে, মাস্টার তখনও আসেন নাই, রুচিরা একটা নোটের খাতা লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছে।

ছন্দা একবার রুচিরার মুখের দিকে তাকাইয়া নিজের চেয়ারে বসিতে বসিতে বলে 'রুচি, তোর নাকের পাশে পাউডার লেগে আছে, মুছে ফেল।'

রুচিরা আঁচল দিয়া নাকের পাশে ঘষিতে ঘষিতে হাসে, বলে, 'কালো রঙের ওপর পাউডারের জেল্লা খোলে বেশি। তোর কিন্তু কিছু বোঝা যায় না।'

ছন্দা একটা বইয়ের পাতা খুলিয়া বলে, 'নেয়ে উঠে একটা কিছু মুখে না মাখলে মুখটা যেন চটচট করে।'

রুচিরা বলে, 'হ্যাঁ। আজকাল রোজ সকালে নাওয়া আরম্ভ করেছিস দেখছি। আমি ভাই পারি না।'

ছন্দা ঈষৎ তপ্তমুখে বলে, 'সকালে না নাইলে চুল শুকায় না। এলো-চুলে কলেজে যাওয়া একটা অসভ্যতা।'

দুই ভগিনীর মিষ্টালাপ শেষ হইবার পূর্বেই মাস্টার প্রবেশ করেন। ছাত্রীরা সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইয়া আবার বসে।

মাস্টার একটা বই তুলিয়া বলিলেন, 'ছন্দা, কদিন ধ'রে লক্ষ্য করছি, ফিলজফি পড়বার সময় তুমি মন দিয়ে শোন না।'

ছন্দা ক্ষীণ কণ্ঠে বলিল, 'শুনি তো।'

মাস্টারের চোখের গাম্ভীর্যের কাছে অধরের ছেলেমানুষি পরাভূত হইয়া পলায়ন করে। তিনি বলেন, 'শোন বটে, কিছু মন দাও না। আর রুচিরা তুমিও দেখছি সংস্কৃত পড়ানোর সময় অন্যমনস্ক হয়ে পড়।'

রুচিরা অপরাধিনীর মত চক্ষু নত করিয়া থাকে, তারপর আস্তে আস্তে বলে 'আর অন্যমনস্ক হব না।'

মাস্টার বলেন, 'বেশ! এস আজ তোমাদের এথিক্‌স পড়াব।'

পাঠ আরম্ভ হয়।

কিন্তু ছাত্রীযুগল, মাস্টার বিরক্ত হইয়াছেন মনে করিয়া মনে মনে কাঁটা হইয়া থাকে।

আশ্চর্য! একদিকে দুইটি ধনীর কন্যা—অভিজাত সমাজের মধ্যমণি বলিলেও মিথ্যা বলা হয় না, অন্যদিকে দুঃস্থ বেকার মাস্টার। ইহাদের মধ্যে মাস্টার-ছাত্রী সম্বন্ধ ছাড়া অন্য কোনও সম্বন্ধ কল্পনা করাও যায় না। অথচ—

ভারি আশ্চর্য!

কিন্তু মাস্টার যদি শেষ পর্যন্ত দুঃস্থ বেকার মাস্টারই রহিয়া যায়, তাহা হইলে নির্মম কান্না অথবা নির্মমতার হাসি ছাড়া এ কাহিনীর অন্য পরিসমাপ্তি সম্ভব হয় না। তাহা হইলে রুচিরার হাসি-কান্না আসে কোথা হইতে? এবং মাস্টারের পরিপূর্ণ পরিচয়ই বা দেওয়া যায় কি করিয়া? যে মাস্টার চিরদিন দুঃস্থ ও বেকার রহিয়া যায়, তাহার পরিচয় দিবার আগ্রহ আর যাহার থাকে থাকুক, আমার নাই। আমি রূপকথা বলিতেই ভালবাসি।

বার্ষিক পরীক্ষা শেষ হইয়া যাইবার পর একদিন মাস্টারের প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ হইয়া পড়িল।

কলেজের পড়ার তাড়া নাই, মাস্টার সাধারণভাবে ছাত্রীদের সহিত কাব্য ও দর্শনের যোগাযোগ সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলেন, এমন সময় ছন্দার বাবা ঘরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার হাতে কয়েক কেতা নোট।

মাস্টারের মাহিনা তার হাতে দিতেই সে তাহা পকেটে রাখিয়া আবার আলোচনা আরম্ভ করিল।

ছন্দার বাবা হাইকোর্টের উকিল, তিনি একটি চেয়ারে বসিয়া কিছুক্ষণ মনঃসংযোগে আলোচনা শুনিলেন; তারপর সহসা মাস্টারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমার বাবার নাম কি?'

মাস্টার একটু চমকিত হইল। কিন্তু বাপের নাম ভাঁড়াইতে কাহারও কাহারও চক্ষুলজ্জায় বাধে। সরিৎ হালদার যথার্থ পিতৃনাম বলিল। নামের পুরোভাগে একটা রাজকীয় খেতাব ছিল।

ছন্দার বাবা বলিলেন, 'হুঁ। কিন্তু তুমি এ ভাবে—।'

সরিৎ বলিল 'আপনারা একটু ভুল বুঝেছিলেন। আমি বেকার ব'লে নিজের পরিচয় দিয়েছিলুম বটে, কিন্তু নিজেকে দুঃস্থ বলিনি। সে সময় আমি বেকারই ছিলুম।'

ছন্দার বাবা বলিলেন, 'Suggestio falsi। কিন্তু এ অবস্থায়—'

সরিৎ বলিল, 'অবস্থার কোনও পরিবর্তনই ঘটেনি। বড়মানুষের ছেলে হয়ে জন্মানো শিক্ষক হবার অযোগ্যতা প্রমাণ করে না। তাছাড়া ছন্দা আর রুচিরাকে পড়াতে ভাল লাগে, ওরা খুব মেধাবিনী ছাত্রী।' বলিয়া নিরপেক্ষ স্নিগ্ধ চোখে দুজনের পানে চাহিয়া হাসিল।

ছন্দা ও রুচিরা এই বাক্যালাপের শুরু হইতেই মাস্টারের দিকে বিস্ফারিত নেত্রে তাকাইয়া ছিল, এখনও তেমনই তাকাইয়া রহিল।

ছন্দার বাবা বলিলেন, 'তা বটে, কিন্তু—'

সরিৎ বলিল, 'আমি যেমন মাইনে নিচ্ছি, তেমনই নেব। আপনার ভয় নেই।'

সংকোচ কাটিয়া গেল। ছন্দার বাবা হাসিলেন, বলিলেন, 'বেশ কথা।'

তিনি প্রস্থান করিলে ছন্দা হঠাৎ দাঁড়াইয়া উঠিয়া উত্তপ্ত-মুখে বলিল, 'আপনি এতদিন এ কথা লুকিয়ে রেখেছিলেন কেন?'

সরিৎ বলিল, 'না লুকোলে তোমাদের পড়াত কে?'

'কেন, আর কি লোক ছিল না?'

'ছিল। কিন্তু তারা রুচিরার সঙ্গে ইয়ার্কি দেবার চেষ্টা করত কিংবা তোমার পানে ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকিয়ে থাকত। ফলে তোমরা পরীক্ষায় ফেল করতে।' মাস্টারের স্বর গম্ভীর।

রুচিরার অধর একটু স্ফুরিত হইল, চোখের কূলে কূলে হাসি ভরিয়া উঠিল। মাস্টারের অধরে কিন্তু ছেলেমানুষির চিহ্নমাত্র নাই।

ছন্দা যেন পরাস্ত হইয়া বসিয়া পড়িল; তারপর মিনতির স্বরে বলিল, 'বলুন না মাস্টার মশাই, সত্যি কেন লুকিয়েছিলেন?'

এতক্ষণ সরিতের অধরে ছেলেমানুষির ভাব ফিরিয়া আসিল। সে বলিল, 'মিথ্যাকে সত্য ক'রে তোলার নাম রোমান্স। রোমান্সের চূড়ান্ত হচ্ছে রূপকথা! আমি রূপকথা বড় ভালবাসি। ছদ্মবেশী রাজকুমারের কথা পড়েছ তো? আমি রাজকুমার নই, কিন্তু ছদ্মবেশের পরিপূর্ণ আনন্দ ভোগ ক'রে নিয়েছি। এমন কি ছদ্মবেশ ত্যাগ করবার পরও সে আনন্দ শেষ হয়নি।'

ছন্দা বলিল, 'ছদ্মবেশ?'

'হাঁ। এইটেই জীবনের সবচেয়ে বড় রোমান্স। অধিকাংশ মানুষই জানে না যে সে ছদ্মবেশ প'রে বেড়াচ্ছে, পদে পদে নিজের মিথ্যা পরিচয় দিচ্ছে। তাই তারা রূপকথার আনন্দ থেকে বঞ্চিত।'

ছন্দা সুন্দর অধর বিভক্ত করিয়া, দুই চক্ষে মুগ্ধ বিস্ময় ভরিয়া চাহিয়া রহিল। কালো মেয়ে রুচিরার কালো চোখে নিগূঢ় হাসি টলমল করিতে লাগিল।

সে রাত্রে শয়নের পূর্বে রুচিরা অনেকক্ষণ ধরিয়া আয়নায় নিজেকে নিরীক্ষণ করিল। তারপর তাহার দৃষ্টি গিয়া পড়িল আয়নার পাশে টাঙানো ছন্দার একটি ফোটোর উপর। সে একটু একটু হাসিতে লাগিল। চকিতের জন্য তাহার দৃষ্টি আবার আয়নায় ফিরিয়া গেল। হঠাৎ সে একটু জোরে হাসিয়া উঠিল। তারপর ক্ষিপ্রহস্তে আলো নিভাইয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল।

ছন্দা তাহার পাশের ঘরে শোয়। অনেক রাত্রে সে আসিয়া গা ঠেলিয়া রুচিরার ঘুম ভাঙাইয়া দিল, 'এই রুচি, ওঠ—ঘুমিয়ে ফোঁপাচ্ছিস কেন?'

ঘুম ভাঙিয়া রুচিরা কিছুক্ষণ শূন্যদৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিল; তারপর অস্ফুট স্বরে বলিল, 'স্বপ্ন দেখছিলুম। ভারি মজার স্বপ্ন। শুনে যা ছন্দা, আর ফোঁপাব না।'

দিন যায়। মাস্টারও আসেন এবং যান। রুচিরা সমস্ত দিন হাসে; রাত্রে ঘুমের ঘোরে তাহার চোখের জলে বালিশ ভিজিয়া যায়। কি স্বপ্ন দেখে, কে জানে!

রুচিরা চালাক মেয়ে। অপ্রাপ্য বস্তুর পানে হাত বাড়াইয়া সে নিজেকে খেলো করিতে চায় না। ছন্দার গাল দুটিতে গোলাপ ফুটিয়া থাকে, চোখের চাহনিতে রূপকথার স্বপ্নাতুরতা। রুচিরা দেখিয়া হাসে; সে হাসি ছন্দার কাছে ধরা পড়িয়া

যায়। ছন্দার কপাল হইতে বুক পর্যন্ত রাঙা হইয়া উঠে। কিন্তু মুখ ফুটিয়া কেহ কিছু বলে না।

রুচিরা আগের মত পড়ার ঘরে বসিয়া মাস্টারের প্রতীক্ষা করে না। মাস্টার আসিয়াছেন খবর পাইলে, কোনও মতে হাত-ফের দিয়া চুলগুলো জড়াইয়া নীচে নামিয়া যায়। নতনেত্রে বসিয়া অখণ্ড মনোযোগে মাস্টারের বক্তৃতা শোনে ; তারপর পাঠ শেষ হইলে, একটু হাসিয়া দুজনের প্রতি চকিত দৃষ্টিপাত করিয়া চলিয়া যায়।

মাস্টার হয়তো সবই লক্ষ্য করেন কিন্তু তাঁহার তুলাদণ্ডের মতো নিরপেক্ষতা তিলমাত্র বিচলিত হয় না, চোখের গাম্ভীর্য ও অধরের চটুলতা আরও পরিস্ফুট হয় মাত্র।

একদিন সকালে মাস্টার পড়াইতে আসিলেন। ছন্দা টেবিলের সম্মুখে বসিয়া ছটফট করিতে লাগিল, মুহুর্মুহু দেওয়ালের ঘড়ির সঙ্গে চোখাচোখি হইল। ঘড়ি নির্বিকার মুখে টিকটিক শব্দ করিয়া চলিল। রুচিরা নিবিষ্টচিত্তে পড়িতে পড়িতে মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। সকাল কাটিয় গেল।

ছুটির দিন ছিল। বৈকাল বেলা রুচিরা পড়ার ঘরে অলসভাবে বসিয়া একটা খাতায় হিজিবিজি কাটিতেছিল, অযত্নবদ্ধ চুলগুলো কাঁধের উপর খসিয়া পড়িতেছিল।

অন্যমনস্কভাবে সে খাতায় লিখিল—

'যাহার ঢল ঢল নয়ন শতদল
তারেই আঁখিজল সাজে গো।'

আজ সকালে হঠাৎ ছন্দার চোখে জল দেখিয়া ফেলিয়াছে।

নানা আবোল তাবোল চিন্তা মাথায় আসিতে লাগিল। মগ্ন-চৈতন্য জিনিসটা কি? যত নিগৃহীত আশা-আকাঙ্ক্ষা সব ডানা-ভাঙা পাখির মত সেইখানে গিয়া আশ্রয় লয়? মৃচ্ছকটিকে ধূতার চরিত্রটি কেমন? নিজের স্বামীকে বসন্তসেনার হাতে তুলিয়া দিল! কিন্তু—

ছন্দা বাইরে যাইবার বেশে ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিল, 'রুচি, আমি মাসীমার বাড়ি যাচ্ছি ; তাঁর কি হয়েছে, ডেকে পাঠিয়েছেন।'

কবিতার পংক্তিগুলি কাটিতে কাটিতে রুচি বলিল. 'আচ্ছা।'

ছন্দা যেন আরও কিছু বলিবে এমনিভাবে একটু ইতস্তত করিয়া চলিয়া গেল।

...রূপকথার রাজপুত্রেরা ছদ্মবেশ পরিয়া কিসের খোঁজে বাহির হন? সাতশো রাক্ষসীর প্রাণ এক ভোমরা? সাপের মাথার মাণিক? অপরূপ রূপসী রাজকন্যা...

পাশের ঘরটা ড্রয়িং-রুম ; সেখানে টেলিফোনের ঘন্টি বাজিয়া উঠিল। রুচিরা অলস পদে উঠিয়া গিয়া ফোন ধরিল।

'কে আপনি?'

ভারি গলায় জবাব আসিল, 'আমি সরিৎ। তুমি কে? রুচিরা?'

রুচিরার গলা যেন বুজিয়া গেল, 'হ্যাঁ। আজ আসেননি কেন?'

'কাজ ছিল।'

হাসিবার চেষ্টায় রুচিরার গলা কাঁপিয়া গেল। 'আজ আপনার প্রথম কামাই। জরিমানা হবে।'

'জরিমানা করবে কে?'

'ছন্দা।'

'ও ভাল। শোন, তোমার বাবা-কাকাবাবু এঁরা বাড়িতে আছেন?'

'হ্যাঁ, আজ ছুটি। কেন?'

'দরকার আছে। আমি আধঘণ্টার মধ্যে যাচ্ছি। তোমাদের না হয় পড়িয়ে আসব।'—একটু ইতস্তত করিয়া—'ছন্দা নিশ্চয় বাড়িতে আছে?'

'না। ছন্দা মাসীমার বাড়ি গিয়েছে।'

মনে হইল, তারের অপর প্রান্ত হইতে একটা দীর্ঘশ্বাস ভাসিয়া আসিল।

রুচিরা হঠাৎ ধৃষ্টতা করিয়া বসিল, 'দুঃখ হচ্ছে বুঝি?'

'রুচিরা, তোমরা আমার ছাত্রী না?'

'দোষ করেছি, মাপ করুন।'

'আচ্ছা। তুমি বাড়িতে থাকবে তো?'

'থাকব।'

'আমি যাচ্ছি। হ্যাঁ, শোন। একটা কথা জান?'

'কি?'

'হাসি-কান্নার মত দীর্ঘনিশ্বাসেরও দু'রকম মানে হয়।'

'বুঝতে পারছি না।'

'হাসিতে কি খালি আনন্দই বোঝায়? কান্না কি কেবল দুঃখেরই প্রতীক?'

'এখনও বুঝতে পারছি না।'

'আচ্ছা, আমি যাচ্ছি।'

রুচিরা ফিরিয়া আসিয়া পড়ার ঘরে বসিল। নিতান্তই স্ত্রী স্বভাববশত নিজের বেশভূষার দিকে দৃষ্টি পড়িল। শাড়িটা আধময়লা, ব্লাউজ এককালে নূতন ছিল, এখন ধোপার কল্যাণে স্থানে স্থানে রঙ উঠিয়া গিয়াছে। তা হোক, ক্ষতি কি? অসহিষ্ণু হস্তে স্খলিত চুলগুলা রুচিরা টান করিয়া পিছনে জড়াইল। চুলগুলা একটা জঞ্জাল। মেমেদের মত বব করলে কেমন হয়!

দ্বৈপ্রাহরিক বিশ্রাম শেষ করিয়া বাবা ও কাকা ড্রয়িং-রুমে আসিয়া বসিলেন। তাঁহাদের কথার গুঞ্জন মাঝের ভেজানো দরজা দিয়া অস্পষ্টভাবে আসিতে লাগিল।

আধঘণ্টা কাটিল। একটি পরিচিত পদধ্বনি পড়ার ঘরের সম্মুখ দিয়া গিয়া ড্রয়িং-রুমের গালিচার উপর বিলুপ্ত হইল। বাবা ও কাকার সম্ভাষণ শোনা গেল, 'এস সরিৎ।'

তারপর তাঁহাদের বাক্যালাপ আবার গুঞ্জনধ্বনিতে পর্যবসিত হইল। পাঁচ মিনিট দশ মিনিট—কথা যেন আর শেষ হয় না।

রুচিরা উঠিয়া একবার ভেজানো দরজার সম্মুখ দিয়া অলস নিঃশব্দ পদে হাঁটিয়া গেল। সরিতের কণ্ঠের দুই-তিনটি কথা তাহার কানে গেল। সে আবার পা টিপিয়া নিজের স্থানে আসিয়া বসিল।

ও, এই কথা। টেলিফোনে কথাবার্তার ভঙ্গী হইতেই রুচিরার বোঝা উচিত ছিল। বিবাহের প্রস্তাব। পাত্রীর নামটি শোনা না গেলেও ছন্দা ছাড়া আর তো কেহ হইতে পারে না।

আরও অনেকক্ষণ তন্দ্রাচ্ছন্নের মত রুচিরা বসিয়া রহিল। স্বপ্ন কখনও মিথ্যা

হয় ?···সহসা চমক ভাঙিয়া সে দেখিল, সরিৎ আসিয়া টেবিলের অপর পাশে দাঁড়াইয়াছে। তাহার অধরের ছেলেমানুষি কোন অভাবনীয় উপায়ে চোখের মধ্যেও সঞ্চারিত হইয়াছে।

রুচিরা সহাস্যে উঠিয়া দাঁড়াইল।

সরিৎ কপট-কঠোর স্বরে বলিল, 'ফাজিল মেয়ে।'

'কি করেছি ?'

সরিৎ উত্তর না দিয়া তাহার পানে কেবল কপট-কঠোর চক্ষে চাহিয়া রহিল।

রুচিরা তখন কৌতুকতরল হাসিতে হাসিতে বলিল, 'বসুন, মাস্টারমশাই। আচ্ছা, এখনও কি আপনাকে মাস্টারমশাই বলতে হবে ?'

সরিৎ বলিল, 'না।' তারপর একটু বিবেচনা করিয়া বলিল, 'এখন তুমি আমাকে ওগো বলতে পার। কর্তারা অনুমতি দিয়েছেন।'

* * * *

অদম্য আবেগে টেবিলের উপর মাথা রাখিয়া রুচিরা কাঁদিতেছে। সরিৎ তাহার পাশে আসিয়া অযত্নবদ্ধ চুলগুলি খুলিয়া দিয়া বলিল, চুল খুলে কাঁদতে হয়। কালিদাস বলেছেন,—'বিললাপ বিকীর্ণ মূর্ধজা।'

অশ্রুপ্লাবিত মুখ ক্ষণিকের জন্য তুলিয়া রুচিরা বলিল, 'কিন্তু আমি যে কালো।'

সরিৎ তাহার কাঁধে হাত রাখিয়া বিকীর্ণকুন্তল মাথার পানে কিয়ৎকাল চাহিয়া রহিল, তারপর স্বপ্নাবিষ্ট কণ্ঠে বলিল, 'ওটা তোমার ছদ্মবেশ। তুমিই আমার রূপকথার রাজকন্যা।

অমরবৃন্দ

গৃহিণী থিয়েটার দেখিতে গিয়েছিলেন। কাজেই শুইতে যাইবার বিশেষ তাড়া ছিল না। রাত্রি দশটা নাগাদ আহারাদি শেষ করিয়া লাইব্রেরি-ঘরে আসিয়া বসিলাম। ভৃত্য তামাক দিয়া গেল।

নৈশ-প্রদীপের তৈল পুড়াইয়া কাজ করা আমার অভ্যাস নাই—ভারি ঘুম পায়। কিন্তু আজ স্থির করিলাম, গৃহিণী যখন বারোটার পূর্বে ফিরিবেন না, তখন মাঝের এই দুই ঘণ্টা সময় কাজ করিয়াই কাটাইয়া দিব। 'বাংলা সাহিত্যের অমরবৃন্দ' নাম দিয়া একটি প্রবন্ধ লিখিব মনে আঁকিয়া রাখিয়াছিলাম; সম্পাদক মহাশয়ও প্রত্যহ তাগাদা দিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এমন কি শীঘ্র লেখাটা না দিলে তিনি আমার বাসায় আসিয়া আড্ডা গাড়িবেন, এমন ভয়ও দেখাইয়াছিলেন। কিন্তু তবু কিছুতেই লেখাটা বাহির হইতেছিল না। আজ স্থির করিলাম, যেমন করিয়া হোক প্রবন্ধের পত্তন করিব। একবার আরম্ভ করিতে পারিলে আর ভয় নাই।

টেবিলের সামনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞভাবে বসিলাম। সম্মুখে টেবিল-সংলগ্ন মেহগির র‍্যাকের উপর বাংলা ভাষায় যে কয়খানি অমর গ্রন্থ আছে, সারি দিয়া সাজানো ছিল—সেই দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া ঘন ঘন তামাক টানিতে লাগিলাম।

প্রথমে মাইকেল মধুসূদন দত্তকে ধরা যাক। মধুসূদনের অমর সৃষ্টি কোন্ চরিত্র। রাবণ নিশ্চয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। রাবণকে লইয়াই প্রবন্ধ আরম্ভ করিতে

চেষ্টা করিতে হইবে ; মন্দ হইবে না।

তারপর বঙ্কিমচন্দ্র। বঙ্কিমের কোন্ সৃষ্টি অমর? কপালকুণ্ডলা? দেবী? সূর্যমুখী? ভ্রমর? কি আশ্চর্য! বঙ্কিম কি পুরুষ-চরিত্র অঙ্কিত করেন নাই? তবে, কেবল নারী চরিত্রগুলি মনে পড়িতেছে কেন?

যাক, এবার রবীন্দ্রনাথ। তাঁহার কে কে আছে? চিত্রাঙ্গদা—'দেবী নহি, নহি আমি সামান্য রমণী'। আর রাজা বিক্রম? হুঁ, হইতেও পারে। তা ছাড়া 'চোখের বালি'র বিনোদিনী আছে, সন্দীপ আছে—

রবীন্দ্রনাথের পর কে? শরৎচন্দ্র। তাঁর রাজলক্ষ্মী, কমল, সুরেশ, সব্যসাচী কিরণময়ী—

অতঃপর? শরৎচন্দ্রের পর কে? আর কেহ আছে কি?—টেবিলের ধারে মাথা রাখিয়া ভাবিতে লাগিলাম। ভাবিতে ভাবিতে…

আমি আফিমের নেশা করি না কিন্তু তামাকের ধোঁয়ার সঙ্গে চিরদিনের অভ্যাস মিশিয়া বোধ হয় একটু তন্দ্রা আসিয়া পড়িয়াছিল। আমি মানসচক্ষে দেখিলাম, আমার সবুজ-বনাত-ঢাকা টেবিলের উপর কচি কচি ঘাস গজাইয়াছে। শাখাযুক্ত কলমদানিটা কোন ফাঁকে দুটি নবপল্লবিত বৃক্ষে পরিণত হইয়াছে। চারিদিকে যে বই-খাতা ইত্যাদি ছড়ানো ছিল, সেগুলো পাথরের চ্যাঙড় মাটির ঢিবি বনিয়া গিয়াছে। গঁদের পাত্রটা বেবাক শিবমন্দিরে রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে। অথচ আয়তনে কিছু বাড়ে নাই,—আমি যেন বাইনাকুলারের উল্টা মুখ দিয়া এই দৃশ্য দেখিতেছি।

বড় ভাবনা হইল। আমার লেখার সমস্ত সরঞ্জাম যদি এইভাবে পাহাড় জঙ্গল বৃক্ষ ইত্যাদিতে পরিবর্তিত হইয়া যায়, তাহা হইলে সম্পাদক মহাশয়কে কি দিয়া ঠেকাইয়া রাখিব? রচনার পরিবর্তে দুর্বাঘাস তিনি কখনই লইবেন না, তিনি তেমন লোকই নন।

টেবিলের ওপারে বইয়ের র‍্যাকটা ধোঁয়াটে একটা পাহাড়ের মত দেখাইতেছিল। পাশাপাশি বিভিন্ন আয়তনের বইগুলা তাহারই উত্তুঙ্গ চূড়ার মত আকাশে মাথা তুলিয়াছিল। হঠাৎ খুট্ খুট্ শব্দ শুনিয়া ভাল করিয়া সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখি, দুইজন ঘোড়্সওয়ার একটা বইয়ের তলা হইতে বাহির হইয়া আসিতেছে। পাহাড়ী রোমশ দুইটি ঘোড়া, পিঠে কম্বলের জিন, তাহার উপর দুই সিপাহী আসীন। একজন হিন্দু, অন্যটি মুসলমান। হিন্দুর মাথায় মুরেঠা, গায়ে আঙরাখা, পায়ে নাগরা, কোমরে তরবারি। মুসলমানের মাথায় টোপ, গায়ে কিংখাপের শিরমানি ও পায়জামা, পায়ে মখমলের জুতা। তাহারও রেশমী কোমরবন্দ্ হইতে শম্‌শের ঝুলিতেছে।

দুজনে আসিয়া আমার কলমদানের একটা বৃক্ষতলে নামিল। গাছের ডালে ঘোড়া বাঁধিয়া হিন্দু বলিল, খাঁ সাহেব, এইখানেই কোথায় আছে। আমার মনে আছে, আমি পাহাড়ের গুহা থেকে সেটা ছুঁড়ে নীচে উপত্যকায় ফেলে দিয়েছিলুম।'

খাঁ সাহেবের চেহারা অতি সুন্দর; মুখে সামান্য দাড়ি আছে, কিন্তু তাহাতে গণ্ড ও চিবুকের গোলাপী বর্ণ ঢাকা পড়ে নাই। তাঁহার চোখের দৃষ্টি মেঘলা আকাশের মত ছায়াছন্ন—যেন দুঃখের গভীরতমতল পর্যন্ত ডুব দিয়া দেখিয়া

আসিয়াছেন। তিনি ইতস্তত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, 'তাই তো সিংহজী এতদিন পরে সে জিনিস কি আর খুঁজে পাওয়া যাবে? যা হোক, চেষ্টা ক'রে দেখতে দোষ নেই। হয়তো ঘাসের তলায় চাপা পড়ে গেছে। আসুন, খুঁজে দেখা যাক।' বলিয়া কোমর হইতে তরবারি বার করিলেন।

সিংহজী হাসিয়া বলিলেন, 'তলোয়ার রাখুন। সব কাজ কি তলোয়ারে হয়? আমি খোন্তা যোগাড় করেছি।' এই বলিয়া সিংহজী আমার একটা কলম তুলিয়া লইয়া বলিলেন, 'চমৎকার খোন্তা পাওয়া গেছে। আপনিও একটা নিন।'

দুজনে অম্লান বদনে আমার দুইটি কলম তুলিয়া লইয়া ঘাসের উপর এখানে-ওখানে খুঁজিতে আরম্ভ করিলেন। আমি ভাবিতে লাগিলাম—কে ইঁহারা। কোথায় ইঁহাদের কথা পড়িয়াছি? একজনের মুখে শৃগালের ধূর্ততা মাখানো, অন্যজন শর্দুলের মত গম্ভীর। অথচ দুজনের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য বন্ধুত্ব। কে ইঁহারা?

সিংহজী সহসা সানন্দে বলিয়া উঠিলেন, 'পেয়েছি, পেয়েছি, খাঁ সাহেব। এই দেখুন।' বলিয়া একটি ক্ষুদ্র বস্তু তুলিয়া ধরিলেন।

খাঁ সাহেব নিকটে আসিয়া বলিলেন, 'সত্যিই তো। লাগিয়ে দেখুন, আপনারটা বটে কিনা।'

সিংহজী বলিলেন, 'আমি আমার আঙুল চিনি না?' বলিয়া নিজের বাঁ হাতটা তুলিয়া ধরিলেন। তখন দেখিলাম, তাঁহার বাঁ হাতের কড়ে আঙুলটা নাই। সিংহজী ছিন্ন আঙুল যথাস্থানে জুড়িয়া দিতে সেটা বেবাক জোড়া লাগিয়া গেল।

এতক্ষণে ইঁহাদের চিনিলাম—আঙুল-কাটা মানিকলাল ও মবারক আলি খাঁ।

মবারক বলিলেন, 'সিংহজী, আপনার হারানো নিধি তো আপনি খুঁজে পেলেন। এবার চলুন, আমার হারানো নিধির সন্ধান করি।'

মানিকলাল মিটিমিটি হাসিয়া বলিলেন, 'কে, দরিয়া বিবি?'

মবারক কিয়ৎকাল অধোমুখে রহিলেন, শেষে বলিলেন, 'সিংহজী, আপনি তো সব কথাই জানেন। যে আমাকে সাপের মুখে পাঠিয়ে দিয়েছিল, আমি তাকেই খুঁজে বেড়াচ্ছি।'

'শাহজাদী আলমুজেব-উন্নিসা বেগম?'

'হ্যাঁ, তাকে কিছু দিনের জন্য পেয়েছিলুম, আবার হারিয়েছি।'

মানিকলাল জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তাঁকে খুঁজলেই পাবেন বলে মনে হয়?'

মবারক বললেন, 'জানি না। কিন্তু তবু খুঁজতে হবে।'

'বেশ চলুন।'

দুইজন ঘোড়ার দিকে অগ্রসর হইলেন। এই সময়ে পশ্চাতের পাহাড় হইতে পিলপিল করিয়া উইয়ের মত এক পাল ভেড়া বাহির হইয়া আসিল। গড্ডালিকা-প্রবাহের পশ্চাতে একজন মেষপালক। তাঁহাকে দেখিয়াই মনে হইল পূর্বে কোথায় দেখিয়াছি। কিন্তু চিনি চিনি করিয়াও চিনিতে পারিলাম না। মেষপালক বয়সে প্রৌঢ়, দাড়ি-গোঁফে মুখ আচ্ছন্ন, স্কন্ধে উপবীত। মুখে একটু ব্যঙ্গ-হাস্য লাগিয়া আছে—যেন পৃথিবীর সমস্ত ধাপ্পাবাজি তিনি ধরিয়া ফেলিয়াছেন।

মেষযূথ সবুজ মাঠের উপর চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। মেষপালক অনায়াস-পদে মন্দিরের নিকটবর্তী হইলেন। তারপর একটি প্রস্তরখণ্ডের উপর মস্তক রক্ষা করিয়া

শ্যামল শষ্পশয্যায় শয়নপূর্বক মন্দিরের চত্বরে পা তুলিয়া দিলেন।

মানিকলাল এতক্ষণ অশ্বের পাশে দাঁড়াইয়া দেখিতেছিলেন; বলিলেন, 'লোকটা তো মহা পাষণ্ড। শিবমন্দিরে পা তুলে দিলে। অথচ ব্রাহ্মণ ব'লে বোধ হচ্ছে। আসুন তো দেখি। মেষপালকের নিকটে গিয়া ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন, 'কে রে তুই শিব মন্দিরের গায়ে পা তুলে দিয়েছিস? পা নামা ব্যাটা।'

মেষপালক পা নামাইয়া উঠিয়া বসিল। দুইজন অস্ত্রধারী পুরুষকে নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, 'তোমাদের সঙ্গে তরবারি রহিয়াছে দেখিতেছি। দুইজনেই বলবান। সুতরাং আমার অন্যায় হইয়াছে, এরূপ কার্য আর করিব না।'

মানিকলাল কহিলেন, 'তুমি ব্রাহ্মণ ব'লেই আজ নিষ্কৃতি পেলে। কিন্তু এরকম ভাবে পা উঁচু করে শোবার উদ্দেশ্য কি?'

মেষপালক বলিল, 'পা উঁচু করিয়া শুইলে ধ্যান করিবার সুবিধা হয়। চেষ্টা করিয়া দেখিও।'

মানিকলাল এই অদ্ভুত মেষপালকের কথা শুনিয়া বিস্মিতভাবেই বলিলেন, 'তোমার নাম কি?'

মেষপালক মৃদুহাস্যে বলিল, 'আমার নাম জাবালি। উপবেশন কর।'

মানিকলাল তখন দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করিয়া উপবেশন করিলেন। মবারকও পাশে বসিলেন।

মানিকলাল সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'প্রভু, আপনি ভেড়া চরাচ্ছেন কেন?'

জাবালি বলিলেন, 'দেখ, ভেড়ার মাংস অতিশয় সুস্বাদু। তাহাদের প্রতিপালনে কোনও কষ্ট নাই। তাহারা আপনি চরিয়া খায়, আপনি বংশবৃদ্ধি করে। আমি বিনা ক্লেশে উহাদের মাংস পাইয়া থাকি। উপরন্তু উহাদের লোম হইতে কম্বল প্রস্তুত হয়। সুতরাং অন্নবস্ত্র কিছুরই অভাব থাকে না।'

মবারক জিজ্ঞাসা করিলেন, 'অন্নবস্ত্র ছাড়া মানুষের অন্য কাম্য কি কিছু নেই?'

জাবালি প্রতি প্রশ্ন করিলেন, 'আর কি আছে?'

মবারক একটু ইতস্তত করিয়া বলিলেন, 'রমণীর প্রেম।'

জাবালি বলিলেন, 'বৎস, প্রেম একটা সংস্কার মাত্র—অতএব অন্যান্য সংস্কারের মত উহা বর্জনীয়। কিন্তু ক্ষুধা সংস্কার নয়—শীতের প্রকোপকেও সংস্কার বলা চলে না। উহারা সংস্কারবিবর্জিত উলঙ্গ সত্য—চোখ ঠারিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। জগতে আর যাহা কিছু সকলই সংস্কার। দেখ, কিছুকাল আমি শিবমন্দিরে পা তুলিয়া দিয়াছিলাম বলিয়া তোমরা আমাকে তিরস্কার করিতেছিলে। কিন্তু ভাবিয়া দেখ শিব কে? তাহার আবার মন্দির কিসের? ইহা যদি শিবের মন্দির হয়, তবে শিব নামক কোনও ব্যক্তি নিশ্চয় ইহার মধ্যে আছে। আমি আদেশ করিতেছি. আনো দেখি শিবকে মন্দির হইতে বাহির করিয়া।'

মানিকলাল নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিলেন। তখন জাবালি আবার বলিলেন, 'শিব এখানে নাই, সুতরাং ইহা শিবমন্দির নহে। অতএব ইহার গায়ে পা তুলিয়া দিলেও কোন অপরাধ হয় না। কিন্তু তোমরা দুইজন অস্ত্রধারী পুরুষ যখন আপত্তি করিতেছ, তখন সুবিদ্ধি পরিচালিত হইয়া আমি সে কার্য হইতে বিরত হইলাম।'

মবারক পুনশ্চ প্রশ্ন করিলেন, 'কিন্তু নারীর প্রেম একটা সংস্কার মাত্র—এ যুক্তি

কি সুবুদ্ধি-পরিচালিত।'

জাবালি কহিলেন, 'অবশ্য। শারীরিক ক্ষুধার তাড়নাই পুরুষকে নারীর প্রতি আকৃষ্ট করে; এই আকর্ষণ নারী-বিশেষের প্রতি নয়, নারী-সাধারণের প্রতি। ক্ষুধার সময় মৃগমাংস ও মেষমাংস যেরূপ সমান প্রিয়—নারী সম্বন্ধেও তাহাই কোনও প্রভেদ নাই। কেবল সুস্বাদু খাদ্য দেখিয়া যেরূপ লোকে লুব্ধ হয়, সুন্দরী নারী দেখিয়াও সেইরূপ লালায়িত হয়। এই লালসাকে প্রেম বলিতে চাহ বলিতে পার, কিন্তু তাহা ভ্রম। বস্তুত, প্রেম বলিয়া কিছু নাই, মানুষ বংশানুক্রমে আত্মপ্রতারণা করিয়া এই প্রেমরূপ সংস্কারের উদ্ভব করিয়াছে। ভাবিয়া দেখ, তুমি যতদিন জেবুন্নিসাকে না পাইয়াছিলে ততদিন ধরিয়া বিবিকে লইয়া সন্তুষ্ট ছিলে; কিন্তু জেবুন্নিসাকে পাইবামাত্র দরিয়া বিবির প্রতি তোমার বিতৃষ্ণা জন্মিল। ইহার কারণ কি?'

মবারক দ্বিধা-প্রতিফলিত মুখে নীরব রহিলেন, সহসা উত্তর দিতে পারিলেন না। মানিকলাল বলিলেন, 'প্রভু, আপনার কথাগুলি কড়া হ'লেও সত্য বলে মনে হচ্ছে। নির্মল থাকলে আপনার উপযুক্ত জবাব দিতে পারত। সে ভারী বুদ্ধিমতী—ঔরংজেব বাদশাকে ঘোল খাইয়ে ছেড়ে দিয়েছিল। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি কি? আপনি স্বয়ং সমস্ত সংস্কার থেকে মুক্ত হতে পেরেছেন তো।'

জাবালি বিনয়সহকারে বলিলেন, 'দম্ভ করিতে নাই। দম্ভে বুদ্ধির মলিনতা জন্মে। তথাপি আমি সম্পূর্ণ দম্ভমুক্ত হইয়া বলিতেছি যে, আমার সংস্কার দূর হইয়াছে।'

মবারক ঈষৎ অধীরভাবে বলিলেন, 'সাহেব, আপনার বক্তব্য আমার কাছে খুব স্পষ্ট হ'ল না। এমন অনেক সময় দেখা যায় যে, একটি লোক পৃথিবীর শতকোটি নারীর মধ্যে কেবল একটিকেই ভালবেসেছে—অন্য স্ত্রীলোকের পানে মুখ তুলেও চায় নি। সেই স্ত্রীলোকের মৃত্যুতে সে জগৎ অন্ধকার দেখেছে; কিন্তু তবু অন্য নারীকে হৃদয় সমর্পণ করতে পারে নি। এই একনিষ্ঠা কি প্রেম নয়?'

জাবালি বলিলেন, 'বৎস, উহাই প্রেম নামে অভিহিত বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহা একটি সংস্কার মাত্র। সংস্কার মাত্রেই দুঃখের কারণ, তাই প্রেম-পীড়িত ব্যক্তিরা সর্বদা দুঃখ পায়। দেখ, ছাগজাতীয় জীব প্রেম নামক সংস্কার হইতে মুক্ত, তাই তাহাদের প্রেমজনিত দুঃখ নাই; বিশেষের প্রতি তাহার নিষ্ঠা নাই, তাই তাহার অনুরাগ সর্বব্যাপী। তাহাকে বিশ্ব প্রেমিকও বলিতে পার। এই ছাগের অবস্থাই সকল মোক্ষাভিলাষীর কাম্য। উহাই ভূমা।'

মবারক বিরক্তভাবে মুখ ফিরাইয়া লইলেন, জাবালির কথার উত্তর দিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না। এইখানেই বোধ করি আলোচনা শেষ হইত, কিন্তু এই সময় মন্দিরের অপর পার্শ্বে দুইজন তর্করত ব্যক্তির কণ্ঠস্বর শুনা গেল। দেখিতে দেখিতে দুইজন ধুতি-পাঞ্জাবি-পরিহিত যুবক মন্দিরের অন্তরাল হইতে বাহির হইয়া আসিল। একজন দীর্ঘাকৃতি গৌরবর্ণ পুরুষ, খদ্দরের বেশভূষা যেন তাহার বিশাল অঙ্গে ঠিক মানাইতেছে না; অন্যটি পরিপূর্ণ বাঙালী, শ্যামল সুশ্রী চেহারা, মুখ বুদ্ধির প্রভায় উজ্জ্বল।

রজতগিরিনিভ পুরুষ জলদ-গম্ভীর স্বরে বলিল, 'তুমি ভুল করছ বিনয়। আমার

হাতে যখন অস্ত্র নেই, তখন আমি শুধু হাতেই লড়ব ; কিন্তু তবু দুষ্টের পীড়ন চুপ ক'রে সহ্য করব না। আমি গোরার গুলি খেয়ে মরতে রাজী আছি, কিন্তু পাহারাওলার রুলের গুঁতো আমার অসহ্য।'

বিনয় বলিল, 'বড়টা যখন তুমি স্বীকার ক'রে নিতে প্রস্তুত, তখন অপেক্ষাকৃত ছোটটায় আপত্তি কেন ?'

গোরা বলিল, 'আবার ভুল করলে। আমার কাছে বন্দুকের গুলিটা তুচ্ছ রুলের গুঁতোই বড়। কারণ ওতে আমার মনুষ্যত্বকে আহত করে, বন্দুকের গুলি তা পারে না।'

বিনয় বলিল, 'তা যেন হ'ল। কিন্তু এদিকে উদ্দেশ্য সিদ্ধি যাতে হয় সে দিকে তো দৃষ্টি রাখা দরকার।'

'উদ্দেশ্যটা তোমার কি শুনি ?'

'দেশের উদ্ধার।'

গোরা গর্জন করিয়া উঠিল, 'কখনও না। আমাদের প্রথম এবং একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে মনুষ্যত্বের উদ্ধার। মনুষ্যত্বকে যদি ভীরুতার হাত থেকে উদ্ধার করতে না পার তা হ'লে দেশ নিয়ে করবে কি ? সত্যাগ্রহ ? তুমি কি মনে কর, নিজের দাবিকে আঁকড়ে ধ'রে এক জায়গায় ব'সে থাকলেই সত্যের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করা হয় ?'

বিনয় বলিল, 'তাছাড়া বর্তমান অবস্থায় আর কি করা যেতে পারে ? তোমার মত গর্জন করলে কোনও ফল হবে কি ?'

'না শুধু গর্জনে কাজ হবে না, বর্ষণও চাই। আমাদের দেহ আছে, হাত পা আছে, সেই হাত-পা দিয়েই কাজ করতে হবে। অনাচারের বিরুদ্ধে আমাদের দেহ-মনের সমস্ত শক্তিকে যুযুৎসু ক'রে তুলতে হবে। কেবল প্রহার সহ্য করার শক্তিকে পোক্ত ক'রে তুললে কাজ হবে না। ওটা জড়শক্তি—জীবশক্তি নয়।'

এই সময়ে মন্দিরপার্শ্বে কয়েকজন লোক আসীন দেখিয়া বিনয় বলিয়া উঠিল, 'গোরা, তোমার বক্তৃতা থামাও। কারা রয়েছে।'

জাবালি হাত তুলিয়া উভয়কে নিকটে ডাকিলেন। তাহারা নিকটবর্তী হইলে কহিলেন, স্বাগত। তোমরা উপবিষ্ট হও।'

গোরা ও বিনয় সসম্ভ্রমে ঋষিকে প্রণাম করিয়া উপবেশন করিল। জাবালি আশীর্বাদ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের মধ্যে কিসের বচসা হইতেছিল ?'

বিনয় অল্প কথায় ঋষিকে তর্কের বিষয় বুঝাইয়া দিল। তিনি বলিলেন, 'ভাল, বুঝিলাম, তোমরা ভারতবর্ষকে স্বাধীন করিতে চাও। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞেস করি—স্বাধীনতা লাভ করিয়া ভারতবর্ষের কী ইষ্টসিদ্ধি হইবে ?'

বিনয় মৃদু হাসিয়া বলিল, 'একেবারে গোড়ার প্রশ্ন। গোরা, জবাব দাও।'

গোরা বলিল, 'স্বাধীনতাই চরম ইষ্ট নয়,—ইষ্টসিদ্ধির একটা উপায় মাত্র। আসল কাম্য—সুখ।'

জাবালি বলিলেন, 'যদি তাহাই হয়, তবে সুখলাভের জন্য দুঃখকে বরণ করিতে চাহ কেন ?'

গোরা বলিল, 'বৃহত্তর দুঃখের হাত এড়াবার জন্য ; যেমন গো-বীজের টীকা নিলে বসন্ত রোগের হাত থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়।'

মানিকলাল গোরাকে সমর্থন করিয়া বলিলেন, 'ঠিক কথা। আর একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে, যেমন ক্ষুধার বৃহত্তর দুঃখ এড়াবার জন্য ঋষিবর মেষপালনরূপ অল্প দুঃখ স্বীকার করছেন।'

জাবালি সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, 'ভাল। তোমাদের যুক্তি বিচারযোগ্য বটে। এখন বল দেখি, ভারতবর্ষ নামক বিশাল ভূখণ্ডকে বা তদ্দেশবাসী নরনারীকে স্বাধীন করিয়া তোমাদের লাভ কি হইবে? তোমরা নিজের চরকায় তৈল দিতেছ না কেন?'

গোরা বলিল, 'ভারতবর্ষই আমার চরকা, আমি তাতেই তেল দিতে চাই। ভারতবর্ষের ছত্রিশ কোটি নর-নারীর সুখই আমার সুখ।'

জাবালি কিয়ৎকাল তুষ্ণীভাব ধারণ করিয়া রহিলেন, তারপর ধীরে ধীরে শিরঃ-সঞ্চালন করিয়া কহিলেন, 'বৎস, তুমি পরের প্রতি মমতাসম্পন্ন হইয়া ভ্রান্তপথে চলিয়াছ—ও পথে কাম্যলাভ করিতে পারিবে না। ভারতবর্ষই বল আর অন্য দেশই বল, উহা কতকগুলি মনুষ্যের সমষ্টি মাত্র। এই মনুষ্যগুলি নিজের সুবিধার জন্য কতকগুলি সমাজ বা গোষ্ঠির সৃষ্টি করিয়াছে। সকল সমাজের কাম্য এক নহে—এমন কি পরস্পরবিরোধী। একে যাহা চাহে, অন্যে তাহা চাহে না। ব্যক্তিগত ভাবেও তদ্রূপ। তুমি সাত্বিকভাবে জীবন যাপন করিতে চাহ, আর একজন মদ্য মাংস আহার করিয়া তামসিকভাবে কাল হরণ করিতে ভালবাসে। সুতরাং কেবলমাত্র স্বাধীনতার দ্বারা সকলকে একই কালে সুখী করা অসম্ভব। সেই চেষ্টাও পণ্ডশ্রম।'

কিছুক্ষণ হেটমুখে চিন্তা করিয়া গোরা বলিল, 'তবে আপনার মতে, সর্বজনীন সুখলাভের উপায় কি?'

জাবালি বলিলেন, 'আত্মসুখের চিন্তায় অবহিত হওয়া। সকলেই যদি স্বার্থান্ধ হইয়া নিজ নিজ সুখের কথা ভাবিতে থাকে, তাহা হইলে অচিরাৎ তাহারা সুখবস্তু লাভ করিবে। দেখ কি সহজ উপায়। সকলে স্বার্থপর হও, আর কাহারও দুঃখ থাকিবে না।'

বিনয় ও মানিকলাল হাসিতে লাগিলেন। গোরার মুখেও একটু হাসি দেখা দিল, সে বলিল, 'প্রস্তাবটা বোধ হয় নূতন নয়—আগেও শুনেছি, কিন্তু স্বার্থে স্বার্থে যখন সংঘাত বাধবে তখন তো দুঃখ আপনি এসে পড়বে!'

জাবালি বলিলেন, 'সত্য। মনুষ্যজীবনের চরম শ্রেয় কি, তাহা মানুষ জানে না বলিয়াই যত প্রকার দুঃখের উদ্ভব হয়। কেহ মনে করে—অর্থই সুখ, কেহ মনে করে স্বাধীনতাই সুখ। এইজন্য লক্ষ্যবস্তুর বিভিন্নতা হেতু বিরোধের উৎপত্তি হয়। তুমি ভারতবর্ষকে সুখী করিতে সমুৎসুক। উত্তম কথা, যাহা বলিতেছি শোন। লোকশিক্ষা দাও। মানুষকে বুঝাও যে সংস্কারবিমুক্ত হইয়া সুখের অন্বেষণই একমাত্র ইষ্ট। সুখ কি তাহা মানুষ ভুলিয়া গিয়াছে—তাহাকে নূতন করিয়া বুঝাইয়া দাও। সেদিন সকলে হৃদয়ঙ্গম করিবে সুখ নামক মানসিক অবস্থাই একমাত্র পরমার্থ—ঐহিক বিষয়সম্পত্তি বা দারাপরিজন নহে, সেদিন জগতে আর দুঃখ থাকিবে না।

মবারক এতক্ষণ নীরবে বসিয়া শুনিতেছিলেন; তিনি প্রশ্ন করিলেন, 'কিন্তু সুখ কাকে বলে সেটা তো আগে জানা দরকার। সুখের সংজ্ঞা কি?'

জাবালি হাসিলেন, 'দুঃখ-সংযোগের বিয়োগই সুখ। ইহার অধিক কিছু বলিব না। গীতা নামক একটি গ্রন্থ আছে—উহাতে কিছু কিছু সত্য কথা বলা হইয়াছে;

পাঠ করিয়া দেখিতে পার। শুনিয়াছি আকবর শাহ উহা পারস্য ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন।'

সহসা দূরে রমণীকণ্ঠের আর্তধ্বনি ইঁহাদের আলোচনার জাল ছিন্ন করিয়া দিল। সকলে চমকিয়া ফিরিয়া দেখিলেন, একটি যুবতী ভয়ব্যাকুল ভাবে তাঁহাদের দিকে ছুটিয়া আসিতেছে এবং দুইজন মাতাল পরস্পর গলা জড়াজড়ি করিয়া স্খলিত-পদে টলিতে টলিতে তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিতেছে।

একটা মাতাল ভাঙা গলায় গান ধরিল, 'এসেছিল বক্না গরু পর গোয়ালে জাবনা খেতে'—

দ্বিতীয় মাতাল বলিল, If music be the food of love, play on—The man that hath no music in himself, nor is not moved with concord of sweet sounds—'

পলায়মানা যুবতী আবার অস্ফুট চীৎকার করিয়া বলিল, 'বাঁচাও—কে আছ, রক্ষে কর—'

গোরা, বিনয়, মবারক ও মানিকলাল একসঙ্গে উঠিয়া সেইদিকে ছুটিয়া গেলেন। গোরা জিজ্ঞাসা করিল, 'কি হয়েছে?'

স্ত্রীলোকটি তাহাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, 'ওরা আমার পিছু নিয়েছে। আমি অভয়া।'

মাতাল দুটাও কিছু দূরে দাঁড়াইয়া পড়িয়াছিল। ক্রুদ্ধ মবারক তরবারি বাহির করিয়া তাহাদের কাটিতে উদ্যত হইলেন। মানিকলাল ইসারায় তাঁহাকে নিবৃত্ত করিয়া কর্কশ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোরা কারা?'

এক নম্বর মাতাল তখনও ভাঙা গলায় গান গাহিতেছিল, সে গান বন্ধ করিল না। দ্বিতীয় মাতাল বলিল, 'কেন বাবা, বদিয়াতি করছ—শিকার পালায়, পথ ছাড়। আমরা দুজনে নামকাটা সেপাই।'

মানিকলাল তাহার নাসিকায় একটি মুষ্ট্যাঘাত করিলেন। গোরা তাহার সঙ্গীতজ্ঞ সহচরের গালে একটি প্রচণ্ড চড় কশাইয়া দিল। দুজনেই ধরাশায়ী হইল। দ্বিতীয় মাতালটা শয়ান অবস্থাতেই মাথা তুলিয়া বলিল, 'এই তো বাবা অন্যায় করছ। মাতাল মেরে কোনও লাভ নেই—তার চেয়ে মদ মার মজা পাবে। গোকুল-বাবুকে ঐ কথাই বলেছিলুম—'

প্রথম মাতাল ক্ষীণকণ্ঠে গান ধরিল 'দেহি পদপল্লবমুদারম্—'

মবারক তৎক্ষণাৎ তাহাকে একটি পদাঘাত করিলেন; সে একবার হেঁচকি তুলিয়া নীরব হইল।

এই সময় জাবালি সেখানে আসিয়া মাতাল দুইটিকে শায়িত অবস্থায় দেখিয়া, বলিলেন, 'কি হইয়াছে? ইহারা মদ্যপ দেখিতেছি। আহা, উহাদের মারিও না ছাড়িয়া দাও।'

দ্বিতীয় মাতাল একটা হাত তুলিয়া বলিল, 'Amen; বেঁচে থাক বাবাজী, তোমার দাড়ির জয়জয়কার হোক। কিন্তু বাবা, মদ্যপ বললে প্রাণে বড় ব্যথা পাব। দেবেনটা পাতি মাতাল, কিন্তু আমি—সুরাপান করিনে আমি, সুধা খাই জয়কালী ব'লে—'

দেবেন্দ্র উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, 'নিমে, চুপ কর, গানটা গাইতে দে।' বলিয়া গান গাহিবার উদ্যোগ করিল—'সুরাপান করি না আমি—'

নিমচাঁদ বাধা দিয়া বলিল, 'তুই শালা রামপ্রসাদের কি জানিস? ক্যাডাভ্যারাস্ চাষা কোথাকার। তুই মালিনী মাসীর গান গা।'

গোরা বলিল, 'চোপরও। অভয়া, এ দুটোকে নিয়ে কি করি বল তো?'

অভয়া এতক্ষণে বেশ প্রকৃতিস্থ হইয়াছিল; হাসিয়া বলিল, 'ছেড়ে দিন। আচমকা ভয় পেয়েছিলুম, নইলে ভয় পাওয়া আমার স্বভাব মনে করবেন না যেন, গোরবাবু। তা ছাড়া, মাতালের অভিজ্ঞতাও আমার জীবনে কম হয়নি।'

জাবালি বলিলেন, 'বৎসে অভয়া, তোমার প্রস্তাব আমি সম্পূর্ণ অনুমোদন করি। কারণ, আমি দেখিতেছি, সুরাসক্ত হইলেও ইহারা কিয়ৎ পরিমাণে সংস্কার-মুক্ত হইয়াছে। সুতরাং ইহারা বিশেষ করিয়া তোমার দয়ার পাত্র।'

অভয়া ভক্তিভরে জাবালির পদধূলি লইয়া বলিল, 'প্রভু, আপনার বাণীই আমার জীবনের শান্তি। সংস্কার থেকে মুক্তি কখনো পাব কি না জানি না, কারণ, দেখতে পাই একটা সংস্কার ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে তার বিপরীত সংস্কারটা ঘাড়ে চেপে বসে। কিন্তু সেই পথেই চলেছি।

জাবালি বলিলেন, 'সেই পথেই চল। উহাই একমাত্র পথ—অন্য পন্থা নাই।'

অভয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'দেবী হিন্দ্রলিনীকে দেখছি না? তিনি কোথায়?'

হিন্দ্রলিনীর নাম শুনিবামাত্র জাবালির মুখে দুঃখের ছায়া পড়িল, চক্ষু বাষ্পাচ্ছন্ন হইল। তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, 'হিন্দ্রলিনী নাই—তিনি স্বর্গতা।' বলিয়াই সচকিতভাবে চতুর্দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'কিন্তু সেজন্য আমার কোনও দুঃখ নাই। যবচূর্ণ খাসিতে ঈষৎ ক্লেশ হয় বটে, কিন্তু তাহা যৎসামান্য। আমার মেষপাল লইয়া আমি পরম সুখে আছি।' বলিয়া মদনমণ্ডল প্রফুল্ল করিবার চেষ্টা করিলেন।

মবারক পাশে দাঁড়াইয়া শুনিতেছিলেন। তিনি মৃদু হাসিয়া মুখ ফিরাইয়া লইলেন।

ইতিমধ্যে, বোধ করি মাতালের গণ্ডগোলে আকৃষ্ট হইয়াই, অনেকগুলি নরনারী পাহাড়তলি হইতে বাহির হইয়া ঘটনাস্থলের দিকে অগ্রসর হইতেছিল। তাহাদের সকলকে চিনিতে পারিলাম না, কয়েকজনকে আন্দাজে চিনিলাম। একজন আধপাগলা-গোছের লোক একটা ভাঙা বেহালা লইয়া অনবরত তাহাতে ছড় চালাইতেছিল, কিন্তু বেহালায় আওয়াজ বাহির হইতেছিল না। মূর্তিমতী ইন্দ্রানীর মত একটি নারী, মুখে গাম্ভীর্য বুদ্ধি ও সৌন্দর্যের অপূর্ব সম্মিলন—মন্থর পদে আসিতে আসিতে পিছু ফিরিয়া ডাকিল, 'চারু!'

তাহাকে চিনিতে বিলম্ব হইল না। এমন আরও অনেক নরনারী আসিল, কাহাকেও দেখিয়াই চিনিলাম, কেহ চেনা-অচেনার সংশয়ময় সন্ধিস্থলে রহিয়া গেল।

দুই তরুণী হাত-ধরাধরি করিয়া নিঃশব্দে সকলের সঙ্গে যোগদান করিয়াছিল, কেহ তাহাদের লক্ষ্য করে নাই। দুজনেই শ্যামবর্ণ কৃশাঙ্গী—চেহারাও প্রায় একই রকম। বিনয়ের পাশ দিয়া যাইবার সময় মুখ তুলিয়া তাহাদের প্রতি চাহিয়া মৃদু হাসিল, বলিল, 'ব্যাপার কি? একেবারে যুগল রূপ যে!'

বুঝিলাম, দুটিই লতিকা। একটি বিনয়ের, অন্যটি শেখরের।

বিনয়ের লতিকা মুখ টিপিয়া হাসিল, উত্তর দিল না। গোরার কাছে গিয়া নিম্নস্বরে বলিল,—'গোরবাবু, সুচিদিদি আপনাকে ডাকছেন। এদিকে কিসের গোলমাল হচ্ছে, তাই ডেকে পাঠালেন।'

গোরা বলিল, 'যাচ্ছি। কিন্তু তার আগে—'

গোরা সাঁড়াশির মত আঙুল দিয়া নিমচাঁদ ও দেবেন্দ্র দত্তকে ঘাড় ধরিয়া তুলিল, বলিল, 'চল।'

নিমচাঁদ বলিল, 'নিজে থেকেই যাচ্ছি বাবা···গলাটিপে দিচ্ছ কেন? ওটা যে বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে! To gild refined gold, to paint the lily, to throw a perfume on the violet···'

খট্ খট্! খট্ খট্! একটা বেসুরো শব্দ সকলে চমকিয়া মুখ তুলিয়া দেখিল, একজন বৃদ্ধ মুসলমান একটা লাঠি কাঁধে ফেলিয়া পাগলের মত ছুটিয়া আসিতেছে। এবং বিকৃত উত্তেজিত কণ্ঠে বার বার কি একটা বলিতেছে।

সকলে চিত্রার্পিতের মত দাঁড়াইয়া রহিল; মোহগ্রস্ত বৃদ্ধ লাঠি কাঁধে তাহাদের প্রদক্ষিণ করিতে করিতে চীৎকার করিতে লাগিল, 'তফাত যাও! তফাত যাও! সব ঝুট হ্যায়!'

ক্রমশ পাগলা মেহের আলির কণ্ঠস্বর আমার কর্ণে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া মিলাইয়া গেল। আমার সম্মুখে যে দৃশ্য অভিনীত হইতেছিল, তাহাও অল্পে অল্পে ফিকা হইয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। কেবল কানের কাছে সেই উৎকট খট্ খট্ শব্দ প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল।

* * * *

টেবিল হইতে মাথা তুলিয়া দেখি, বহির্দ্বারের কড়া সজোরে নাড়িতেছে। চোখ রগড়াইয়া উঠিয়া পড়িলাম।

গৃহিণী থিয়েটার দেখিয়া বাড়ি ফিরিয়াছেন।

গোপন কথা

প্রথম নাতনী হইয়াছে, তাহাকেই দেখিবার জন্য ট্রেনে চড়িয়া বহুদূরের পথে যাত্রা করিয়াছিলাম।

প্রথম নাতনী হইলে মনের ভাব কেমন হয়, তাহার বর্ণনা করিব না। সুহৃদয় তারাশঙ্কর সম্ভবত তাঁহার স্বীয় মনঃসমীক্ষণের ফল সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছেন,—পঞ্চদশ বৎসর পরে তাঁহার নাতনীটি পঞ্চদশ বৎসরের হইবে, এই সুমধুর ভবিষ্যতের কথা ভাবিয়া তিনি বিভোর, ইহা আমরা জানি; সুতরাং অলমিতি।

ট্রেনে অর্ধেক পথ অতিক্রম করিয়াছি, এখনও অর্ধেক বাকি। একটা বড় স্টেশনে গাড়ি থামিয়াছিল; আমি বোধকরি নবীনা নাতনীর কথা ভাবিতে ভাবিতে একটু আচ্ছন্নের মত হইয়া পড়িয়াছিলাম, পাশের প্ল্যাটফর্মে উল্টা দিক হইতে একটা গাড়ি আসিয়া থামিতে সচেতন হইয়া উঠিলাম।

দুই গাড়ির মধ্যে হাত দুই আড়াই ব্যবধান। জানালা দিয়া মুখ বাড়াইতেই

ও-গাড়ির জানালায় একটি মহিলার সঙ্গে চোখাচোখি হইয়া গেল। যুবতী নয়, বয়স চল্লিশ পার হইয়া গিয়াছে; ভারিভুরি গড়ন। কিন্তু মুখ হইতে যৌবনের কমনীয়তা সম্পূর্ণ মুছিয়া যায় নাই। শাড়ির চওড়া লাল পাড় কাঁধের উপর খসিয়া পড়িয়া তাঁহার মুখটিকে যেন অপরাহ্নের অস্তরাগে মণ্ডিত করিয়া দিয়াছে। ও-গাড়ির ভিতর দিকে বোধ হয় আরও দুই-চারিটি স্ত্রীলোক ছিলেন, কিন্তু আমার চোখে তাঁহারা অস্পষ্ট পশ্চাৎপটের মত আবছায়া হইয়া রহিলেন; আমি কেবল এই মহিলাটির দিকে বিস্ফারিত চক্ষে চাহিয়া রহিলাম।

তিনি প্রথমটা মুখ ফিরাইয়া লইয়া, আবার যেন দ্বিগুণ আগ্রহভরে আমার মুখের পানে চাহিলেন। দুইজন অপরিচিত প্রৌঢ়া নির্লজ্জ উৎকণ্ঠায় পরস্পর মুখের পানে তাকাইয়া আছি। কিন্তু সত্যই কি অপরিচিত? তাঁহার অধরোষ্ঠ ঈষৎ খুলিয়া গেল; দেখিলাম, সম্মুখের দুইটি দাঁতের মধ্যে একটি অপরটির উপর সামান্য অনধিকার অভিযান করিয়াছে।

পঁচিশ বৎসরের রুদ্ধ কবাট মুহূর্তে খুলিয়া গেল; একসঙ্গে অনেকগুলো কথা হুড়মুড় করিয়া কণ্ঠ দিয়া বাহির হইতে চাহিল, কিন্তু কোনটাই বাহির হইতে পাইল না। এই সময় হেঁচকা দিয়া আমার গাড়ি ছাড়িয়া দিল।

ক্ষণকাল জড়বৎ বসিয়া রহিলাম, তারপর জানালা দিয়া গলা বাড়াইয়া চীৎকার করিয়া বলিলাম গোপন কথা!

তিনি তখন দূরে সরিয়া যাইতেছেন; দেখিলাম, শাড়ির লালপাড় আঁচলটা মাথায় তুলিয়া দিয়া তিনি মুখ বাড়াইয়া হাসিলেন, তারপর সঙ্কেত-ভরা একটি তর্জনী তুলিয়া ঠোঁটের উপর রাখিলেন। পঁচিশ বছরের পুরানো একটি দিন চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল। এই হাসি ও সংকেতের মর্ম আমরা দুইজন ছাড়া পৃথিবীতে আর কেহ জানে না।

গোপন কথা। একটি নবীন যুবক ও একটি সম্পূর্ণ অপরিচিতা নবযুবতীর মধ্যে একদিন একটি নির্জন স্থানে কিছু গোপন কথার বিনিময় হইয়াছিল। নিন্দনীয় কথা নয়, জানিতে পারিলে পুলিসে বাঁধিয়া লইয়া যাইবে এমন কথা নয়—তবু গোপন কথা। শতাব্দীর একপাদ ধরিয়া এই কথাটি বুকের মধ্যে লুকাইয়া রহিয়াছে; ইহজীবনে যে নারীটির সহিত সর্বাপেক্ষা নিবিড়তম ঘনিষ্ঠতা হইয়াছে, তাঁহার কাছেও কোনদিন প্রকাশ করি নাই। পাঠকের হয়ত কৌতুহল হইতেছে, কি এমন গোপন কথা। কিন্তু বলিব না। হয়তো তাহার মধ্যে একটু অম্লমধুর কৌতুকের রস ছিল। হয়তো যৌবনের অর্থহীন চপলতা ছাড়া তাহাতে আর কিছুই ছিল না। তবু বলিতে পারিব না,—এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যিনি এই গোপন কথার অংশভাগিনী ছিলেন, যিনি এইমাত্র চকিতের জন্য দেখা দিয়া কোন অজানা নিরুদ্দেশের অভিমুখে চলিয়া গেলেন, যাঁহার সহিত ইহজীবনে বোধ হয় আর কখনও চোখাচোখি হইবে না, তিনিও এই কথা সযত্নে অতি সন্তর্পণে সকলের নিকট হইতে লুকাইয়া রাখিয়াছেন; যে পুরুষটির সহিত তাঁহার সর্বাপেক্ষা অধিক ঘনিষ্ঠতা হইয়াছে, তাঁহাকেও একটি কথা বলেন নাই।

মনটা কিছুক্ষণ পূর্বে দূর ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখিতেছিল, এখন দূরতর অতীতের পানে ফিরিয়া চলিল। কি আশ্চর্য এই মানুষের মন! শুধু অতীত আর ভবিষ্যৎ

লইয়াই কি তাহার অস্তিত্ব ? বর্তমান কতটুকু ? স্মৃতি ও আকাঙ্ক্ষার মাঝখানে দ্রুত সরলমান একটি বিন্দু। তাহাকে ধরিয়া রাখিবার উপায় নাই, এক ফোঁটা পারার মত কেবলই সে পিছলাইয়া হাতের বাইরে চলিয়া যায়, ধাবমান ট্রেনের জানালা দিয়া দৃষ্ট নিসর্গের মত মুহূর্তে সম্মুখ হইতে পশ্চাতে অদৃশ্য হয়—

আমার নাতনী যখন পনেরো বছরের হইবে, তখন তাহার কানে কানে আমার গোপন কথাটি বলিব কি ? না, বলিব না। অতীতের এই সামান্য কথাটি ভবিষ্যতের কাছে চিরদিনের জন্য অকথিত থাকিয়া যাইবে। এইখানেই আমাদের গোপন কথার পরম পরিপূর্ণতা।

* * * *

স্থানটি লোকালয় হইতে দশ-বারো মাইল দূরে। পাহাড় আছে, ভগ্নস্তূপ আছে, একটি মুখরস্রোতা গিরিনির্ঝরিণী আছে—আর আছে তন্দ্রানিবিড় মুগ্ধ নির্জনতা। একদিন ফাল্গুনের আরম্ভে একটি কবোষ্ণ দ্বিপ্রহরে বাইসিক্লে আরোহণ করিয়া একাকী এই স্থানে বেড়াইতে গিয়াছিলাম।

স্থানটি বড় ভালো লাগিয়াছিল। সুদূর অতীত যেন কর্মক্লান্ত বৃদ্ধার মত সংসারের কাজ শেষ করিয়া একান্তে বসিয়া ঝিমাইতেছে ; আর তাহার কর্ম নাই, কর্মে আসক্তিও নাই, হয়তো তাহার স্বপ্নের মধ্যে পুরাতন স্মৃতি ছায়ার মতো আনাগোনা করে। ভাঙা পাথরের ভূমিশয়ান মূর্তির উপর দিয়া শিকারসন্ধানী বন্য গিরগিটি যখন সরসর করিয়া ছুটিয়া যায়, বুড়ী তন্দ্রার মধ্যে একটু উশখুশ করে।

কিন্তু সেদিন আমার মনে ঐতিহ্যের রস ভাল করিয়া জমিতে পায় নাই। তাহার প্রধান কারণ, দুইটা কোকিল ভগ্নস্তূপের দুই প্রান্তের কোন পল্লবপুঞ্জে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া তর্ক আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল। একটি তার্কিকের মেজাজ কিছু কড়া, অপরটি মৃদু ব্যঙ্গপ্রিয়। একজন যতই মোলায়েম সুরে ব্যঙ্গ করিতেছিল, অন্যটি ততই ঝাঁঝিয়া উঠিয়া রূঢ়কণ্ঠে জবাব দিবার চেষ্টা করিতেছিল। কি লইয়া তর্ক তাহা অনুমান করিতে পারি নাই, কিন্তু লক্ষ্যহীনভাবে এদিক ওদিক ঘুরিতে ঘুরিতে ঈষৎ কৌতুকের সহিত মনে হইয়াছিল, বুড়ী কাজ শেষ করিয়া যতই ঝিমাক, পৃথিবীতে যৌবন, বসন্ত ও কোকিলের কাজ কোনও দিনই শেষ হইবে না।

তার্কিকদের তর্ক ক্রমশ উষ্ণতর হইয়া উঠিতেছিল। হঠাৎ এক সময় একটা ভাঙা মন্দিরের মোড় ঘুরিয়া দেখিলাম, ব্যঙ্গপ্রিয় কোকিলটি পাখী নয়—একটি মেয়ে। তাহার কণ্ঠনিঃসৃত কুহুধ্বনি আমাকে দেখিয়া অর্ধপথে থামিয়া গেল।

মেয়েটি মন্দিরের দেয়ালে পিঠ দিয়া পা ছড়াইয়া বসিয়া আছে ; আমার পানে অবাক হইয়া কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল, তারপর বলিল, 'আপনি কোথা থেকে এলেন ?'

আমিও কম অবাক হই নাই। তাহার বয়স ষোল কি সতেরো ; দীঘল তন্বী, মুখখানি মোমের মত সুকুমার, গলাটি মিষ্ট, কিন্তু কোকিলের গলা যে অবিকল নকল করিতে পারে, তাহার গলা সম্বন্ধে অধিক বলাই বাহুল্য। আমি বলিলাম, 'আমি ভেবেছিলাম আপনি কোকিল।'

সে হাসিল। সম্মুখের একটি দাঁতের উপর অন্য দাঁতটি একটু অনধিকার অভিযান করিয়াছে, তাহা লক্ষ্য করিলাম। সে মৃদু সরল কণ্ঠে বলিল, আপনি বুঝি অন্য কোকিলটা ?'

সত্যকার অন্য কোকিলটা অপর পক্ষের সাড়া না পাইয়া থামিয়া গিয়াছিল, এখন সহসা বিজয়োৎফুল্ল কণ্ঠে কয়েকবার দ্রুতচ্ছন্দে ডাকিয়া উঠিল, কু-কু-কু-কু-কু—

দুইজনে একসঙ্গে হাসিয়া উঠিলাম।

তারপর ভাব হইতে বিলম্ব হয় নাই। এত শীঘ্র এত ভাব হইয়া গিয়াছিল কি করিয়া এখন ভাবি। এ দেশটা বিলাত নয়, অন্তত তখনও বিলাত হইয়া উঠে নাই। অনাত্মীয়া যুবতীর সহিত নির্জনে আলাপ করিবার অভ্যাসও ছিল না। অথচ মুহূর্তের জন্যও বাধোবাধো ঠেকে নাই। বালক-বালিকা যেমন সহজ প্রীতির সহিত কিছুমাত্র আত্মসচেতন না হইয়া পরস্পর মিলিত হয়, আমরাও তেমনি মিলিত হইয়াছিলাম। তাহার নাম তটিনী; সে সপরিবারে এখানে বেড়াইতে আসিয়াছে; আর সকলে দুই মাইল দূরে আর একটা ভগ্নস্তূপ পরিদর্শন করিতে গিয়াছেন. তটিনী কিন্তু অনর্থক ঘুরিয়া বেড়ানোর চেয়ে এখানে বসিয়া কোকিলের সহিত কলহ অধিক উপাদেয় মনে করিয়াছে—এসব কথা পরিচয়ের আরম্ভেই জানিতে পারিয়াছিলাম। আমিও পরিচয় দিতে কার্পণ্য করি নাই।

সেদিন বসন্তের বাতাস আতপ্ত আলিঙ্গনে আমাদের জড়াইয়া লইয়াছিল। কোকিল তা ডাকিয়াছিলই; কয়েকটা নবজাত প্রজাপতি চারিপাশে নাচিয়া নাচিয়া অকারণ চটুলতা প্রকাশ করিয়াছিল। কিন্তু সেদিনকার স্মৃতির মঞ্জুষায় যে কথাটি আজও আমার মনে আনন্দের প্রভা বিকিরণ করিতেছে তাহা এই যে বসন্ত আমাদের জয় করিয়া লইয়াছিল বটে, কিন্তু বসন্তসখার দেখা সেদিন পলকের জন্যও পাই নাই। বাঙালীর স্বর্গে কৌতুকের কোনও দেবতা আছেন কি না জানি না; সম্ভবত আছেন, কারণ তিনিই সেদিন আমাদের যৌবনযজ্ঞে পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন।

দুইজনে ছুটাছুটি করিয়াছিলাম, লুকোচুরি খেলিয়াছিলাম; নির্ঝরিণীর ধারে পাশাপাশি হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া অঞ্জলি ভরিয়া জলপান করিয়াছিলাম। এমন স্বাদু ও এত শীতল জল আর কখনও পান করি নাই। সেই ঝরনার জলের স্বাদ আজও আমার মুখে লাগিয়া আছে।

ক্রমে বিদায়ের কাল উপস্থিত হইয়াছিল।

'আপনি এবার চলে যাবেন?'

'হাঁ। দূরে গলার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি। ওঁরা এসে পড়বার আগেই চ'লে যাই। নইলে আজকের এই নিখুঁত দিনটার ওপর দাগ পড়ে যাবে।—আচ্ছা, চললুম।'

অকপট সৌহার্দ্যে তাহার পানে হাত বাড়াইয়া দিয়াছিলাম। সে আমার হাতখানা দুইহাতে তুলিয়া আমার মুখের পানে চাহিয়াছিল।

'আর কখনও আমাদের দেখা হবে না?'

'সম্ভব নয়। কিন্তু এই ভাল।'

'হ্যাঁ। আজকের দিনটা আমার অনেক দিন মনে থাকবে।'

হঠাৎ মাথায় একটা বুদ্ধি আসিল।

'এস, এক কাজ করি। তা হ'লে কেউ কাউকে ভুলব না। আমি তোমাকে আমার একটি গোপন কথা বলি, তুমি আমাকে একটি গোপন কথা বল। কিন্তু শপথ রইল, কেউ কোনদিন আর কারুর কাছে এ কথা বলব না।'

সে ক্ষণকাল ভাবিয়াছিল, ভাবিতে ভাবিতে তাহার চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল
'আচ্ছা।'

আমি তাহার কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া একটি গোপন কথা বলিয়াছিলাম—শুনিয়া সে চকিত সকৌতুক দৃষ্টিতে আমার পানে চাহিয়াছিল। তারপর একটু হাসিয়া একটু লাল হইয়া আমার কানে কানে তাহার গোপন কথাটি বলিয়াছিল।

সে দাঁড়াইয়া রহিল, আমি চলিয়া গেলাম। কিছুদূর গিয়া একবার ফিরিয়া দেখিলাম। সে একটু হাসিয়া ঠোঁটের উপর আঙুল রাখিল।

বহুরূপী

এটা বরদার গল্প হইলে কখনই বিশ্বাস করিতাম না। কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, ব্যাপারটা আমার চোখের সম্মুখেই ঘটিয়াছিল, সুতরাং হাসিয়া উড়াইয়া দিবার আর পথ নাই। যদিও বরদা মূলত এই ঘটনার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিল, তবু এত বড় ভোজবাজি তাহার মত মিথ্যাবাদীর পক্ষেও অসম্ভব বলিয়া মনে করি।

গত শীতকালে বরদার মস্তকে হঠাৎ বিষয়বুদ্ধি চাগাড় দিয়া উঠিয়াছিল। শহর হইতে মাইল পনেরো দূরে—বেহারের গ্রাম্য ভাষায় যাহাকে দেহাত বলে, সেই অজ পাড়াগাঁয়ে বরদার কিছু ধান-জমি ও কয়েক ঘর কায়েমী প্রজা ছিল। এতকাল ফৌজদার সিং নামক জনৈক শিশোদীয় বংশীয় রাজপুত এই সকল বিষয়সম্পত্তির তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত ছিলেন; কিন্তু হঠাৎ বরদা শিশোদীয় রাজপুতের সততা সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া স্বয়ং দুর্জয় শীতে ধান কাটাইবার জন্য প্রস্থান করিল। দশ দিনের মধ্যে তাহার আর কোন খবরই পাওয়া গেল না।

প্রত্যহ সন্ধ্যার পর ক্লাবে বসিয়া অনর্গল মিথ্যা কথা না বলিলে যাহার স্বাস্থ্য খারাপ হইয়া যায়, সঙ্গীহীন পাড়াগাঁয়ে তাহার এই দীর্ঘ প্রবাস কি করিয়া কাটিতেছে—এই প্রশ্ন আমাদের উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিল। সেখানে বরদা কাহাকে আষাঢ়ে গল্প শুনাইতেছে? আমরা ভাবিয়াছিলাম, দুদিন যাইতে না-যাইতেই সে পলাইয়া আসিবে। কিন্তু এ কি! দশ দিন কাটিয়া গেল, এখনও তাহার দেখা নাই। তাহার বাড়িতে অনুসন্ধান করিয়া জানা গেল, বরদা নিজের কাছারি-বাড়িতে পরম সুখে কালাতিপাত করিতেছে, শীঘ্র গৃহে ফিরিবার ইচ্ছা নাই; ধান কাটানো যে কিরূপ আনন্দদায়ক কার্য তাহাই উচ্ছ্বসিত ভাষায় বর্ণনা করিয়া লম্বা চিঠি লিখিয়াছে। শুনিয়া আমরা স্তম্ভিত হইয়া গেলাম।

অমূল্য বলিল, 'ধান-টান সব মিছে কথা, যা হয়েছে আমি বুঝেছি। বরদার বউ ওকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। বঙ্গমহিলা হ'লেও ধৈর্যের একটা সীমা আছে তো!'

তা সে কারণ যাহাই হোক, বরদার অভাবে ক্লাবের সান্ধ্য অধিবেশনগুলি নিঃঝুম ও ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িতে লাগিল। বরদা যতই মিছা কথা বলুক, সে একজন সত্যকার মজলিসী লোক, তাহা ক্রমশ সকলেই হৃদয়ঙ্গম করিতে লাগিলাম; এমন কি অমূল্যকে দেখিয়াও মনে হইতে লাগিল, তর্ক করিবার একজন প্রতিপক্ষের অভাবে

সে ভিতরে ভিতরে বিশেষ মুষড়িয়া পড়িয়াছে।

অবশেষে চৌদ্দ দিনের দিন বরদার এক চিঠি আসিল; তাহার বাড়ির চাকর রঘুয়া সন্ধ্যাবেলা চিঠিখানা ক্লাবে দিয়া গেল। ক্লাবের সভ্যগণকে সম্বোধন করিয়া বরদা চিঠি দিয়াছে; পাঠ করিয়া তাহার দীর্ঘ অজ্ঞাতবাসের যথার্থ কারণ অজ্ঞাত রহিল না। বরদা লিখিয়াছে—

'বন্ধুগণ, তোমরা প্রেতযোনিতে বিশ্বাস কর না; আমি কাল্পনিক ভূতের গল্প বানাইয়া বলি—এরূপ ইঙ্গিতও মাঝে মাঝে করিয়া থাক। তোমাদের মত অন্ধ নাস্তিকের বিশ্বাস জন্মাইতে প্রত্যক্ষ প্রমাণ চাই। তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি, নিজের চোখে ভূত দেখিতে চাও? স্বকর্ণে ভূতের কথা শুনিতে চাও? ভূতের সহিত করকম্পন করিতে চাও?'

আমি এখানে আসিবার পর আমার কাছারি-বাড়িতে একটি অশরীরী আত্মার সহিত পরিচয় হইয়াছে। অত্যন্ত মিশুকে লোক, প্রত্যহ অনেক রাত্রি পর্যন্ত আমাদের গল্প-গুজব আলাপ-আলোচনা হয়। তিনি তোমাদের সহিত আলাপ করিতে রাজী হইয়াছেন। যদি তোমাদের আপত্তি না থাকে, সকলে মিলিয়া এখানে চলিয়া এস। এক রাত্রি থাকিলেই চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হইবে।

কবে আসিতেছ জানাইও। এখানে আসিতে হইলে তারাপুর পর্যন্ত বাসে আসিতে হয়, সেখান হইতে আমার আস্তানা পদব্রজে আড়াই মাইল। রাস্তা ঘাট নাই বটে, কিন্তু এ সময়ে কোনও কষ্ট হইবে না। তারাপুর থানায় খোঁজ লইলে সেখানকার চৌকিদার পথ দেখাইয়া দিবে। ইতি।

তোমাদের "বরদা"

চিঠি পড়িয়া অমূল্য বলিল, 'হুঁ, এই চৌদ্দ দিন জিরিয়ে নিয়েছে কিনা, একটা বড় রকম বুজরুকি দেখাবে।'

আমি বলিলাম, 'কিন্তু ভূতের সঙ্গে করকম্পনটা হবে কি ক'রে?'

পৃথ্বী বলিল, 'সেটা যথাস্থানে পৌঁছে পরীক্ষা ক'রে দেখা যাবে। তা হ'লে কবে যাওয়া স্থির করছ?

গবেষণার পর স্থির হইল—আগামী মঙ্গলবার আমি, অমূল্য, পৃথ্বী ও চুনি এই চারজন পূর্বাহ্ণে কোনও খবর না দিয়াই বরদার আড্ডায় গিয়া হানা দিব। বড় দিনের ছুটি আসিয়া পড়িয়াছে, প্রেতাত্মার সহিত করকম্পনের মহাসৌভাগ্য যদি নাও ঘটে, তবু একটা আউটিং তো হবেই। ওদিকটাতে শিকারও ভাল পাওয়া যায়।

*   *   *   *

নির্দিষ্ট দিনে আমরা চারিজন বৈকাল আন্দাজ সাড়ে তিনটার সময় বাস হইতে অবতরণ করিয়া হাঁটা-পথ ধরিলাম। ধানক্ষেতের আলের উপর দিয়া যাহাদের চলা অভ্যাস নাই তাহাদের পক্ষে এই পথে পদক্ষেপ সর্বদা নিরুদ্বেগ নয়,—মাঝে মাঝে অতর্কিতভাবে পথিপাশ্বস্থ পঙ্কশয্যায় বিশ্রাম করিবার সুযোগ ঘটিয়া যায়। কিন্তু সে যাহাই হোক, আড়াই মাইল পথ যে এত দীর্ঘ হইতে পারে, তাহা পূর্বে কখনও ভাবিতে পারি নাই। অমূল্য শ্লেষ করিয়া বলিল, মাইলগুলো সম্ভবত ভৌতিক মাইল, তাই তাদের আদি অন্ত খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না।

এই অতি-প্রাকৃত আড়াই মাইলের শেষে যখন বরদার আস্তানায় আসিয়া

পেঁীছলাম, তখন পৃথিবীপৃষ্ঠে দিনের আলো আর নাই, কেবল পশ্চিম আকাশে শীর্ণ সন্ধ্যালোক মুমূর্ষু প্রাণশক্তির মত নির্বাণোন্মুখ হইয়া আসিতেছে।

চারিদিকে কোথাও মানুষের বসতি নাই, আবছায়া ধানক্ষেতের মাঝখানে বিঘাখানেক পতিত জমি, তাহারই এক প্রান্তে একটি জীর্ণ ইটের ঘর—চারিপাশে অপরিসর একটু বারান্দা, মাথার উপর খড়ের ছাউনি। পতিত জমির উপর স্থানে স্থানে খড়ের স্তূপ রাখা আছে। প্রথমটা লোকজন কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না, ঠিক স্থানে পেঁীছিয়াছি কি না—সন্দেহ হইতে লাগিল। অনতিদূরে একটা শিকলে-বাঁধা কুকুর কুণ্ডলী পাকাইয়া শুইয়া ছিল, কাছে গিয়া দেখিলাম, বরদার কুকুর খোক্কস।—খোক্কসের সহিত আমাদের প্রণয় ছিল, কিন্তু সে বিশেষ উৎসাহ প্রদর্শন করিল না, নিদ্রালুভাবে একবার তাকাইয়া আবার থাবার মধ্যে মুখ গুঁজিয়া ঘুমাইতে লাগিল।

কিন্তু বরদা কোথায়? ঘরের মধ্যে আলো জ্বলিতেছে না। এদিক ওদিক চাহিতে দেখি, খড়ের একটি গাদার তলা হইতে হামাগুড়ি দিয়া একটি প্রাণী বাহির হইয়া আসিতেছে। মূর্তিটি ক্রমে খাড়া হইয়া আমাদের সম্মুখে আসিয়া ফৌজী সেলাম করিয়া দাঁড়াইল। প্রথমটা ভাবিয়াছিলাম, বুঝি বরদার শিশোদীয় বংশীয় রাজপুত, কিন্তু দেখিলাম—তাহা নয়, নেপাল হইতে অবতীর্ণ চন্দ্রবংশীয় একজন ক্ষত্রিয়, সম্ভবত বরদার দেউড়ি পাহারা দিবার জন্য নিযুক্ত হইয়াছেন। পরিধানে খাকি পোষাক, পায়ে বুট জুতা, কোমরে কুক্‌রি—রীতিমত যোদ্ধাবেশ। তাঁহাকে বরদার কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করায় তিনি চন্দ্রবংশীয় ভাষায় যাহা বলিলেন তাহার বিন্দু-বিসর্গও বুঝিতে পারিলাম না।

শীতে এতখানি পথ হাঁটিয়া শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল; আমরা আর বাক্যব্যয় না করিয়া ঘরের দিকে অগ্রসর হইলাম। চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় নির্বিকার মুখে আবার খড়ের গাদার মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

আমরা যেখানে ছিলাম, সেখান হইতে ঘরটি বোধ করি ত্রিশ কদম দূরে। বারান্দাসুদ্ধ ঘরের ভিত মাটি হইতে হাত দুই উঁচুতে অবস্থিত। বারান্দায় উঠিয়া সম্মুখেই ঘরের দ্বার; আমি সর্বপ্রথম উপরে উঠিয়া দ্বারের দিকে পা বাড়াইয়া চমকাইয়া উঠিলাম। অন্ধকারে দরজার মুখে কে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

পরক্ষণেই বরদা সশব্দে হাসিয়া উঠিল, বলিল, 'এস। খবর না দিয়ে এলে যে? আমাকে বিশ্বাস করতে পারলে না?'

আমরা ঘরে প্রবেশ করিলাম। বরদা একটা তেলের ল্যাম্প জ্বালিয়া টেবিলের উপর রাখিল।

অমূল্য ঈষৎ বিরক্তির স্বরে বলিল, 'ঘরেই ছিলে তো—সাড়া দিচ্ছিলে না কেন? দেয়ালা হচ্ছিল বুঝি?'

উত্তরে বরদা কেবল হাসিল। বলিল, 'বসো সবাই। শীতে নিশ্চয় কালিয়ে গিয়েছে। চা তৈরী আছে দিচ্ছি।' বলিয়া প্রকাণ্ড একটা থার্মোফ্লাস্ক হইতে ধূমায়িত চা ঢালিয়া সকলকে দিতে লাগিল।

চা খাইতে খাইতে বরদার ঘরের চতুর্দিকে চক্ষু ফিরাইয়া দেখিতে লাগিলাম। ঘরের কোথাও এতটুকু প্লাস্টার নাই, নোনা-ধরা লাল ইঁটগুলি সারি সারি দাঁত

বাহির করিয়া আছে ; মেঝে মাটির, গোময় দিয়া লিপ্ত। এক কোণে একটি ক্ষুদ্র চারপাইয়ের উপর বরদার লেপ-বিছানা স্তূপীকৃত রহিয়াছে। আর এক কোণে একটি বড় কাঠের সিন্দুক, তাহার উপর চায়ের সরঞ্জাম স্টোভ ইত্যাদি রাখা আছে ; ঘরের মধ্যস্থলে একটি কেরোসিন কাঠের টেবিল, এবং তাহাই ঘিরিয়া কয়েকটি কঞ্চির মোড়ার উপর বসিয়া অনুজ্জ্বল ল্যাম্পের আলোয় আমরা কয়জন চা পান করিতেছি।

খোলা দরজা দিয়া ঠাণ্ডা বাতাস আসিতেছিল, বরদা সেটা বন্ধ করিয়া দিয়া আমাদের মধ্যে আসিয়া বসিল ; তৃপ্তভাবে দুই হাত ঘষিতে ঘষিতে বলিল, 'আমার ঘরটি কেমন দেখছ ? ঘর ছিল না, কেবল চারটি পুরনো দেওয়াল দাঁড়িয়ে ছিল ; আমি এসে খড়ের চাল তুলে বাসের উপযোগী ক'রে নিয়েছি।—বেশ হয় নি ?'

'খাসা হয়েছে।'

'পেয়াদা সেপাই চিরকাল বাইরে খড়ের ছাপ্পর তৈরি ক'রে তার মধ্যে থাকে ; এবারও তাই আছে। কিন্তু আমি ভাই পারলুম না। তেরপলের তলায় এক রাত্তির শুয়েছিলাম—বাপ, কি শীত। ঘরের মধ্যে একরকম ভালই আছি, ঘরটা তোমাদের বেশ ইয়ে বোধ হচ্ছে না ?'

আমরা সকলে ঘাড় নাড়িয়া সায় দিলাম। 'ইয়ে' বলিয়া বরদা ঠিক কি বুঝাইতে চাহিল জানি না, কিন্তু এই ঘরে পদার্পণ করিবার পর হইতেই আমার মনের উপর কেমন একটা ছায়া পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিল, মনের সে পরিহাস-তরল ভাব আর ছিল না। কোথায় এ ঘরের কি গলদ আছে—বুঝিতে পারিতেছিলাম না, অথচ অপরিচিত অন্ধকারে পথে চলিবার সময় যেমন চক্ষু কর্ণের তীক্ষ্ণতা অজ্ঞাতসারেই বাড়িয়া যায়, তেমনি একটা দুর্লক্ষ্য অবাস্তবতার সংশয় আমার ইন্দ্রিয়গুলিকে অতিশয় সতর্ক ও সচেতন করিয়া তুলিয়াছিল।

চায়ের পেয়ালা নামাইয়া রাখিয়া অমূল্য বলিল 'তারপর, তোমার ভূত কই ?'

বরদার হাসিমুখ আস্তে আস্তে গম্ভীর হইয়া গেল। সে যেন কয়েক মুহূর্ত উৎকর্ণ হইয়া কি শুনিল, তারপর অমূল্যর দিকে ফিরিয়া ঈষৎ ক্ষুব্ধ স্বরে বলিল, 'ভয় নেই, তাঁর পরিচয় পাবে ; মিছে তোমাদের এতদূর ডেকে আনি নি।'

চুনি জিজ্ঞাসা করিল, 'কতক্ষণে তাঁর দর্শন পাওয়া যাবে ? তাঁর আসার সময়ের কিছু স্থিরতা আছে কি ?'

বরদা বলিল, 'কিছু না ; শুধু তাই নয়, কোন্ রূপে তিনি আসবেন, তারও স্থিরতা নেই।'

আমরা মোড়া টানিয়া আরও ঘনিষ্ঠ হইয়া বসিলাম। পৃথ্বী হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, 'সেটা কি রকম ?'

বরদা বলিল, 'তিনি মানুষের রূপ ধারণ ক'রে আসেন বটে, কিন্তু চেহারা সব সময়ে এক রকম হয় না।'

'তার মানে কি ?'

'তার মানে—' বরদা যেন একটু ইতস্তত করিল, 'অশরীরী আত্মাকে স্থূল দেহ ধারণ করতে হ'লে কিছু জান্তব মালমশলার দরকার হয়, তার নাম বিজ্ঞানের ভাষায় এক্‌টোপ্লাজ্‌ম। এই এক্‌টোপ্লাজ্‌ম প্রয়োজন মত না পেলে চেহারা একটু অন্যরকম

হয়ে যায়।'

অমূল্য বলিল, ও, তোমার সেই পুরনো থিওরি। কিন্তু তোমার ইনি এক্‌টো-প্লাজ্‌ম পান কোথা থেকে?'

বরদা একটু চুপ করিয়া থাকিয়া শেষে ধীরে ধীরে বলিল, 'বোধ হয় খোক্কসের গা থেকে, তিনি যতক্ষণ থাকেন, কুকুরটা নির্জীব হয়ে প'ড়ে থাকে,—নড়ে-চড়ে না, ডাকেও না। তবে শুধু যে এক্‌টোপ্লাজ্‌মের তারতম্যে চেহারার তারতম্য হয় তা নয়, অন্য কারণও আছে।'

'অন্য কারণটি কি?'

'ইচ্ছা। প্রেতযোনি ইচ্ছা করলেই চেহারা বদল করতে পারে; কারণ তাদের দেহের উপাদান মানুষের দেহের উপাদানেব মত কঠিন বস্তু নয়।'

এই সময়ে বরদাকে একটু বিশেষভাবে লক্ষ্য করিলাম। এ কয়দিনে তাহার কি একটা পরিবর্তন ঘটিয়াছে। পরোক্ষ বিশ্বাসের গণ্ডী ছাড়াইয়া যেন সে সাক্ষাৎ উপলব্ধির দৃঢ়তর ভিত্তির উপর পা দিয়া দাঁড়াইয়াছে। তার্কিকের যুযুৎসা একেবারেই নাই, মুখে একটা নিঃসংশয় প্রসন্নতার ভাব, ঠোঁটের কোণে একটু সকৌতুক কোমলতা ক্রীড়া করিতেছে। বরদার এই অবস্থান্তরে আমার মনের ছায়াকে আরও গাঢ় করিয়া তুলিল।

পৃথ্বী বলিল,'থিওরী থাক,এখন ঘটনাগুলো বল শুনি—তোমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা কতদূর দাঁড়িয়েছে, কোথায় প্রথম সাক্ষাৎ হ'ল, ইত্যাদি। অর্থাৎ তোমাকে আগাগোড়া গল্পটা বলবার সুযোগ দিচ্ছি, আরম্ভ কর।'

বরদা একটু হাসিয়া বলিল, 'বেশ।' তারপর আবার যেন কান পাতিয়া কি শুনিল,—'দেখ, একটা কথা তোমাদের ব'লে রাখি। যদি কোনও সময় বুঝতে পার যে তিনি এসেছেন—ভয় পেয়ো না। ভয় পেলে সব নষ্ট হয়ে যাবে।'

চারিদিকে সচকিতভাবে একবার চাহিয়া আমরা আশ্বাস দিলান, ভয় পাইব না। বরদা তখন বলিতে আরম্ভ করিল—

'প্রথম যে রাত্রে এ ঘরে শুই সে রাত্রে কিছু বুঝতে পারি নি। দ্বিতীয় রাত্রে হঠাৎ এক সময় ঘুম ভেঙে গেল; শুনতে পেলুম ঘরের মধ্যে কে খস্‌খস্‌ ক'রে চ'লে বেড়াচ্ছে। দরজা বন্ধ ক'রে শুয়েছিলুম,ভাবলুম সিঁদ কেটে চোর ঢুকেছে। বালিশের তলায় টর্চ ছিল, হঠাৎ জ্বেলে ঘরের চারিদিকে ফেললুম। কেউ কোথাও নেই।

আবার আলো নিবিয়ে যেই শুয়েছি অমনই খস্‌খস্‌ শব্দ আরম্ভ হ'ল। আবার আলো জ্বালালুম। এই রকম তিন চার বার হ'ল। তারপর হঠাৎ বুঝতে পারলুম। চির জীবন এই বিষয় নিয়ে নাড়াচাড়া করেছি, তবু বুকের ভিতরটা ধড়ফড় ক'রে উঠল। আলো নিবিয়ে গলার স্বর যথাসাধ্য সংযত ক'রে বললুম, আপনি কে, আমি জানি না; কিন্তু আপনার যদি কিছু বলবার থাকে আমাকে বলতে পারেন।

মনে হ'ল, কে যেন আমার বিছানার পাশে এসে দাঁড়াল। তারপর ভাঙা ভাঙা অস্পষ্ট আওয়াজ শুনতে পেলুম—আপসি ভয় পাবেন না?

লেপের মধ্যে থেকেও হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল, বললুম, না!

তিনি মৃদু কণ্ঠে একটু হাসলেন. যেন আমার অবস্থা বুঝতে পেরেছেন। হাসি শুনে আমার মনে সাহস হ'ল; ভারি সহানুভূতিপূর্ণ নরম হাসি—একটু করুণ।

আমি বললুম, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, বসুন।

চোখে কিছুই দেখতে পেলুম না, অনুভবে বুঝলুম, তিনি আমার বিছানার পাশে বসলেন। তারপর নিশ্বাসের মত মৃদুস্বরে বললেন, আমি এই ঘরটাতে থাকি। আপনি এসে পর্যন্ত আলাপ করবার জন্য ছটফট করছি, কিন্তু পাছে আপনি ভয় পান, তাই সাহস হচ্ছিল না।

আমি কি বলব ভেবে পেলুম না; তিনি বলতে লাগলেন, এইখানে প্রায় পঁচিশ বছর আছি। ঘরটা আমিই তৈরী করিয়েছিলুম, তারপর, মৃত্যুও হল, এইখানেই। প্লেগ হয়েছিল। সৎকার করবার লোক ছিল না, মৃতদেহটা শেয়াল-কুকুরে ছেঁড়া-ছেঁড়ি করলো। সেই থেকে এ জায়গা ছেড়ে যাবার আমার উপায় নেই। একলাই থাকি। আপনি এসেছেন দেখে ভারি আনন্দ হ'ল; কারুর সঙ্গে তো মিশতে পারি না;—দুটো কথা কইবারও সুযোগ হয় না। সবাই ভয় পায়; অথচ আমি—আমরা কারও অনিষ্ট করতে চাই না—ক্ষমতাও নেই।—কেন বলুন দেখি সবাই ভয় পায়?

এ প্রশ্নের উত্তর জানি না, তাই জবাব দেওয়া হ'ল না। তিনি বললেন, আমি যদি মাঝে মাঝে এসে আপনার সঙ্গে গল্প-সল্প করি, আপনার কষ্ট হবে না তো?

আমি বললুম, না, বরং খুশি হব।

তিনি গাঢ়স্বরে বললেন, ধন্যবাদ। আচ্ছা আমাকে চোখে দেখলে কি আপনি খুব ভয় পাবেন? সত্যি বলছি, আমার চেহারা বীভৎস নয়—সাধারণ মানুষের মত।

বুকের ভেতর দুরু দুরু ক'রে উঠল, কিন্তু বললুম, ভয় পাব না।

তবে আলোটা জ্বালুন।

মনকে দৃঢ় ক'রে টর্চ জ্বাললুম। মুহূর্তের জন্য তাঁকে দেখতে পাওয়া গেল।

আমাদেরই সমবয়স্ক একটি যুবক। ময়লা রঙ, বড় বড় চুল—আগ্রহভরা চোখে আমার পানে চেয়ে আছেন। নিতান্ত সহজ মানুষের চেহারা, ভয় পাবার কিছু নেই, কিন্তু তবু বুদ্ধি-বিবেচনা কোনও কাজে লাগল না, সমস্ত অন্তরাত্মা যেন ভয়ে আঁতকে উঠল। মূর্তি সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে গেল। শুনতে পেলুম বাইরে খোক্কস কুকুরটা কান্নার মত একটা দীর্ঘ আওয়াজ ক'রে ডেকে উঠল।

বরদা চুপ করিল।

ফুসফুস হইতে অবরুদ্ধ বাষ্প মুক্ত করিয়া বলিলাম, 'তারপর?'

বরদা বলিল, 'তারপর—' সহসা উঠিয়া দাঁড়াইল, পূর্বের ন্যায় উৎকর্ণ হইয়া শুনিল, তারপর আমাদের দিকে ফিরিয়া তাড়াতাড়ি বলিল, 'সময় সংক্ষিপ্ত হয়ে আসছে—হ্যাঁ, তারপর ক্রমে ভয় কেটে গেল। এখন রোজই তিনি আসেন, অনেক কথাবার্তা হয়। তোমাদের সঙ্গে দেখা করবার জন্য তিনি খুব উৎসুক ছিলেন, কিন্তু—। আর সময় নেই—এস।' বরদা আমার দিকে প্রসারিত করতল বাড়াইয়া দিল। কিছু না বুঝিয়া তাহার সহিত শেকহ্যাণ্ড করিলাম। বরদার হঠাৎ হইল কি? আমাদের বিদায় করিতে চায় নাকি?

অমূল্য বলিল, 'কিন্তু কই, তিনি এখনও দেখা দিলেন না?'

বরদা আবার বসিয়া পড়িল, মুখের উপর দিয়া একবার হাত চালাইয়া বলিল, হয়তো দেখা দিয়েছেন, তোমরা জানতে পারনি।'

এই সময় বাহিরে দ্রুত পদধ্বনি শুনা গেল। আমরা চমকিয়া সোজা হইয়া বসিলাম। পদশব্দ বারান্দার উপরে উঠিল, তারপর বন্ধ দরজায় সজোরে ধাক্কা পড়িল। হৃদ্‌যন্ত্রটাও ওই ধাক্কার সঙ্গে সঙ্গে চমকিয়া উঠিল; আমরা প্রশ্ন বিস্ফারিত চক্ষে পরস্পরের পানে চাহিলাম—এ সময় হঠাৎ কে আসিল? তবে কি—

বরদার মুখের একটা ম্লান হাসি ক্রীড়া করিতেছিল। সে পূর্ণ চক্ষে আমার পানে চাহিয়া বলিল, 'বুঝতে পারছ না?'

আমি নীরবে মাথা নাড়িলাম।'

বরদা ব্যথিত অবসন্ন কণ্ঠে বলিল, 'এখনি বুঝতে পারবে; দোর খুলে দাও।'

দ্বার খুলিয়া দিব? কিন্তু দ্বারের ওপারে কী আছে?

আবার সজোরে ধাক্কা পড়িল; বরদা আবার চোখের নীরব ইঙ্গিতে আমাকে দ্বার খুলিয়া দিতে বলিল। আমি মোহাচ্ছন্নের মত উঠিয়া গিয়া দ্বারের হুড়কা খুলিয়া দিলাম।

অধীর হস্তে কে যেন কবাট ঠেলিয়া ঘরে প্রবেশ করিল—

বরদা!

বরদা বলিয়া উঠিল, 'আরে, তোমরা এসেছ? আমি একটা কাজে বেরিয়েছিলাম।' আমাদের মুখ দেখিয়া বরদা অর্ধপথে থামিয়া গেল।

আমরা সকলে, যে মোড়ায় বরদা বসিয়াছিল সেই দিকে ফিরিয়াছিলাম। দেখিলাম, মোড়ায় যে বসিয়াছিল সে নাই—মোড়া খালি।

এই সময় বাহিরে বরদার কুকুরটা কান্নার মত একটা দীর্ঘ একটানা সুরে ডাকিয়া উঠিল।

বরদা সেই ডাক শুনিয়া তীক্ষ্ম চক্ষে আমাদের পানে চাহিল, তারপর ব্যগ্র কণ্ঠে বলিল, 'অ্যাঁ! তবে কি—?'

আমি অতি কষ্টে গলা হইতে আওয়াজ বাহির করিলাম, 'হ্যাঁ, অতিথি সৎকারের কোনও ত্রুটি হয়নি। কিন্তু ভাই, আজ রাত্রেই আমরা বাড়ি ফিরব।'

মন্দ লোক

অ্যালোপ্যাথিক ডাক্তার, নীতিবাগীশ বৃদ্ধ ও স্তন্যপায়ী শিশুর জন্য এ কাহিনী লিখিত হয় নাই। তাঁহারা অনুগ্রহপূর্বক পাতা উল্টাইয়া যাইবেন। কারণ, অযথা রিপুর উত্তেজনা সৃষ্টি করা আমার উদ্দেশ্য নয়।

কুড়ি বৎসর আগে আমার বয়স কুড়ি বৎসর ছিল। হিসাবে বর্তমান বয়সের যে অংকটা পাওয়া যাইতেছে, তাহা ছ্যাবলামির পক্ষে অনুকূল নয়। সিদ্ধার্থ এ বয়সে পৌঁছিবার পূর্বের বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছেন, নেপোলিয়ান এ বয়সে অর্ধেক য়ুরোপের অধীশ্বর, আলেকজাণ্ডার এতদূর অগ্রসর হইতেই পরেন নাই, তৎপূর্বেই পৃথিবী জয় শেষ করিয়া ফোৎ হইয়াছেন। সুতরাং যাহা বলিতেছি, তাহা বালসুলভ চপলতা নয়। কেহ দন্ত বাহির করিয়া হাসিবেন না।

কুড়ি বৎসর বয়সেই আমি হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারিতে পসার জমাইয়া ফেলিয়াছিলাম। অ্যালোপ্যাথ ডাক্তারগণ হয়তো রাগ করিতেছেন, কিন্তু আমি জানি

ভাগ্যই সর্বত্র বলবান—পসার এবং পত্নী পূর্বজন্মার্জিত ; পৌরুষ বা বিদ্যার বলে তাহাদের সংগ্রহ করা যায় না। যদি যাইত পি. সি. ও বি. সি. রায় অদ্যাপি অনূঢ় কেন।

আরম্ভে অনেকগুলি বড় বড় লোকের নাম করিয়া গল্পটাকে শোধন করিয়া লইলাম, সঙ্কোচও অনেকটা কাটিয়াছে। অতএব এবার শুরু করিতে পারি।

ছোট একটি শহরে ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছিলাম। তখনও বিবাহ করি নাই; ছোট একটি বাসায় একাকী থাকিতাম, স্বপাক আহার করিতাম এবং 'বিষস্য বিষমৌষধম্' এই তত্ত্ব ফলত সার্থক করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতাম। সকাল বিকাল আমার ছোট ঘরটি নানা জাতীয় রোগীতে ভরিয়া যাইত; অধিকাংশই গরীব, রোগের লক্ষণ বলিয়া অল্প মূল্যে ঔষধ কিনিয়া লইয়া যাইত। কদাচিৎ দুই একটি সম্পন্ন ব্যক্তির বাড়ি হইতে ডাক পাইতাম। মোটের উপর ভালভাবেই চলিতেছিল; টাকা যত না হউক সুনাম অর্জন করিয়াছিলাম।

একদিন সকালবেলা রোগীর ভিড় হালকা হইয়া গেলে লক্ষ্য করিলাম ঘরের কোণে একটি স্ত্রীলোক একখানা ময়লা চাদর মুড়ি দিয়া বসিয়া আছে। ঘর যখন একেবারে খালি হইয়া গেল, তখন সে আস্তে আস্তে উঠিয়া জোড়হাতে আমার চেয়ারের পাশে দাড়াইল।

সপ্রশ্ন চক্ষে তাহার পানে চাহিলাম। অধিকাংশ রোগীই আমার পরিচিত, কিন্তু ইহাকে পূর্বে দেখি নাই। বয়স বোধ করি বছর চল্লিশ, থলথলে মোটা গড়ন; মুখের বর্ণ এককালে ফরসা ছিল, এখন মেছেতা পড়িয়া বিশ্রী হইয়া গিয়াছে। চিবুকের উপর অস্পষ্ট উল্কির দাগ, একটা কানের গয়না পরিবার ছিদ্র ছিঁড়িয়া দুই ফাঁক হইয়া আছে। চোখে অসহায় উৎকণ্ঠার চাপা ব্যগ্র দৃষ্টি।

ও দৃষ্টি আমি চিনি। ঘরে যখন তিল তিল করিয়া প্রিয়জনের মৃত্যু হইতেছে অথচ হাতে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ কিনিবারও পয়সা নাই, তখনও মানুষের চোখে ওই দৃষ্টি ফুটিয়া উঠে।

জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কি হয়েছে?'

স্ত্রীলোকটি পাতিহাঁসের মত ভাঙা গলায় বলিল, 'বাবু আমি মন্দ লোক।' তাহার দুই চোখে বিনীত দীনতা প্রকাশ পাইল।

একটু অবাক হইয়া গেলাম। নিজের সম্বন্ধে এতটা স্পষ্টবাদিতা তো সচরাচর দেখা যায় না? সত্যকাম ও জবালার কথা মনে পড়িয়া গেল।

আমি বুঝিতে পারি নাই দেখিয়া স্ত্রীলোকটি আমার চেয়ারের পাশে মেঝেয় বসিয়া হেঁটমুখে জড়াইয়া জড়াইয়া নিজের যে পরিচয় দিল, তাহাতে সমস্ত দেহ সংকুচিত হইয়া উঠিলেও বুঝিতে বাকি রহিল না—জাবালাই বটে।

সঙ্কোচ ও সংস্কার কাটাইয়া উঠা সহজ কথা নয়, এজাতীয় রোগিণী আমার নাতিদীর্ঘ ডাক্তার-জীবনে এই প্রথম। তবু আমি ডাক্তার, নিজের দায়িত্বকে ছোট করিয়া দেখিলে ডাক্তারের চলে না। গলার স্বর ঈষৎ কড়া হইয়া গেলেও শান্তভাবেই জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কি চাও?'

স্ত্রীলোকটি তখন উৎসাহ পাইয়া ভাঙা গলায় এক গল্প বলিয়া গেল। উৎকণ্ঠা ও ব্যগ্রতার আতিশয্যে অনেক আবোল-তাবোল বাকল। তাহার কথার নির্যাস—

এই—

পাপ-ব্যবসায় একমাত্র মুনাফা একটি কন্যা লইয়া সে যৌবনের প্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। টাকাকড়ি কিছু রাখিতে পারে নাই, দুই-চারিখানা গহনা যাহা ছিল তাহারই সাহায্যে কন্যার যৌবনপ্রাপ্তি পর্যন্ত কষ্টে-সৃষ্টে কাটাইয়া দিবে ভাবিয়াছিল। কিন্তু মা-মঙ্গলচণ্ডী তাহাতে বাধ সাধিয়াছেন। কন্যাটির বয়ঃক্রম এখন ত্রয়োদশ বৎসর। গত এক বৎসর ধরিয়া সে কোনও দুশ্চিকিৎস্য রোগে ভুগিতেছে। শহরের সকল ডাক্তারই একে একে চিকিৎসা করিয়া দেখিয়াছেন, কিন্তু কিছুই করিতে পারেন নাই। স্ত্রীলোকটির গহনা সব ফুরাইয়া গিয়াছে, ডাক্তারেরাও ছাড়িয়া দিয়াছেন। এখন আমি ভরসা।

বিবৃতির শেষে স্ত্রীলোকটি ব্যাকুলভাবে বলিল, 'বাবু, আমার আর কিচ্ছু নেই। নিজে খেতে পাই না, সে যাক—কিন্তু রোগা মেয়েটাকে খেতে দিতে পারি না। আমরা মন্দ লোক, কেউ আমাদের পানে মুখ তুলে চায় না। আপনি দয়া করুন, ভগবান আপনার ভাল করবেন।' বলিয়া অসহায় ভাবে কাঁদিতে লাগিল।

ভগবানের ভাল করিবার ক্ষমতা সম্বন্ধে যদিও আমার খুব উচ্চ ধারণা নাই। তবু কেন জানি না, এই ঘৃণিতা নারীটার প্রতি দয়া হইল। বিশেষত যে রোগীকে শহরসুদ্ধ ডাক্তার জবাব দিয়াছে, তাহাকে যদি বাঁচাইয়া তুলিতে পারি—

নিজের কৃতিত্ব দেখাইবার প্রলোভন ছোট বড় অনেক নৈতিক ও লৌকিক বাধা উল্লঙ্ঘন করিয়া যায়। আমি বিনা পারিশ্রমিকে মেয়েটার চিকিৎসা করিতে সম্মত হইলাম। এমন কি গাঁটের কড়ি খরচ করিয়া ভাড়াটে গাড়ি ডাকাইয়া তাহাকে দেখিয়া আসিলাম।

কুৎসিৎ পল্লীর কুৎসিৎতম প্রান্তে একটা খোলার ঘর। দৈন্য যে চরম সীমায় পৌঁছিয়াছে, তাহা একবার দৃষ্টিপাত করিলে আর সন্দেহ থাকে না। কতকগুলো ছেঁড়া কাঁথা ও চটের মধ্যে মেয়েটা পড়িয়া আছে; কাঠির মত সরু হাত-পা, গলাটি নখে ছিঁড়িয়া আনা যায়, গায়ের চামড়া কুঁচকাইয়া চামচিকির মত হইয়া গিয়াছে—চর্মাবৃত কঙ্কাল বলিলেই হয়। যথার্থ বয়স জানা না থাকিলে নয় দশ বছরের মেয়ে বলিয়া মনে ভ্রম হইত।

পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, কঠিন রোগ—ম্যারাসমাস, তাহার উপর পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব। যেরূপ অবস্থায় পৌঁছিয়াছে, তাহাতে বাঁচার সম্ভাবনা খুবই কম। আমার মুখে চোখে বোধহয় মনের ভাব প্রকাশ পাইয়াছিল, মেয়েটা রোগ-বিষাক্ত অচঞ্চল সর্পচক্ষু মেলিয়া আমার পানে চাহিয়া রহিল।

ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া ও পথ্যের জন্য একটা টাকা স্ত্রীলোকটির হাতে দিয়া ফিরিয়া আসিলাম। মনে হইতে লাগিল, টাকা ও পরিশ্রম দুই জলে পড়িল।

অতঃপর স্ত্রীলোকটি রোজ আসে। কখনও ঔষধ, কখনও নিগুণ বড়ি দিই; মাঝে মাঝে দুই-একটা টাকাও দিতে হয়। স্ত্রীলোকটি মুখ কাঁচুমাচু করিয়া দীনভাবে গ্রহণ করে; ভাল করিয়া কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতে পারে না, ভাঙা গদগদ স্বরে বলে, 'বাবা, ভগবান আপনাকে রাজা করুন।'

এক মাস যখন মেয়েটা টিঁকিয়া গেল, তখন আমি নিজেই আশ্চর্য হইয়া গেলাম। স্ত্রীলোকটি হাত জোড় করিয়া বলিল, 'বলতে সাহস করি না বাবা, কিন্তু আর

একবার যদি পায়ের ধুলো দেন। আজ মঙ্গলবার, খুঁড়বে না, কিন্তু আপনার ওষুধে কাজ হয়েছে। ঋতুরানী আমার বাঁচবে।'

দেখিয়া আসিয়া আমিও বুঝিলাম, ঋতু বাঁচিবে। একটা মানুষকে—যতই ঘৃণ্য হউক—যমের মুখ হইতে ফিরাইয়া আনিয়াছি ভাবিয়া বড় আনন্দ হইল। নিজের শক্তির উপর শ্রদ্ধাও বাড়িয়া গেল।

* * * *

মাস ছয় সাত পরে কোন পর্ব উপলক্ষে গঙ্গাস্নান করিতে গিয়াছি, ঘাটের উপর একটি মেয়ে হেঁট হইয়া আমাকে প্রণাম করিল। নিটোল, স্বাস্থ্যবতী কিশোরী, গায়ের রঙ বেশ ফরসা, মুখখানিও মন্দ নয়—সদ্য স্নান করিয়া ভিজা চুলে আমার বিস্মিত চোখের সম্মুখে দাঁড়াইল। চিনিতে পারিলাম না। সে একটু ঘাড় বাঁকাইয়া লজ্জিত চক্ষু নত করিয়া মৃদুস্বরে বলিল, 'আমি ঋতু।'

নিজের কৃতিত্বের জাজ্বল্যমান প্রমাণ চোখের উপর দেখিয়া প্রচুর আনন্দ হইবার কথা, কিন্তু আমার মনটা হঠাৎ খারাপ হইয়া গেল। সমস্ত দিন ধরিয়া তাহার গৃহস্থ-কন্যার মত সলজ্জ কোমল মূর্তিটি চোখের সামনে ভাসিতে লাগিল, আর মনে হইতে লাগিল, তাহাকে না বাঁচাইলেই বোধ হয় ভালো হইত।

গল্প এইখানেই শেষ হওয়া উচিত; কিন্তু আর একটু আছে। সেটুকু বলিতেই হইবে, সঙ্কোচ করিলে চলিবে না।

এইদিন সন্ধ্যাবেলা ঋতুর মা অনেকদিন পরে আমার কাছে আসিল। মনটা খারাপ হইয়াই ছিল, তাহার উপর সে যে প্রস্তাব করিল তাহাতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত আগুন জ্বলিয়া উঠিল। ইহাদের নাকি নানা প্রকার শাস্ত্রীয় বিধি-বিধান আছে, ঘটা করিয়া কার্যারম্ভ করিতে হয়। ঋতুর শুভ বলিদান কার্যটা আমার মত সৎ পাত্রের দ্বারা ঋতুর মাতা সম্পন্ন করাইতে চায়।

অজস্র গালাগালি দিয়া অকৃতজ্ঞ পতিতা স্ত্রীলোকটাকে তাড়াইয়া দিলাম। সে ভীত নির্বোধের মত মুখ লইয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল, আমার অসংযত উষ্মার কারণটাই যেন সে বুঝিতে পারিল না।

তারপর কুড়ি বৎসর কাটিয়া গিয়াছে; আমার বয়স এখন চল্লিশ। সেদিনের কথা স্মরণ হইলে মনে হয়, ঋতুর মাতা 'মন্দ লোক' ছিল বটে, কিন্তু বোধ হয় অকৃতজ্ঞ ছিল না। আদর্শের মাপকাঠি সকলের সমান নয়; বৈষ্ণবের কাছে যাহা মহাপাপ শাক্তের কাছে তাহা পুণ্য। মানুষের অন্তর-গহনে যাঁহার অবাধ প্রবেশাধিকার তিনি হয়তো বুঝিয়াছিলেন, ঋতুর মাতা আমাকে পাপপথে প্রলুব্ধ করিতে আসে নাই, বরং তাহার পরিপূর্ণ প্রীতি ও কৃতজ্ঞতার অর্ঘ্য লইয়া আসিয়াছিল—তাহার দীন জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ দান পূজারিণীর মত আমার পদপ্রান্তে রাখিয়াছিল।

আঙটি

হীরার আঙটির হীরাটা যখন আলগা হইয়া যায়, তখন আর তাহা আঙুলে পরিয়া বেড়ানো নিরাপদ নয়। হীরা অলক্ষিতে পড়িয়া হারাইয়া যাইতে পারে। বিষয়ী, সাবধান!

ক্ষেত্রমোহনের আঙটির হীরা অনেকদিন আগেই হারাইয়া গিয়াছিল। শোকটা সে সহজেই কাটাইয়া উঠিতে পারিয়াছিল এবং ঝুটা পাথর দিয়া কাজ চালাইতেছিল। অপরিচিত কেহ হয়তো হঠাৎ দেখিয়া ভুল করিতে পারিত, কিন্তু অন্তরঙ্গদের মনে কোনো মোহ ছিল না।

ক্ষেত্রমোহন যে একজন ভদ্রবেশী মিষ্টভাষী জুয়াচোর তাহা তাহার স্ত্রী চপলা জানিত। চপলার বয়স বাইশ বছর। রূপ ও যৌবন দুই আছে—সন্তানাদি হয় নাই। তাহার রূপ-যৌবনের মধ্যে একটা তীব্র তেজস্বিতা ছিল—চোখ-ধাঁধানো উগ্র প্রগলভতা। বাইশ বছর বয়সে বাঙালী মেয়ের যৌবন সাধারণত থাকে না—যাহা থাকে তাহা পশ্চিম দিগন্তের অস্তরাগ। চপলার মধ্যে কিন্তু কোন অভাবনীয় কারণে যৌবন টিঁকিয়া গিয়াছিল। তাহার মনের উপর যে নিগ্রহ হইয়াছিল, তাহারই ফলে হয়তো এমনটা ঘটিয়াছিল। মনের সহজাত বৃত্তি ও সংস্কারগুলি যখন নিপীড়িত হইয়া অন্তর্মুখী হয়, তখন তাহারা কোন্ পথে কি রূপ ধরিয়া দেখা দিবে বলা দেবতারও অসাধ্য। ফ্রয়েড সাহেব এই অতল সমুদ্রে চাটগেঁয়ে খালাসীর মত 'পুরণ' ফেলিতেছেন বটে—কিন্তু বাও্ মিলে না।

ক্ষেত্রমোহন লোকটা নিরম্বু বদ্মায়েস। মোসাহেবী করা ছিল তাহার পেশা। বড়লোকের সদ্যবয়ঃপ্রাপ্ত সন্তানদের অপ্সরালোকের দ্বার পর্যন্ত পেঁছাইয়া দেওয়া ছিল তাহার জীবিকা। কিন্তু সে নিজের স্ত্রীকে ভালবাসিত। বেহুঁশ মাতালের পকেট হইতে মানি-ব্যাগ চুরি করিতে তাহার বাধিত না। কিন্তু সে নিজে মদ খাইত না। এবং অন্য মকার সম্বন্ধেও তাহার একটা স্বাভাবিক নিস্পৃহতা ছিল। অপ্সরালোকের দ্বার পর্যন্ত গিয়া সে ফিরিয়া আসিত।

শঙ্করাচার্য সত্যই বলিয়াছেন—এ সংসার অতীব বিচিত্র।

চপলা যখন প্রথম স্বামীর চরিত্র জানিতে পারে, তখন ভীত বিস্ময়ে একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। তারপর কিছুদিন কান্নাকাটির পালা চলিল। ক্ষেত্রমোহন সস্নেহে যত্ন করিয়া চপলাকে নিজের চার্বাক নীতি বুঝাইয়া দিল। অতঃপর ক্রমে ক্রমে চপলা উদাসীন হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার মনে আর মোহ ছিল না।

ট্রাম-ঘর্ঘরিত সদর রাস্তার উপর একটি সরু বাড়ির দোতলার গোটা দুই ঘর লইয়া ক্ষেত্রর বাসা। শয়নঘরের একটা জানালা সদর রাস্তার উপরই। সেখানে দাঁড়াইলে পথের দৃশ্য দেখিবার কোনো অসুবিধা নাই।

সেদিন বৈকালে চপলা সেই জানালার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রাস্তার দিকে তাকাইয়াছিল, এমন সময় সিঁড়িতে জুতার শব্দ শুনিয়া ফিরিয়া দেখিল। উৎফুল্ল মুখে ক্ষেত্রমোহন ঘরে ঢুকিল।

ক্ষেত্রের বয়স ত্রিশ—সুশ্রী চটপটে বাক্পটু। সে হাসিতে হাসিতে চপলার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'সব ঠিক ক'রে ফেলেছি। আজ রাত্তিরেই—বুঝলে? গুদাম সাবাড়—মাল তস্রুপাত।'

চপলা তাহার মুখের পানে চাহিয়া হাসিল—জ্বলজ্বলে চোখ ঝলসানো হাসি। তাহার দাঁতগুলি যেন একরাশ হীরা, আলোয় ঝকমক করিয়া উঠিল। ক্ষেত্রের এ হাসি অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল, তবু সে লোভ সামলাইতে পারিল না, একটা চুম্বন

করিয়া ফেলিল।

বুকে হাত দিয়া তাহাকে একটু ঠেলিয়া দিয়া চপলা বলিল, 'কি হ'ল?'

চপলার কাছে ক্ষেত্রের কোনো কথাই গোপন ছিল না। বরং কেমন করিয়া কাহার নিকট হইতে টাকা ঠকাইয়া লইল, কাহাকে মাতাল করিয়া পকেট-বুক হইতে নোট চুরি করিল—এসব কথা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে চপলার কাছে গল্প করিতে ভালবাসিত, বেশ একটু আত্মপ্রসাদ অনুভব করিত। এখন সে জানালার গরাদ ধরিয়া সোৎসাহে বলিতে আরম্ভ করিল, 'তোমাকে অ্যাদ্দিন বলিনি। এক নূতন কাপ্তেন পাকড়েছি; বেশ শাঁসালো জমিদারের ছেলে—কলকাতায় ফুর্তি করতে এসেছে। নরেন চৌধুরী নাম। ফড়েপুকুরে একটা বাসা ভাড়া নিয়ে একলা আছে। তাকে মাসখানেক ধ'রে খেলাচ্ছি।

'ছোঁড়ার বয়স বেশি নয়—তেশই-চব্বিশ। কিন্তু হ'লে কি হবে, এরই মধ্যে অনেক বুড়ো ওস্তাদের কান কেটে নিতে পারে। একেবারে একটি হর্তেল ঘুঘু। এই দেখ না, একমাস ধ'রে তেল দিচ্ছি,এখনো একটি সিকি পয়সা বার করতে পারিনি। শালা মদ কিনবে তাও আমার হাতে টাকা দেবে না; নিজে গিয়ে বোতল কিনে আনবে, নয়তো দারোয়ান ব্যাটাকে পাঠাবে। তার থেকে দু পয়সা বাঁচাব, সে গুড়ে বালি। পাঁড় মাতাল; কিন্তু মদের গ্লাস ছোঁবার আগে কি করে জান? টাকাকড়ি, মায় হাতের আঙটি পর্যন্ত দেরাজে বন্ধ ক'রে চাবিটি শালা দারোয়ানের হাতে দিয়ে বলে, যাও, মৌজ কর। এই ব'লে তাকে একেবারে বাড়ির বার ক'রে দেয়। তারপর আমার দিকে চেয়ে মুচকে মুচকে হাসতে থাকে—চণ্ডাল ব্যাটাছেলে।'

চপলা মন দিয়া শুনিতেছিল, এই আকস্মিক উত্তাপে সকৌতুকে হাসিয়া ফেলিল; বলিল, 'তবে যে বললে সব ঠিক করে ফেলেছি?'

ক্ষেত্র মুখের একটা বিরক্তি-সূচক ভঙ্গি করিয়া বলিল, দেখলুম, ও-শালা পগেয়া বদমায়েসকে সহজে ঘায়েল করা যাবে না, একেবারে ঘাড় মটকাতে হবে। আমারও রোখ চ'ড়ে গেছে—আজ রাত্রে ঠিক করেছি ব্যাটার দেরাজ ফাঁক করব। এই দেখ, চাবি তৈরি করিয়েছি।' বলিয়া পকেট হইতে কয়েকটা চকচকে চাবি বাহির করিয়া দেখাইল।

'চুরি করবে?'

'হ্যাঁ। ঢের খোশামোদ করেছি, আর নয়; এবার একহাত ভানুমতীর খেল দেখিয়ে দেব। টাকাকড়ি ব্যাটা দেরাজে বেশি রাখে না—কোথায় রাখে ভগবান জানেন; কিন্তু একটা হীরের আঙটি আছে, রাত্রে বেরুবার সময় সেটা দেরাজে বন্ধ ক'রে রেখে যায়। সেইটের ওপর তাক করেছি। উঃ! কী হীরেটা মাইরি, চপলা, যদি দেখো চোখ ঝলসে যাবে। দাম হাজার টাকার এক কাণাকড়ি কম নয়। যদি পাঁচশো টাকাতেও ছাড়ি, কেষ্ট স্যাকরা লুফে নেবে।'

'কিন্তু যদি ধরা পড়?'

'সে ভয় নেই। বন্দোবস্ত সব পাকা করে রেখেছি। আজ এগারোটা থেকে বারোটার মধ্যে ব্যাটা বেরুবে, সমস্ত রাত বাড়ি ফিরবে না। বিমনাভাবে ঈষৎ চিন্তা করিয়া বলিল, 'কোথায় যাবে কিছুতেই বললে না; হয়তো নটরাজ থিয়েটারের সৌদামিনীর কাছে—কিন্তু সৌদামিনী তো মেনা মিস্তিরের, থাক গে, যে চুলোয়

খুশি থাক । আসল কথা, এগারোটার পর ব্যাটা বাড়ি থাকবে না। দারোয়ানটা বেরুবে—তার ব্যবস্থা করেছি। বাস্, গলির মোড়ে ওৎ পেতে থাকব, কর্তাও বাড়ি থেকে বেরুবেন আর আমিও সুট ক'রে গিয়ে ঢুকব। তারপরই গুদাম সাবাড়—মাল তম্রুপাত শালা লুট লিয়া—শালা লুট লিয়া—' রাস্তার দিকে তাকাইয়া ক্ষেত্র উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল।

কিন্তু পরক্ষণেই বিড়ালের মত লাফ দিয়া জানালার সম্মুখ হইতে সরিয়া আসিয়া চাপা গলায় বলিল, 'সরে এস—স'রে এস, ও-পাশের ফুটপাথ দিয়ে যাচ্ছে।'

চপলা সরিল না, বলিল, 'কে?'

'নরেন চৌধুরী—স'রে এস।'

'কি দরকার? আমাকে তো আর চেনে না।'

'তা বটে। তারপর ঘরের ভিতরের অন্ধকার হইতে উঁকি মারিয়া উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল, 'ঐ দেখতে পাচ্ছ, ফরসা মতন চেহারা, গিলে-করা আদ্দির পাঞ্জাবি, হাতে হরিণের শিঙের ছড়ি? উনিই নরেন্দ্র চৌধুরী। হাতের আঙটিটা দেখতে পাচ্ছ?'

'পাচ্ছি।' চপলা বাহিরের দিকে তাকাইয়া হাসিল; পড়ন্ত দিনের আলো তাহার মুখের উপর পড়িয়াছিল, মনে হইল, যেন একরাশ হীরা ঝরিয়া পড়িল—'হীরেটার দাম কত বললে?'

'হাজার টাকা।' ক্ষেত্র বিছানার উপর গিয়া বসিল—'বেশিও হতে পারে, এবার তোমার ঝুমকো গড়িয়ে দেবই বুঝেছ? ঐ কেষ্ট স্যাকরাকে দিয়েই গড়িয়ে দেব—সস্তায় হবে। অনেকদিন থেকে তোমায় ব'লে রেখেছি—'

রাস্তার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়াই চপলা বলিল, 'হুঁ।'

ক্ষেত্র জিজ্ঞাসা করিল, 'চ'লে গেছে, না, এখনো আছে?'

চপলার ঠোঁটের উপর একটা ক্ষণিক হাসি খেলিয়া গেল, ক্ষেত্র তাহা দেখিতে পাইল না। চপলা বলিল, 'মোড় পর্যন্ত গিয়ে আবার ফিরে আসছে।'

'ফিরে আসছে?' ক্ষেত্রের কপালে উৎকণ্ঠার ভ্রূকুটি দেখা গেল। 'তাই তো, আমার বাসার সন্ধান পেয়েছে নাকি? ব্যাটা যে রকম কুচুটে শয়তান। তুমি স'রে এস। কে জানে—'

চপলা জানালা দিয়া গলা বাড়াইয়া রহিল, খানিক পরে সরিয়া আসিয়া বলিল, 'চ'লে গেছে।'

'যাক, তা হ'লে বোধ হয় এমনি ঘুরে বেড়াচ্ছিল।' বলিয়া ক্ষেত্র একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল।

চপলা যেন অন্যমনস্কভাবে ক্ষেত্রর মুখের পানে তাকাইয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'আচ্ছা, টাকার জন্যে মানুষ সব করতে পারে, না।'

ক্ষেত্র একগাল হাসিল—'পারে না। টাকার জন্যে পারে না এমন একটা মানুষ দেখাও তো দেখি। খুন জখম জাল ফেরোব্বাজি দুনিয়াটা চলছে তো ঐ টাকার পেছনে। আর তাতে দোষই বা কি? টাকা না হ'লে কারুর একদণ্ড চলে? আমি যে ব্যাটার ঘাড় ভাঙতে যাচ্ছি, তার মধ্যে আমার অন্য স্বার্থও আছে। ব্যাটা আমাকে বড় হয়রান করেছে। যেমন ক'রে হোক ঐ আঙটি গাপ করবই।'

আলস্য ভরে দুই হাত মাথার উপর তুলিয়া চপলা গা ভাঙিল। তারপর বলিল,

'যাই, চুল বাঁধি গে।'

*　　　*　　　*　　　*

রাত্রি সাড়ে দশটার সময় ক্ষেত্র গলির মোড়ে আড্ডা গাড়িল। ঠিক সম্মুখে ফড়েপুকুরের রাস্ত পূর্বপশ্চিমে চলিয়া গিয়াছে, গলির মুখ যেখানে গিয়া তাহার সহিত মিশিয়াছে সেখানে একটা কাঠের আড়ৎ আছে—সেই আড়তের গা ঘেঁষিয়া দাঁড়াইলে সহজেই পথচারীর দৃষ্টি এড়ানো যায়। রাস্তায় গ্যাস কাছাকাছি নাই।

এখান হইতে নরেন চৌধুরীর বাসার সদর বেশ দেখা যায়—বড় জোর বিশ গজ। রাস্তার উপরেই দরজা। দরজা খুলিলে ভিতরে একটা ছোট গলি, গলির দুই ধারে দুইটি ঘর, রাস্তার উপরেই। বাহিরের দিকে জানালা আছে।

ক্ষেত্র দেখিল, পাশের একটা ঘরে আলো জ্বলিতেছে। এইটাই আসল ঘর। ঘরে একটা সেক্রেটারিয়েট টেবিল আছে, সেই টেবিলের ডান দিকের দেরাজে—

ক্ষেত্র পকেটে হাত দিয়া দেখিল চাবি ঠিক আছে। সে মনে মনে হিসাব করিল, কাজ শেষ করিয়া বাহির হইয়া আসিতে মিনিট দশেকের বেশি সময় লাগিবে না। তাহার হাত নিশপিশ করিতে লাগিল, একটা স্নায়বিক অধীরতা তাহার শরীরকে চঞ্চল করিয়া তুলিল। লোকটা কতক্ষণে বাড়ির বাহির হইবে।

ক্ষেত্র বিড়ি ও দেশলাই বাহির করিল। বিড়িতে ফুঁ দিয়া ঠোঁটে ধরিয়া দেশলাই জ্বালিতে গিয়া সে থামিয়া গেল। না, কাজ নাই। গলিতে লোকজনের যাতায়াত বন্ধ হইয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু গলির দুই ধারে বাড়ি। কে জানে, যদি কেহ দেশলাইয়ের আলো দেখিতে পায়। ধূমপানের সরঞ্জাম ক্ষেত্র আবার পকেটে রাখিয়া দিল।

হাতে ঘড়ি ছিল, চোখের খুব কাছে আনিয়া দেখিল, এগারোটা বাজিতে পাঁচ মিনিট। সময় হইয়া আসিতেছে।

এমন সময় নরেন চৌধুরীর ঘরে বৈদ্যুতিক আলো নিভিয়া গেল। ক্ষেত্র নিশ্বাস বন্ধ করিয়া একদৃষ্টে সদর-দরজার পানে তাকাইয়া রহিল। তারপর আস্তে আস্তে নিশ্বাস ত্যাগ করিল। এইবার!

সদর-দরজা খুলিয়া নরেন চৌধুরী বাহির হইয়া আসিল। ক্ষেত্র কাঠগোলার দেয়ালে একেবারে বিজ্ঞাপনের পোস্টারের মত সাঁটিয়া গেল। নরেন ফুটপাতে দাঁড়াইয়া সিগারেট ধরাইল। ক্ষেত্র সহস্রচক্ষু হইয়া দেখিল, তাহার হাতে আঙটি আছে কি না। না, নাই। আবার সে ধীরে ধীরে চাপা নিশ্বাস ফেলিল। নরেন ছড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে চলিয়া গেল।

এইবার ক্ষেত্র অন্ধকারে দাঁত বাহির করিয়া হাসিল। নয়নের পরিপাটি সাজ-সজ্জা সে এক নজরে দেখিয়া লইয়াছিল। এইসব নিশাচর প্রজাপতিদের প্রতি তাহার মনে একটা অবজ্ঞাপূর্ণ ঘৃণার ভাব ছিল। সে মনে মনে বলিল, 'অভিসারে বেরুলেন!' কোনো একজন স্ত্রীলোক ইহাকে দোহন করিয়া অন্তঃসারশূন্য করিয়া শেষে ছোবড়ার মত দূরে ফেলিয়া দিবে, ইহা ভাবিয়া সে মনে বড় তৃপ্তি পাইল। করুক, সোনার চাঁদকে একেবারে ন্যাঙটা করিয়া ছাড়িয়া দিক।

কিন্তু এদিকে দারোয়ানটা এখনো বাহির হইতেছে না কেন? খোট্টাটার আবার কি হইল? ভাঙ খাইয়া ঘুমাইয়া পড়ে নাই তো?

আরও খানিকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া ক্ষেত্র ঘড়ি দেখিল, সওয়া এগারোটা। তাই তো? কি হইল? দারোয়ান আগে বাহির হইয়া যায় নাই তো? না, তাহা হইলে নরেন দরজায় তালা লাগাইয়া যাইত। তবে—দারোয়ানটা কি সত্যই ঘুমাইয়া পড়িল। তাহাকে সরাইবার জন্য ক্ষেত্র এত মেহনত করিয়াছে—সারকুলার রোডে ময়দা-কলের বস্তিতে তাড়ির আড্ডার সন্ধান বলিয়া দিয়াছে, আর শেষে—

এই সময় খোট্টা-দারোয়ান বাহির হইল। দরজার তালা লাগাইয়া পাগড়ি বাঁধিতে বাঁধিতে নাগরা ঠকঠক করিয়া প্রস্থান করিল।

এইবার সময় উপস্থিত। দারোয়ানের নাগরার শব্দ মিলাইয়া যাইবার পর ক্ষেত্র কাঠ-গোলার ছায়ান্ধকার হইতে বাহির হইয়া আসিল। পথ নির্জন—বাধা বিপত্তির কোনো ভয় নাই। কিন্তু দুই পা অগ্রসর হইয়া ক্ষেত্র আবার ফিরিয়া আসিল। কাজ নাই, আর একটু যাক। যদি দারোয়ানটা কিছু ভুলিয়া গিয়া থাকে, হয়তো আবার ফিরিয়া আসিবে।

দশ মিনিট কাটিয়া গেল, দারোয়ান ফিরিল না। তখন ক্ষেত্র অন্ধকার হইতে বাহির হইল। বেশ স্বাভাবিক দ্রুতপদে, যেন নিজের বাড়িতে যাইতেছে এমনভাবে, দরজার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। পকেট হইতে চাবি বাহির করিয়া, বেশ শব্দ করিয়া দরজা খুলিল। তারপর ভিতরে প্রবেশ করিয়া দরজা ভেজাইয়া দিল।

ক্ষেত্রর পকেটে একটা ছোট বৈদ্যুতিক টর্চ ছিল, সেটা এবার সে জ্বালিল—একবার চারিদিকে ফিরাইয়া দেখিয়া লইল। তারপর বাঁ দিকের দরজার উপর ফেলিল।

দরজায় তালা লাগানো। ক্ষেত্র একটা চাবি বাছিয়া লইয়া তালায় পরাইল, খুট করিয়া শব্দ হইল। তালা খুলিয়া গেল।

টর্চের আলো নিবাইয়া ক্ষেত্র ঘরে ঢুকিল। ঘরে কোথায় কি আছে সবই তাহার জানা ছিল; সে অন্ধকারে হাতড়াইয়া গিয়া রাস্তার দিকের জানালাটা বন্ধ করিয়া দিল। তারপর ঘরের দিকে ফিরিয়া টর্চ জ্বালিল।

টর্চের আলো একটা টেবিলের উপর গিয়া পড়িল। টেবিলের উপর বিশেষ কিছু নাই—কাগজ চাপা, ব্লটিং প্যাড, দোয়াত, কলম। টেবিলের আশেপাশে দুই-তিনটা চেয়ার অস্পষ্টভাবে দেখা গেল।

ক্ষেত্র আর কালক্ষয় না করিয়া কাজে লাগিয়া গেল। টেবিলের সম্মুখে চেয়ারে বসিয়া সে দেরাজ খুলিতে প্রবৃত্ত হইল: ডান ধারের দেরাজগুলো খোলা, কিন্তু বাঁ ধারের দেরাজের সম্মুখে একটা কবাট আছে—তাহার গায়ে চাবির ঘর। ক্ষেত্র সেই কবাটের গায়ে চাবি প্রবেশ করাইয়া সন্তর্পণে ঘুরাইল। কবাট খুলিয়া গেল।

চারটি দেরাজ। নরেন উপরের দেরাজে আঙটি রাখে—ক্ষেত্র দেরাজের ভিতর আলো না ফেলিয়াই তাহার ভিতর হাত ঢুকাইয়া দিল। কাগজপত্র ও পানের ডিবা তাহার হাতে ঠেকিল, কিন্তু আঙটির পরিচিত ক্ষুদ্র কেসটি হাতে ঠেকিল না। তখন সে দেরাজের ভিতর আলো ফেলিয়া দেখিল, আঙটি নাই।

আঙটি নাই? কোথায় গেল? প্রথমটা ক্ষেত্র বুঝিতেই পারিল না। সে এতই স্থির যে, এই অভাবনীয় ব্যাপারে যেন হতভম্ব হইয়া গেল। তারপর তাহার বুকের ভিতরটা দুরদুর করিয়া উঠিল।

তবে কি— ?

সে একবার ঘরের চারিপাশে চাহিল, টর্চটা ঘরের কোণে কোণে ফেলিয়া দেখিল, না, কেহ নাই। সে ভয় করিয়াছিল, নরেন তাহাকে ধরিবার ফাঁদ পাতিয়াছে—তাহা নয়।

হয়তো আঙটিটা দ্বিতীয় দেরাজে আছে। মেঝেয় হাটু গাড়িয়া বসিয়া ক্ষেত্র দ্বিতীয় দেরাজ খুলিল। একেবারে শূন্য—তাহাতে একটা আলপিন পর্যন্ত নাই।

তৃতীয় দেরাজ! সেটাও শূন্য। চতুর্থ দেরাজেও তাই। ক্ষেত্রের কপালে ঘাম ফুটিয়া উঠিল। নাই, কিছু নাই। আঙটি তো দূরের কথা, একটা পয়সা পর্যন্ত নাই।

আলো নিবাইয়া অন্ধকার ঘরে ক্ষেত্র কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। আবার তাহার বুক ধকধক করিতে লাগিল। নরেন নিশ্চয় সন্দেহ করিয়াছিল, তাই তাহাকে ঠকাইবার জন্য—

কিন্তু না, নিশ্চয় আছে। হয়তো তাড়াতাড়িতে নরেন ডান দিকের খোলা দেরাজেই আঙটি রাখিয়া গিয়াছে। ক্ষেত্র আবার আলো জ্বালিয়া ডান দিকের দেরাজগুলো খুঁজিতে লাগিল। কিন্তু কোনটাতেই কিছু পাইল না। কতকগুলো মদের বিজ্ঞাপন, স্ত্রীলোকের ছবি, গোটাকয়েক অশ্লীল বিলাতী উপন্যাস—

এতক্ষণে ভূতের মত একটা ভয় ক্ষেত্রকে চাপিয়া ধরিল, তাহার মনে হইল এই শূন্য বাড়িখানা তাহার চুরির ব্যর্থ প্রয়াস দেখিয়া নিঃশব্দে অট্টহাস্য করিতেছে। এই ঘরটা ক্রমশ সংকুচিত হইয়া তাহাকে চাপিয়া ধরিবার চেষ্টা করিতেছে। সে ধরা পড়িয়া গিয়াছে আর পলাইতে পারিবে না।

এই সময় দূরের কোন গির্জায় ঢং ঢং করিয়া বারোটা বাজিল। ঘড়ির আওয়াজ ক্ষেত্রের কানে বোমার আওয়াজের মত লাগিল। বারোটা! এতক্ষণ সে এখানে আছে? যদি কেহ আসিয়া পড়ে? নরেনই যদি ফিরিয়া আসে?

ক্ষেত্র আর দাঁড়াইল না। দেরাজগুলো খোলাই পড়িয়া রহিল, সে জোরে নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল। তারপর বাড়ির বাহির হইয়া আসিল। বাড়ির বাহির হইয়া ভয়ার্ত চোখে একবার চারিদিকে তাকাইল। কাহাকেও দেখিতে পাইল না, পাড়া সুষুপ্ত। তখন স্খলিত হস্তে সদরে তালা বন্ধ করিয়া হনহন করিয়া চলিতে আরম্ভ করিল।

তাহার বাসা যে দিকে, সে ঠিক তাহার উল্টা মুখে চলিয়াছে তাহা সে জানিতে পারিল না।

*   *   *   *

একটার সময় ক্ষেত্র নিজের বাসার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। এতক্ষণে তাহার মাথা বেশ ঠাণ্ডা হইয়াছে, ভয় আর নাই। এমন কি, অহেতুক ভয়ে দেরাজগুলো খোলা রাখিয়া পলাইয়া আসার জন্য সে একটু লজ্জা বোধ করিতেছে। কিন্তু বিস্ময় তাহার কিছুতেই ঘুচিতেছে না। নরেন কি তাহাকে সন্দেহ করিয়াছিল? তাহাই বা কি করিয়া সম্ভব—নরেন আঙটি পরিয়া বাহির হয় নাই ইহা সে স্বচক্ষে ভাল করিয়া দেখিয়াছে। তবে আঙটিটা গেল কোথায়?

ক্ষেত্র নিজের সিঁড়ির দরজার কড়া নাড়িল। তাহার উপরে উঠিবার সিঁড়ি

স্বতন্ত্র, তলার বাসিন্দার সহিত কোনো সংযোগ নাই। তাই প্রতিবেশীকে না জাগাইয়া রাত্রে যখন ইচ্ছা সে বাড়ি ফিরিতে পারে।

কিছুক্ষণ পরে চপলা আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল। ক্ষেত্র কোনো কথা না বলিয়া উপরে উঠিয়া গেল। চপলা সিঁড়ির দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া শয়ন-ঘরে আসিল, তারপর বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া শুইয়া পড়িল।

ক্ষেত্র জামা খুলিতে খুলিতে ভাবিতেছিল, চপলা জিজ্ঞাসা করিলে কি উত্তর দিবে। কিন্তু চপলা যখন কোনও প্রশ্ন করিল না, তখন সমস্ত কথা বলিবার জন্য তাহার নিজেরই মন উশখুশ করিতে লাগিল। মুখে চোখে জল দিয়া আলোটা কমাইয়া দিতে দিতে সে বলিল, 'আজ ভারি আশ্চর্য হ'ল। ঘুমুলে নাকি?' ব্যর্থতার কুণ্ঠায় তাহার স্বর নিস্তেজ।

চপলা উত্তর দিল না, কেবল গলায় একটা শব্দ করিল মাত্র। ক্ষেত্র বিছানায় প্রবেশ করিয়া দেখিল, চপলা চিৎ হইয়া শুইয়া আছে, তাহার ডান হাতটা চোখের উপর রাখা। অল্প আলোয় চপলার মুখ ভাল দেখা গেল না।

'আঙটিটা পেলুম না, বুঝলে?

চপলার নিকট হইতে কোনো সাড়া আসিল না। সে ঘুমাইয়াছে কি না দেখিবার জন্য ক্ষেত্র তাহার কাছে মুখ লইয়া গেল—'জেগে আছ, না ঘুমুলে?'

চপলার মুখের উপর হাতটা একটু নড়িল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার আঙুলের উপর আলো ঝিকমিক করিয়া উঠিল।

ক্ষেত্র সূচীবিদ্ধের মত বিছানায় উঠিয়া বসিল। চপলার হাতখানা টানিয়া নিজের চোখের সম্মুখে আনিয়া বিকৃত চাপা গলায় বলিয়া উঠিল, 'আঙটি। এ আঙটি তুমি কোথায় পেলে?—তুমি কোথায় পেলে—'

মাকড়সার রস

ব্যোমকেশকে এক রকম জোর করিয়াই বাড়ি হইতে বাহির করিয়াছিলাম।

গত এক মাস ধরিয়া সে একটা জটিল জালিয়াতির তদন্তে মনোনিবেশ করিয়াছিল; একগাদা দলিলপত্র লইয়া রাতদিন তাহার ভিতর হইতে অপরাধীর অনুসন্ধানে ব্যাপৃত ছিল এবং রহস্য যতই ঘনীভূত হইতেছিল ততই তাহার কথাবার্তা কমিয়া আসিতেছিল। লাইব্রেরি-ঘরে বসিয়া নিরন্তর এই শুষ্ক কাগজগুলো ঘাঁটিয়া ঘাঁটিয়া তাহার শরীরও খারাপ হইয়া পড়িতেছে দেখিলাম; কিন্তু সে কথার উল্লেখ করিলে সে বলিত, 'নাঃ, বেশ তো আছি।'

সেদিন বৈকালে বলিলাম, 'আর তোমার কথা শোনা হবে না; চল, একটু বেড়িয়ে আসা যাক। দিনের মধ্যে অন্তত দু ঘণ্টাও তো বিশ্রাম দরকার।'

'কিন্তু—'

'কিন্তু নয়, চল লেকের দিকে। দু ঘণ্টায় তোমার জালিয়াৎ পালিয়ে যাবে না।'

'চল।' কাগজ সরাইয়া রাখিয়া সে বাহির হইল বটে, কিন্তু তাহার মনটা সেই অজ্ঞাত জালিয়াতের পিছু ছাড়ে নাই বুঝিতে কষ্ট হইল না।

লেকের ধারে বেড়াইতে বেড়াইতে হঠাৎ একজন বহু পুরাতন কলেজের বন্ধুর সঙ্গে

দেখা হইয়া গেল। অনেকদিন তাহাকে দেখি নাই; আই, এ, ক্লাসে দুজনে একসঙ্গে পড়িয়াছিলাম, তারপর সে মেডিকেল কলেজে প্রবেশ করে। সেই অবধি ছাড়াছাড়ি। আমি তাহাকে দেখিয়া বলিলাম, 'আরে! মোহন যে! তুমি কোত্থেকে?'

সে আমাকে দেখিয়া সহর্ষে বলিল, 'অজিত! তাই তো হে! কদ্দিন পরে দেখা, তারপর খবর কি?'

কিছুক্ষণ পরস্পরের পিঠ-চাপড়া-চাপড়ির পর ব্যোমকেশের সহিত পরিচয় করাইয়া দিলাম। মোহন বলিল, 'আপনিই? বড় খুশি হলুম। মাঝে মাঝে সন্দেহ হ'ত বটে, আপনার কীর্তিপ্রচারক অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় হয়তো আমাদের বাল্যবন্ধু অজিত; কিন্তু বিশ্বাস হ'ত না।'

জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তুমি আজকাল কি করছ?'

মোহন বলিল, 'কলকাতাতেই প্র্যাক্‌টিস করছি।'

তারপর বেড়াইতে বেড়াইতে নানা কথায় ঘন্টাখানেক কাটিয়া গেল। লক্ষ্য করিলাম, সাধারণ কথাবার্তার মধ্যে মোহন দু-একবার কি একটা বলিবার জন্য মুখ খুলিয়া আবার থামিয়া গেল। ব্যোমকেশও তাহা লক্ষ্য করিয়াছিল। তাই এক সময় অল্প হাসিয়া বলিল, 'কি বলবেন বলুন না।'

মোহন একটু লজ্জিত হইয়া বলিল, 'একটা কথা বলি-বলি ক'রেও বলতে সঙ্কোচ হচ্ছে। ব্যাপারটা এত তুচ্ছ যে, সে নিয়ে আপনাকে বিব্রত করা অন্যায়। অথচ—'

আমি বলিলাম, 'তা হোক, বল। আর কিছু না হোক, ব্যোমকেশকে কিছুক্ষণের জন্য জালিয়াতের হাত থেকে নিষ্কৃতি দেওয়া তো হবে।'

'জালিয়াৎ?'

আমি বুঝাইয়া দিলাম। তখন মোহন বলিল, 'ও! কিন্তু আমার কথা শুনে হয়তো ব্যোমকেশবাবু হাসবেন।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'হাসির কথা হ'লে নিশ্চয় হাসব, কিন্তু আপনার ভাব দেখে তা তো মনে হচ্ছে না। বরঞ্চ বোধ হচ্ছে, একটা কোনও সমস্যা কিছুদিন থেকে আপনাকে ভাবিত করে রেখেছে, আপনি তারই উত্তর খুঁজছেন।'

মোহন সাগ্রহে কহিল, 'আপনি ঠিক ধরেছেন। জিনিসটা হয়তো খুবই সহজ, কিন্তু আমার পক্ষে এটা একটা দুর্ভেদ্য প্রহেলিকা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি নেহাত বোকা নই—সাধারণ সহজ-বুদ্ধি আছে ব'লেই মনে করি। অথচ একজন রোগে পঙ্গু চলৎশক্তিরহিত লোক শুধু আমাকে নয়, তার সমস্ত পরিবারের তীক্ষ্ন সতর্কতা প্রতি মুহূর্তে ব্যর্থ ক'রে দিচ্ছে।'

কথা কহিতে কহিতে আমরা একটা বেঞ্চিতে আসিয়া বসিয়াছিলাম। মোহন বলিল, 'যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে ব্যাপারটা বলছি—শুনুন। কোনও এক বড়-মানুষের বাড়িতে আমি গৃহ-চিকিৎসক। তাঁরা বনেদী বড়মানুষ, কলকাতায় বন কেটে বাস; অন্যান্য বিষয় সম্পত্তি ছাড়াও কলকাতায় একটা বাজার আছে, তা থেকে মাসিক হাজার পনেরো টাকা আয়। সুতরাং আর্থিক অবস্থা কি রকম বুঝতেই পারছেন।

'এই বাড়ির যিনি কর্তা, তাঁর নাম নন্দদুলালবাবু। ইনিই বলতে গেলে এ বাড়িতে আমার একমাত্র রুগী। বয়সকালে ইনি এত বেশি বদখেয়াল করেছিলেন

যে, পঞ্চাশ বছর বয়স হতে না-হতেই শরীর একেবারে ভেঙে পড়েছে। বাতে পঙ্গু, আরও কত রকম ব্যাধি যে তাঁর শরীরকে আশ্রয় ক'রে আছে, তা গুণে শেষ করা যায় না। তাছাড়া পক্ষাঘাতের লক্ষণও ক্রমে দেখা দিচ্ছে। আমাদের ডাক্তারি শাস্ত্রে একটা কথা আছে—মানুষের মৃত্যুতে বিস্মিত হবার কিছু নেই, মানুষ যে বেঁচে থাকে এইটেই সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়। আমার এই রুগীটিকে দেখলে সেই কথাই সর্বাগ্রে মনে পড়ে।

'এই নন্দদুলালবাবুর চরিত্র আপনাকে কি ক'রে বোঝাব ভেবে পাচ্ছি না। কটুভাষী, সন্দিগ্ধকুটিল, হিংসাপরায়ণ—এককথায় এমন ইতর নীচ-স্বভাব আমি আর কখনও দেখিনি। বাড়িতে স্ত্রী পুত্র পরিবার সব আছে, কিন্তু কারুর সঙ্গে সদ্ভাব নেই। তাঁর ইচ্ছা, যৌবনে যে উচ্ছৃঙ্খলতা ক'রে বেড়িয়েছেন এখনও তাই ক'রে বেড়ান। কিন্তু প্রকৃতি বাদ সেধেছেন, শরীরে যে সামর্থ্য নেই। এই জন্যে পৃথিবীসুদ্ধ লোকের ওপর দারুণ রাগ আর ঈর্ষা,—যেন তাঁর এই অবস্থার জন্যে তারাই দায়ী। সর্বদা ছল খুঁজে বেড়াচ্ছেন, কি ক'রে জব্দ করবেন।

'শরীরে শক্তি নেই, বুকের গোলমালও আছে, তাই ঘর ছেড়ে বেরুতে পারেন না ; নিজের ঘরে ব'সে কেবল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ওপর কদর্য বর্ষণ করছেন, আর দিস্তে দিস্তে কাগজে অনবরত লিখে চলেছেন। তাঁর এক খেয়াল যে, তিনি একজন অদ্বিতীয় সাহিত্যিক, তাই কখনও লাল কালিতে, কখনও কালো কালিতে এন্তার লিখে যাচ্ছেন। সম্পাদকদের ওপর ভয়ংকর রাগ, তাঁর বিশ্বাস সম্পাদকেরা কেবল শত্রুতা ক'রেই তাঁর লেখা ছাপে না।'

আমি কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কি লেখেন ?'

'গল্প। কিংবা আত্মচরিতও হতে পারে। একবার মাত্র সে লেখার ওপর আমি চোখ বুলিয়েছিলুম, তারপর আর সেদিকে তাকাতে পারিনি। সে লেখা পড়বার পর গঙ্গাস্নান করলেও মন পবিত্র হয় না। আজকালকার যারা তরুণ লেখক, সে গল্প পড়লে তাঁদেরও বোধ করি দাঁত-কপাটি লেগে যাবে।'

ব্যোমকেশ ঈষৎ হাসিয়া বলিল, 'চরিত্রটি যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু সমস্যাটি কি ?'

মোহন আমাদের দুজনকে দুটি সিগারেট দিয়া, একটি নিজে ধরাইয়া বলিল, 'আপনারা ভাবছেন, এমন গুণবান লোকের আর কোনও গুণ থাকা সম্ভব নয়—কেমন ? কিন্তু তা নয়। এর আর একটি মস্ত গুণ আছে, এই শরীরের ওপর ইনি এক অদ্ভুত নেশা করেন।'

সিগারেটে গোটা দুই টান দিয়া বলিল, 'ব্যোমকেশবাবু, আপনি তো এই কাজের কাজী, সমাজের নিকৃষ্ট লোক নিয়েই আপনাকে কারবার করতে হয়—মদ, গাঁজা, চণ্ডু, কোকেন ইত্যাদি অনেক রকম নেশাই মানুষকে করতে দেখে থাকবেন। কিন্তু মাকড়সার রস খেতে কাউকে দেখছেন কি ?'

আমি আঁৎকাইয়া বলিলাম, 'মাকড়সার রস। সে আবার কি ?'

মোহন বলিল, 'এক জাতীয় মাকড়সা আছে, যার শরীর থেকে এই বীভৎস বিষাক্ত রস পিষে বার ক'রে নেওয়া হয়।'

ব্যোমকেশ কতকটা আত্মগতভাবে বলিল, **Tarantula dance**! স্পেনে আগে

ছিল,—এই মাকড়সার কামড় খেয়ে হরদম নাচত। দারুণ বিষ। বইয়ে পড়েছি বটে, কিন্তু এ দেশে কাউকে ব্যবহার করতে দেখিনি।'

মোহন বলিল, 'ঠিক বলেছেন—ট্যারানটুলা; সাউথ আমেরিকার স্প্যানিশ সঙ্কর জাতির মধ্যে এই নেশার খুব বেশি চলন আছে। এই ট্যারানটুলার রস একটা তীব্র বিষ, কিন্তু খুব কম মাত্রায় ব্যবহার করলে শরীরের স্নায়ুমণ্ডলে একটা প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি করে। বুঝতেই পারছেন, স্বভাবের দোষে স্নায়বিক উত্তেজনা না হ'লে যারা থাকতে পারে না তাদের পক্ষে এই মাকড়সার রস কি রকম লোভনীয় বস্তু। কিন্তু নিয়মিত ব্যবহার করলে এর ফল সাংঘাতিক দাঁড়ায়। অস্বাভাবিক উত্তেজনার ফলে স্নায়ুমণ্ডল ক্রমশ অসাড় হয়ে পড়ে এবং তার পরে মস্তিষ্কের পক্ষাঘাতে মৃত্যু অনিবার্য।

'আমাদের নন্দদুলালবাবু বোধ হয় যৌবনকালে এই চমৎকার নেশাটি ধরেছিলেন। তারপর শরীর যখন অকর্মণ্য হয়ে পড়ল তখন নেশা ছাড়তে পারলেন না। আমি যখন গৃহচিকিৎসক হয়ে ওঁদের বাড়িতে ঢুকলুম, তখনও উনি প্রকাশ্যে ঐ নেশা চালাচ্ছেন, সে আজ বছর খানেকের কথা। আমি প্রথমেই ওটা বন্ধ ক'রে দিলুম—বললুম, যদি বাঁচতে চান তো তা'হ'লে ওটা ছাড়তে হবে।

এই নিয়ে খুব খানিক ধস্তাধস্তি হ'ল, তিনিও খাবেনই, আমিও খেতে দেব না। শেষে আমি বললুম—'আপনার বাড়িতে ও-জিনিস ঢুকতে দেব না, দেখি আপনি কি ক'রে খান? তিনিও কুটিল হেসে বললেন—তাই নাকি? আচ্ছা, আমিও খাব, দেখি তুমি কি ক'রে আটকাও। যুদ্ধ ঘোষণা হয়ে গেল।'

'পরিবারের আর সকলে আমার পক্ষে ছিলেন, সুতরাং সহজেই বাড়ির চারিদিকে কড়া পাহারা বসিয়ে দেওয়া গেল। তাঁর স্ত্রী ছেলেরা পালা ক'রে তাঁকে পাহারা দিতে লাগলেন, যাতে কোনক্রমে সে বিষ তাঁর কাছে পৌঁছতে না পারে। তিনি নিজে একরকম চলৎশক্তিহীন, বাড়ি থেকে বেরিয়ে যে সে জিনিস সংগ্রহ করবেন সে ক্ষমতা নেই। আমি এইভাবে তাঁকে আগলাবার ব্যবস্থা ক'রে দিয়ে বেশ একটু আত্মপ্রসাদ অনুভব করতে লাগলুম।

'কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'ল না। এত কড়াকড়ি সত্ত্বেও বাড়িসুদ্ধ লোকের নজর এড়িয়ে তিনি নেশা করতে লাগলেন; কোথা থেকে সে জিনিস আমদানি করছেন কেউ ধরতে পারল না।

'প্রথমটা আমার সন্দেহ হ'ল হয়তো বাড়ির কেউ লুকিয়ে তাঁকে সাহায্য করছে। তাই একদিন আমি নিজে সমস্ত দিন পাহারায় রইলুম। কিন্তু আশ্চর্য মশায়, আমার চোখের সামনে তিন-তিনবার সেই বিষ খেলেন। তাঁর নাড়ী দেখে বুঝলুম—অথচ কখন গেলেন ধরতে পারলুম না।

'তারপর তাঁর ঘর আতিপাতি করেছি, তাঁর সঙ্গে বাইরের লোকের দেখা করা একেবারে বন্ধ করে দিয়েছি, কিন্তু তবু তাঁর মৌতাত বন্ধ করতে পারিনি। এখনও সমভাবে সেই ব্যাপার চলছে।

'এখন আমার সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে এই যে, লোকটা ওই মাকড়সার রস পায় কোথা এবং পেলেও সকলের চোখে ধুলো দিয়ে খায় কি ক'রে?'

মোহন চুপ করিল। ব্যোমকেশ শুনিতে শুনিতে অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিল

কিনা বলিতে পারি না, মোহন শেষ করিতেই সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'অজিত, বাড়ি চল। একটা কথা হঠাৎ মাথায় এসেছে, যদি তা ঠিক হয়, তা হ'লে—'

বুঝিলাম, সেই পুরানো জালিয়াৎ আবার তাহাকে চাপিয়া ধরিয়াছে। মোহন এতক্ষণ যে বকিয়া গেল তাহার শেষের দিকের কথাগুলো হয়তো তাহার কানেও যায় নাই। আমি একটু অপ্রতিভভাবে বলিলাম, 'মোহনের গল্পটা বোধ হয় তুমি ভাল ক'রে শোননি—'

'বিলক্ষণ! শুনেছি বইকি। সমস্যাটা খুবই মজার—কৌতূহলও হচ্ছে, কিন্তু এখন কি আমার সময় হবে? আমি একটা বিশেষ শক্ত কাজে—'

মোহন মনে মনে বোধ হয় একটু ক্ষুণ্ণ হইল, কিন্তু সে ভাব গোপন করিয়া বলিল, 'তবে কাজ নেই, থাক্। আপনাকে এইসব তুচ্ছ ব্যাপারে মাথা ঘামাতে অনুরোধ করা অবশ্য অনুচিত; কিন্তু কি জানেন, এর একটা নিষ্পত্তি হ'লে হয়তো লোকটার প্রাণ বাঁচাতে পারা যেত। একটা লোক—যত বড় পাপিষ্ঠই হোক—বিন্দু বিন্দু বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করছে চোখের সামনে দেখছি, অথচ নিবারণ করতে পারছি না। এর চেয়ে দুঃখের আর কি হতে পারে?'

ব্যোমকেশ একটু লজ্জিত হইয়া বলিল, 'আমি করব না বলিনি তো। এ ধাঁধার উত্তর পেতে হ'লে ঘণ্টা দুয়েক ভাবতে হবে; আর একবার লোকটিকে দেখলেও ভাল হয়। কিন্তু আজ বোধ হয় তা পেরে উঠব না। নন্দদুলালবাবুর মত অসামান্য লোককে কিছুতেই মরতে দেওয়া যেতে পারে না। সে আমি দেবও না—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। কিন্তু এখন আমায় বাসায় ফিরতে হচ্ছে। মনে হচ্ছে জালিয়াৎ লোকটিকে ধ'রে ফেলেছি। কিন্তু একবার কাগজগুলো ভাল করে দেখা দরকার। সুতরাং আজকের রাতটা নন্দদুলালবাবু নিশ্চিন্ত মনে বিষ পান ক'রে নিন—কাল থেকে আমি তাঁকে জব্দ ক'রে দেব।'

মোহন হাসিয়া বলিল, 'বেশ কালই হবে। কখন আপনার সুবিধে হবে বলুন—আমি কা'র পাঠিয়ে দেব।'

ব্যোমকেশ একটু চিন্তা করিয়া বলিল, 'আচ্ছা, এক কাজ করা যাক্, তাতে আপনার উৎকন্ঠার অনেকটা লাঘব হবে। অজিত আজ আপনার সঙ্গে গিয়ে দেখে শুনে আসুক; তারপর ওর মুখে সব কথা শুনে আজ রাত্রেই কিংবা কাল সকালে আমি আপনার ধাঁধাঁর উত্তর দিয়ে দেব।'

ব্যোমকেশের বদলে আমি যাইব, ইহাতে মোহনের মুখে যে নিরাশার ভাব ফুটিয়া উঠিল তাহা কাহারো চক্ষু এড়াইবার নয়। ব্যোমকেশ তাহা দেখিয়া হাসিয়া বলিল, 'আপনার বাল্যবন্ধু ব'লেই বোধ হয় অজিতের ওপর আপনার তেমন—ইয়ে—নেই। কিন্তু হতাশ হবেন না, সৎসঙ্গে প'ড়ে ওর বুদ্ধি এখন এমনি ভীষণ তীক্ষ্ম হয়ে উঠেছে যে, তার দু-একটা দৃষ্টান্ত শুনলে আপনিও অবাক হ'য়ে যাবেন। হয়তো ও নিজেই আপনার এই ব্যাপারের সমস্ত রহস্য উদ্‌ঘাটিত ক'রে দেবে, আমাকে দরকার হবে না।'

এত বড় সুপারিশেও মোহন বিন্দুমাত্র উৎসাহিত হইল না। রুই, কাৎলা ধরিবার আশায় ছিপ ফেলিয়া যাহারা সন্ধ্যাকালে পুঁটিমাছ ধরিয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করে, তাহাদের মত মুখভাব করিয়া সে বলিল, 'অজিতই চলুক তা হ'লে। কিন্তু

ও যদি না পারে—'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, সে আর বলতে। তখন তো আমি আছিই।' ব্যোমকেশ আমাকে আড়ালে ডাকিয়া বলিল, 'সব জিনিস ভাল ক'রে লক্ষ্য ক'রো, আর চিঠিপত্র কি আসে খোঁজ নিও।'—এই বলিয়া সে প্রস্থান করিল।

ব্যোমকেশকে অনেক জটিল রহস্যের মর্মোদ্ঘাটন করিতে দেখিয়াছি ও তাহাতে সাহায্য করিয়াছি। তাহার অনুসন্ধান-পদ্ধতিও এতদিন একসঙ্গে থাকিয়া অনেকটা আয়ত্ত হইয়াছে। তাই মনে মনে ভাবিলাম, এই সামান্য ব্যাপারের কিনারা করিতে পারিব না? বিশেষ, আমার প্রতি মোহনের বিশ্বাসের অভাব দেখিয়া ভিতরে ভিতরে একটা জিদও চাপিয়াছিল, যেমন করিয়া পারি এ ব্যাপারের নিষ্পত্তি করিব।

* * * *

মনে মনে এইরূপ সংকল্প আঁটিয়া মোহনের সহিত লেক হইতে বাহির হইলাম। বাস আরোহণে যখন নির্দিষ্ট স্থানের নিকট উপস্থিত হইলাম, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে—রাস্তার গ্যাস জ্বলিয়া উঠিতেছে। মোহন পথ দেখাইয়া লইয়া চলিল। সারকুলার রোড হইতে একটা গলি ধরিয়া কিছুদূর অগ্রসর হইবার পর সম্মুখে একটা লোহার রেলিংযুক্ত বড় বাড়ি দেখাইয়া মোহন বলিল, 'এই বাড়ি।'

দেখিলাম, সেকেলে ধরনের পুরাতন বাড়ি, সম্মুখে লোহার ফটকে টুল পাতিয়া দারোয়ান বসিয়া আছে। মোহনকে দেখিয়া সেলাম করিয়া পথ ছাড়িয়া দিল, কিন্তু আমার প্রতি সন্দিগ্ধ দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, 'বাবুজী, আপকো ভিতর যানা—'

মোহন হাসিয়া বলিল, 'ভয় নেই দারোয়ান, উনি আমার বন্ধু।'

'বহুত খুব।—দারোয়ান সরিয়া দাঁড়াইল। আমরা বাড়ির সম্মুখস্থ অঙ্গনে প্রবেশ করিলাম।'

অঙ্গন পার হইয়া বারান্দায় উঠিতেই ভিতর হইতে একটি বিশ-বাইশ বছরের যুবক বাহির হইয়া আসিল, বলিল, 'কে ডাক্তারবাবু? আসুন।' আমার দিকে সপ্রশ্ন নেত্রে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'ইনি—?'

মোহন তাহাকে একটু তফাতে লইয়া গিয়া নিম্নকণ্ঠে কি বলিল, যুবকও উত্তর দিল, 'বেশ তো, বেশ তো, উনি আসুন না।'

মোহন তখন পরিচয় করাইয়া দিল—গৃহস্বামীর জ্যেষ্ঠ পুত্র, নাম অরুণ। তাহার অনুবর্তী হইয়া আমরা বাড়ির ভিতর প্রবেশ করিলাম। দুইটা ঘর অতিক্রম করিয়া তৃতীয় ঘরের বন্ধ দরজায় করাঘাত করিতেই ভিতর হইতে একটা কলহ-তীক্ষ্ম ভাঙা কণ্ঠস্বর শুনা গেল, 'কে? কে তুমি? এখন আমায় বিরক্ত ক'রো না, আমি লিখছি।'

অরুণ বলিল, 'বাবা, ডাক্তারবাবু এসেছেন। অভয়, দোর খোল।' একটি আঠারো-উনিশ বছর বয়সের যুবক—বোধহয় গৃহস্বামীর দ্বিতীয় পুত্র—দ্বার খুলিয়া দিল। আমরা সকলে ঘরে প্রবেশ করিলাম।

অরুণ চুপি চুপি অভয়কে জিজ্ঞাসা করিল, 'খেয়েছেন?'

অভয় ম্লানভাবে ঘাড় নাড়িল।

ঘরে ঢুকিয়াই প্রথমে দৃষ্টি পড়িল, ঘরের মধ্যস্থলে খাটের উপর বিছানা পাতা রহিয়াছে এবং সেই বিছানায় বালিশ ঠেস দিয়া বসিয়া, ডান হাতে উত্থিত কলম ধরিয়া

অতি শীর্ণকায় নন্দদুলালবাবু রুক্ষ-কষায়িত নেত্রে আমাদের দিকে চাহিয়া আছেন। মাথার উপর উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলো জ্বলিতেছিল, আর একটা টেবিল ল্যাম্প খাটের ধারে উঁচু টিপাইয়ের উপর রাখা ছিল ; তাই লোকটির সমস্ত অবয়ব ভাল করিয়া দেখিতে পাইলাম। তাঁহার বয়স বোধ করি পঞ্চাশের নীচেই, কিন্তু মাথার চুল সমস্ত পাকিয়া একটা শ্রীহীন পাংশুটে বর্ণ ধারণ করিয়াছে। হাড় চওড়া, ধারালো মুখে মাংসের লেশমাত্র নাই, হনুর অস্থি দুটা যেন চর্ম ভেদ করিয়া বাহির হইবার উপক্রম করিতেছে—পাতলা দ্বিধাভগ্ন নাক া মুখের উপর গৃধ্রের মত ঝুলিয়া পড়িয়াছে, চোখ দুটো কোনো অস্বাভাবিক উত্তেজনার ফলে অত্যন্ত উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু উত্তেজনার অবসানে আবার যে তাহা মৎস্যচক্ষুর মত ভাবলেশহীন হইয়া পড়িবে তাহার আভাসও সে-চক্ষে লুক্কায়িত আছে। নিম্নের ঠোঁট শিথিল হইয়া ঝুলিয়া পড়িয়াছে। সব মিলিয়া মুখের উপর একটা কদাকার ক্ষুধিত অসন্তোষ যেন রেখায় রেখায় চিহ্নিত হইয়া আছে।

কিছুক্ষণ এই প্রেতাকৃতি লোকটির দিকে বিস্মিতভাবে চাহিয়া থাকিয়া দেখিলাম, তাঁহার বাঁ হাতটা থাকিয়া থাকিয়া অকারণে আবর্তিত হইয়া উঠিতেছে, যেন সেটা স্বাধীনভাবে দেহ হইতে সম্পূর্ণ বিমুক্ত হইয়া নৃত্য শুরু করিয়া দিয়াছে। মৃত ব্যাঙের দেহ তড়িৎস্পর্শে চমকাইয়া উঠিতে যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারা এই স্নায়ু-নৃত্য কতকটা আন্দাজ করিতে পারিবেন।

নন্দদুলালবাবুও স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাইয়াছিলেন, সেই ভাঙা অথচ তীব্র স্বরে বলিয়া উঠিলেন, 'ডাক্তার, এ আবার কাকে নিয়ে এসেছ এখানে ? কি চায় লোকটা ? যেতে বল—যেতে বল—'

মোহন চোখের একটা ইশারা করিয়া আমাকে জানাইল যে, আমি যেন গৃহস্বামীর এরূপ সম্ভাষণে কিছু মনে না করি ; তারপর শয্যার উপর হইতে বিক্ষিপ্ত কাগজগুলা সরাইয়া শয্যাপার্শে রাখিয়া রোগীর নাড়ী হাতে লইয়া স্থির হইয়া দেখিতে লাগিল। নন্দদুলালবাবু মুখে একটা বিকৃত হাস্য লইয়া একবার আমার পানে একবার ডাক্তারের পানে তাকাইতে লাগিলেন। বাঁ হাতটা তেমনই নৃত্য করিতে লাগিল।

শেষে ছাড়িয়া দিয়া মোহন বলিল, আবার খেয়েছেন ?'

'বেশ করেছি—কার বাবার কি ?

মোহন অধর দংশন করিল, তারপর বলিল, 'এতে নিজেরই কেবল ক্ষতি করছেন, আর কারু নয়। কিন্তু সে তো আপনি বুঝবেন না, বোঝবার ক্ষমতাই নেই। ঐ বিষ খেয়ে খেয়ে মস্তিষ্কের দফারফা ক'রে ফেলেছেন।'

নন্দদুলালবাবু মুখের একটা পৈশাচিক বিকৃতি করিয়া বলিলেন, 'তাই নাকি এয়ার ? মস্তিষ্কের দফারফা ক'রে ফেলেছি ? কিন্তু ঘরে তো সেপাই বসিয়ে দিয়েছ, —কই ধরতে পারলে না ?'—বলিয়া হি-হি করিয়া এক অশ্রাব্য হাসি হাসিতে লাগিলেন।

মোহন বিরক্তভাবে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'আপনার সঙ্গে কথা কওয়াই ঝকমারি ! যা করছিলেন করুন।'

নন্দদুলালবাবু পূর্ববৎ হি-হি করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'দুয়ো ডাক্তার দুয়ো, আমায় ধরতে পারলে না, ধিনতা ধিনা পাকা নোনা—' সঙ্গে সঙ্গে দুই হাতের

বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ তুলিয়া নাড়িতে লাগিলেন।

নিজের পুত্রদের সম্মুখে ওই কদর্য অসভ্যতা আমার অসহ্য বোধ হইতে লাগিল; মোহনের বোধ করি ধৈর্যের বন্ধন ছিঁড়িবার উপক্রম করিতেছিল, সে আমাকে বলিল, 'নাও অজিত, কি দেখবে দেখে শুনে নাও, আর পারা যায় না।'

হঠাৎ বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ আস্ফালন থামাইয়া নন্দদুলালবাবু সর্পচক্ষু আমার দিকে ফিরাইয়া কটুকণ্ঠে কহিলেন, 'কে হে তুমি—আমার বাড়িতে কোন্ মতলবে ঢুকেছ?' আমি কোন জবাব দিলাম না তখন, 'চালাকি করবার আর জায়গা পাওনি? ওসব ফন্দিফিকির এখানে চলবে না যাদু বুঝেছ? এই বেলা চটপট স'রে পড়, নইলে পুলিস ডাকব।—যত সব নচ্ছার ছিঁচকে চোরের দল।' বলিয়া মোহনকেও নিজের দৃষ্টির মধ্যে সাপটাইয়া লইলেন। সে আমাকে কি উদ্দেশ্যে আনিয়াছে ঠিক না বুঝিলেও আমার উপর তাঁহার ঘোর সন্দেহ জন্মিয়াছিল।

অরুণ লজ্জিতভাবে আমার কানে কানে বলিল, 'ও'র কথায় কান দেবেন না। ওটা খেলে ও'র আর জ্ঞান থাকে না।'

মনে মনে ভাবিলাম, কি ভয়ঙ্কর এই বিষ যাহা মানুষের সমস্ত গোপন দুষ্প্রবৃত্তিকে এমন উগ্র প্রকট করিয়া তোলে! যে ব্যক্তি জানিয়া শুনিয়া ইহা খায় তাহার নৈতিক অধোগতির মাত্রাই বা কে নিরূপণ করিবে?

ব্যোমকেশ বলিয়াছিল সবদিক ভাল করিয়া লক্ষ্য করিতে, তাই যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি ঘরের চতুর্দিক ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিয়া লইলাম। ঘরটা বেশ বড়, আসবাবপত্রও অধিক নাই,—একটা খাট, গোটা দুই তিন চেয়ার, একটা আলমারি ও একটা তেপায়া টেবিল। এই টেবিলের উপর ল্যাম্পটা রাখা আছে এবং তাহার পাশে কয়েক দিস্তা অলিখিত কাগজ ও অন্যান্য লেখার সরঞ্জাম রহিয়াছে। লিখিত কাগজগুলো অবিন্যস্তভাবে চারিদিকে ছড়ানো। আমি একতাড়া কাগজ তুলিয়া কয়েক ছত্র পড়িয়াই রাখিয়া দিলাম; মোহন যাহা বলিয়াছিল তাহা সত্য। এ লেখা পড়িলে ফরাসী বস্তুতান্ত্রিক এমিল জোলারও বোধ করি গা-ঘিনঘিন করিত। তাই নয়, লেখার বিশেষ রসালো স্থলগুলিতে লাল কালির দাগ দিয়া লেখক মহাশয় সেইদিকে আকর্ষণের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। বস্তুত, এতখানি নোংরা জঘন্য মনের পরিচয় আর কোথাও পাইয়াছি বলিয়া স্মরণ হইল না।

নন্দদুলালবাবুর দিকে একটা ঘৃণাপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিলাম, তিনি আবার লেখায় মন দিয়াছেন। পার্কারের কলম দ্রুতবেগে কাগজের উপর সঞ্চরণ করিয়া চলিয়াছে, পাশের টেবিলে দোয়াতদানিতে আর একটা মেটে লাল রঙের পার্কারের ফাউন্টেন পেন রাখা আছে, লেখা শেষ হইলেই বোধ করি দাগ দেওয়া আরম্ভ হইবে।

হইলও তাই, পাতাটা শেষ হইতেই নন্দদুলালবাবু কালো কলম রাখিয়া লাল কলমটা লইয়া আঁচড় কাটিয়া দেখিলেন, কালি ফুরাইয়া গিয়াছে। তখন টেবিলের উপর হইতে লাল কালির চ্যাপ্টা শিশি লইয়া তাহাতে কালি ভরিলেন, তারপর গম্ভীরভাবে নিজের লেখার মণিমুক্তাগুলি চিহ্নিত করিতে লাগিলেন।

আমি মুখ ফিরাইয়া লইয়া ঘরের অন্যান্য জিনিস দেখিতে লাগিলাম। আলমারিটাতে কিছু ছিল না, শুধু কতকগুলা অর্ধেক-শূন্য ঔষধের শিশি

পড়িয়াছিল। মোহন বলিল, সেগুলো তাহারই প্রদত্ত ঔষধ। ঘরে দুটি জানালা, দুটি দরজা। একটি দরজা দিয়া আমরা প্রবেশ করিয়াছিলাম, অন্যটি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম ওদিকে স্নানের ঘর ইত্যাদি আছে। সে ঘরটাও দেখিলাম; বিশেষ কিছু নাই, কয়েকটা কাচা কাপড়, তোয়ালে, তেল, সাবান, মাজন ইত্যাদি রহিয়াছে।

জানালা দুটো সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া জানা গেল, বাহিরের সহিত উহাদের কোনো যোগ নাই, তাছাড়া অধিকাংশ সময়ই বন্ধ থাকে।

ব্যোমকেশ থাকিলে কিভাবে অনুসন্ধান করিত তাহা কল্পনা করিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু কিছুই ভাবিয়া পাইলাম না। দেয়াল টোকা মারিয়া দেখিব কি না ভাবিতেছি—হয়তো কোথাও গুপ্ত দরজা আছে, এমন সময় চোখে পড়িল দেয়ালে একটা তাকের উপর একটি চাঁদির আতরদানি রহিয়াছে। সাগ্রহে সেটাকে পরীক্ষা করিলাম; তাহার মধ্যে খানিকটা তুলা ও খোপে আতর রহিয়াছে। চুপি চুপি অরুণকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'উনি আতর মাখেন নাকি?'

সে অনিশ্চিতভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল, 'কি জানি। বোধ হয়, না। মাখলে গন্ধ পাওয়া যেত।'

'এটা কতদিন এ ঘরে আছে?'

'তা বরাবরই আছে। বাবাই ওটা আনিয়ে ঘরে রেখেছিলেন।'

ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলাম, লেখা বন্ধ করিয়া নন্দদুলালবাবু এই দিকেই তাকাইয়া আছেন। মন উত্তেজিত হইয়া উঠিল, খানিকটা তুলা আতরে ভিজাইয়া পকেটে পুরিয়া লইলাম।

তারপর ঘরের চারিদিকে একবার শেষ দৃষ্টিপাত করিয়া বাহির হইয়া আসিলাম। নন্দদুলালবাবুর দৃষ্টি আমাকে অনুসরণ করিল; দেখিলাম, তাঁহার মুখে সেই শ্লেষপূর্ণ কদর্য হাসিটা লাগিয়া আছে।

বাহিরে আসিয়া আমরা বারান্দায় বসিলাম, আমি বলিলাম 'এখন আপনাদের কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই, কোনও কথা গোপন না ক'রে উত্তর দেবেন।'

অরুণ বলিল, 'বেশ জিজ্ঞাসা করুন।'

আমি বলিলাম, 'আপনারা ওঁকে সর্বদা নজরবন্দীতে রেখেছেন? কে কে পাহারা দেয়?'

'আমি অভয় আর মা পালা ক'রে ওঁর কাছে থাকি। চাকরবাকর বা অন্য কাউকে কাছে যেতে দিই না।'

'ওঁকে কখনও ও-জিনিস খেতে দেখেছেন?'

'না, মুখে দিতে দেখিনি। তবে খেয়েছেন তা জানতে পেরেছি।'

'জিনিসটার চেহারা কি রকম কেউ দেখেছেন?'

'যখন প্রকাশ্যে খেতেন তখন দেখেছিলুম। জলের মতন জিনিস, হোমিওপ্যাথিক শিশিতে থাকত; তাই কয়েক ফোঁটা শরবৎ কিংবা অন্য কিছুর সঙ্গে মিশিয়ে খেতেন।'

'সে রকম শিশি ঘরে কোথাও নেই ঠিক জানেন?'

'ঠিক জানি। আমরা তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজেছি।'

'তা হ'লে নিশ্চয় বাইরে থেকে আসে। কে আনে!'

অরুণ মাথা নাড়িল, 'জানি না।'

'আপনারা তিনজন ছাড়া আর কেউ ও-ঘরে ঢোকে না না? ভাল ক'রে ভেবে দেখুন।'

'না, কেউ না। এক ডাক্তারবাবু ছাড়া।'

আমার জেরা ফুরাইয়া গেল—আর কি জিজ্ঞাসা করিব? গালে হাত দিয়া ভাবিতে ভাবিতে ব্যোমকেশের উপদেশ স্মরণ হইল; পুনশ্চ আরম্ভ করিলাম, ওঁর কাছে কোনও চিঠিপত্র আসে?'

'না।'

'কোন পার্সেল কি অন্য রকম কিছু?'

এইবার অরুণ বলিল, 'হ্যাঁ, হপ্তায় একখানা ক'রে রেজেস্ট্রী চিঠি আসে।'

আমি উৎসাহে লাফাইয়া উঠিলাম, 'কোত্থেকে আসে? কে পাঠায়?'

লজ্জায় ঘাড় নিচু করিয়া অরুণ আস্তে আস্তে বলিল, 'কলকাতা থেকেই আসে; রেবেকা লাইট নামে একজন স্ত্রীলোক পাঠায়।'

আমি বলিলাম, 'হুঁ বুঝেছি। চিঠিতে কি থাকে আপনারা দেখেছেন কি?'

'দেখেছি।' বলিয়া অরুণ মোহনের পানে তাকাইল।

'আমি সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলাম কি থাকে?'

'সাদা কাগজ।'

'সাদা কাগজ?'

'হ্যাঁ, খালি কতকগুলো সাদা কাগজ খামের মধ্যে পোরা থাকে—আর কিছু না।'

আমি হতবুদ্ধির মত প্রতিধ্বনি করিলাম, 'আর কিছু না?'

'না।'

কিছুক্ষণ নির্বাক হইয়া তাকাইয়া রহিলাম; 'ঠিক জানেন, খামের ভিতর আর কিছু থাকে না?'

অরুণ একটু হাসিয়া বলিল, 'ঠিক জানি। বাবা নিজে পিওনের সামনে রসিদ দস্তখত ক'রে চিঠি নেন বটে, কিন্তু আগে আমিই চিঠি খুলি। তাতে সর্বদা কাগজ ছাড়া আর কিছুই থাকে না।'

'প্রত্যেক বার আপনিই চিঠি খোলেন? কোথায় খোলেন?'

'বাবার ঘরে। সেইখানেই পিওন চিঠি নিয়ে যায় কিনা।'

'কিন্তু এ তো ভারি আশ্চর্য ব্যাপার: সাদা কাগজ রেজেস্ট্রী করে পাঠাবার মানে কি?'

মাথা নাড়িয়া অরুণ বলিল, 'জানি না।'

আরও কিছুক্ষণ বোকার মত বসিয়া থাকিয়া শেষে একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া পড়িলাম। রেজেস্ট্রী চিঠির কথা শুনিয়া মনে আশা হইয়াছিল যে, ফন্দিটা বুঝি ধরিয়া ফেলিয়াছি। কিন্তু না, ওদিকের দরজায় একেবারে তালা লাগানো। বুঝিলাম, আপাতদৃষ্টিতে ব্যাপার সামান্য ঠেকিলেও, আমার বুদ্ধিতে কুলাইবে না। 'তুলা শুনিতে নরম কিন্তু ধুনিতে লবেজান।' ঐ বিষজর্জরিতদেহ অকালপঙ্গু বুড়া লম্পটকে আঁটিয়া উঠা আমার কর্ম নয়,—এখানে ব্যোমকেশের সেই শানিত

ঝকঝকে মস্তিষ্কটি দরকার।

মলিন মুখে ব্যোমকেশকে সকল কথা জানাইব বলিয়া বাহির হইতেছি, একটা কথা স্মরণ হইল। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'নন্দদুলালবাবু কাউকে চিঠিপত্র লেখেন?'

অরুণ বলিল, 'না, তবে মাসে মাসে মনিঅর্ডার ক'রে টাকা পাঠান।'

'কাকে পাঠান?'

লজ্জাম্লান মুখে অরুণ বলিল, 'ঐ ইহুদী স্ত্রীলোকটাকে।'

মোহন ব্যাখ্যা করিয়া বলিল, 'ঐ স্ত্রীলোকটা আগে নন্দদুলালবাবুর—'

'বুঝেছি। কত টাকা পাঠান?'

'একশো টাকা। কিন্তু কেন পাঠান তা বলতে পারি না।'

মনে মনে ভাবিলাম, পেনশন। কিন্তু মুখে সে কথা না বলিয়া একাকী বাহির হইয়া পড়িলাম। মোহন রহিয়া গেল।

বাসায় পৌঁছিতে রাত্রি আটটা বাজিল।

ব্যোমকেশ লাইব্রেরি-ঘরে ছিল, দ্বারে ধাক্কা দিতেই কবাট খুলিয়া বলিল, 'কি খবর? সমস্যা ভঞ্জন হ'ল?'

'না।'—আমি ঘরে ঢুকিয়া একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িলাম। ইতিপূর্বে ব্যোমকেশ একটা মোটা লেন্স লইয়া একখণ্ড কাগজ পরীক্ষা করিতেছিল, এখন আবার যন্ত্রটা তুলিয়া লইল। তারপর আমার দিকে একটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হানিয়া বলিল, 'ব্যাপার কি? এত শৌখিন হয়ে উঠলে কবে থেকে? আতর মেখেছ যে?'

'মাখিনি, নিয়ে এসেছি।' তাহাকে আদ্যোপান্ত সমস্ত বিবরণ বর্ণনা করিয়া শুনাইলাম, সেও বোধ হয় মন দিয়া শুনিল। উপসংহারে আমি বলিলাম, 'আমার দ্বারা তো হ'ল না ভাই। এখন দেখ, তুমি যদি কিছু পার। তবে আমার মনে হয় এই আতরটা অ্যানালাইজ করলে কিছু পাওয়া যেতে পারে।'

'কি পাওয়া যাবে—মাকড়সার রস?—ব্যোমকেশ আমার হাত হইতে তুলাটা লইয়া তাহার আঘ্রাণ গ্রহণ করিয়া বলিল, 'আঃ! চমৎকার গন্ধ! খাঁটি অম্বুরি!' তুলাটা হাতের চামড়ার উপর ঘষিতে ঘষিতে বলিল, 'হ্যাঁ, কি বলছিলে? কি পাওয়া যেতে পারে?'

আমি একটু ইতস্তত করিয়া বলিলাম, 'হয়তো নন্দদুলালবাবুর আতর মাখবার ছল ক'রে—'

ব্যোমকেশ হাসিয়া উঠিল—'এক মাইল দূর থেকে যার গন্ধ পাওয়া যায়, সে জিনিস কেউ লুকিয়ে ব্যবহার করতে পারে? নন্দদুলালবাবু যে আতর মাখেন কোনও প্রমাণ পেয়েছ?'

'তা পাই নি বটে; কিন্তু—'

'না হে না, ওদিকে নয়, অন্যদিকে সন্ধান কর। কি ক'রে জিনিসটা ঘরের মধ্যে আসে, কি ক'রে নন্দদুলালবাবু সকলের চোখের সামনে সেটা মুখে দেন—এইসব কথা ভেবে দেখ। রেজেস্ট্রী করে সাদা কাগজ কেন আসে? ঐ স্ত্রীলোকটাকে টাকা পাঠানো হয় কেন? ভেবে দেখেছ?'

আমি হতাশভাবে বলিলাম, 'অনেক ভেবেছি, কিন্তু আমার দ্বারা হ'ল না।'

'আরও ভাবো—কষ্ট না করলে কি কেষ্ট পাওয়া যায়? গম্ভীরভাবে ভাবো,

একাগ্রচিত্তে ভাবো, নাছোড়বান্দা হয়ে ভাবো।' বলিয়া সে আবার লেন্সটা তুলিয়া লইল।

আমিও জিজ্ঞাসা করিলাম ; 'আর তুমি ?'

'আমিও ভাবছি। কিন্তু একাগ্রচিত্তে ভাবা বোধহয় হয়ে উঠবে না। আমার জালিয়াৎ—' বলিয়া সে টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল।

আমি ঘর হইতে উঠিয়া আসিয়া আমাদের বসিবার ঘরে আরাম-কেদারাটায় লম্বা হইয়া আবার ভাবিতে আরম্ভ করিলাম, সত্যই তো, কি এমন কঠিন কাজ যে, আমি পারিব না ? নিশ্চয় পারিব।

প্রথমত, রেজেস্ট্রী করিয়া সাদা কাগজ আসিবার সার্থকতা কি ? অদৃশ্য কালি দিয়া তাহাতে কিছু লেখা থাকে ? যদি তাই থাকে তাহাতে নন্দদুলালবাবুর কি সুবিধা হয় ? জিনিসটা তো তাঁহার কাছে পেঁছিতে পারে না।

আচ্ছা, ধরিয়া লওয়া যাক্ জিনিসটা কোনক্রমে বাহির হইতে ঘরের ভিতরে আসিয়া পেঁছিল ; কিন্তু সেটা নন্দদুলালবাবু রাখেন কোথায় ? হোমিওপ্যাথিক ঔষধের শিশিও লুকাইয়া রাখা সহজ কথা নয়। অষ্টপ্রহর সতর্ক চক্ষু তাঁহাকে ঘিরিয়া আছে, তাহার পর প্রত্যহ খানাতল্লাস চলিতেছে। তবে ?

ভাবিতে ভাবিতে মাথা গরম হইয়া উঠিল, পাঁচটা চুরুট পুড়িয়া ভস্মীভূত হইয়া গেল,—কিন্তু একটা প্রশ্নেরও উত্তর পাইলাম না। নিরাশ হইয়া প্রায় হাল ছাড়িয়া দিয়াছি, এমন সময় একটা অপূর্ব আইডিয়া মাথায় ধরিয়া গেল। ধড়মড় করিয়া আরাম কেদারায় উঠিয়া বসিলাম।

এও কি সম্ভব ? কিংবা নয়ই বা কেন ? শুনিতে একটু অস্বাভাবিক ঠেকিলেও—এছাড়া আর কি হইতে পারে ? ব্যোমকেশ বলিয়াছে কোন বিষয়ের যুক্তিসঙ্গত প্রমাণ যদি থাকে অথচ তাহা আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব বলিয়া মনে হয়, তবু তাহা সত্য বলিয়া ধরিতে হইবে। এ ক্ষেত্রেও ইহাই তো সমস্যার একমাত্র সমাধান।

ব্যোমকেশকে বলিব মনে করিয়া উঠিয়া যাইতেছি, ব্যোমকেশ নিজেই আসিয়া প্রবেশ করিল ; আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, 'কি ? ভেবে বার করলে না কি ?'

'বোধহয় করেছি।'

'বেশ বেশ। কি বার করলে ?'

বলিতে গিয়া একটু বাধ-বাধ ঠেকিতে লাগিল, তবু জোর করিয়া সঙ্কোচ সরাইয়া বলিলাম, 'দেখ নন্দদুলালবাবুর ঘরের দেয়ালে কতকগুলো মাকড়সা দেখছি, এখন মনে পড়ল। আমার বিশ্বাস তিনি সেগুলোকে—'

'ধরে ধরে খান।' ব্যোমকেশ হো-হো করিয়া উচ্চরবে হাসিয়া উঠিল, 'অজিত, তুমি একেবারে একটি জিনিয়াস। তোমার জোড়া নেই। দেয়ালের মাকড়সা ধরে ধরে খেলে নেশা হবে না ভাই, গা-ময় গরলের ঘা ফুটে বেরুবে। বুঝলে ?'

আমি উত্তপ্ত হইয়া বলিলাম, 'বেশ, তবে তুমিই বল।'

ব্যোমকেশ চেয়ারে বসিয়া টেবিলের উপর পা তুলিয়া দিল। অলসভাবে একটা চুরুট ধরাইতে ধরাইতে বলিল, সাদা কাগজ ডাকে কেন আসে বুঝতে পেরেছ ?'

'না।'

'নন্দদুলালবাবু দিবারাত্রি অশ্লীল গল্প লেখেন কেন তাও বুঝতে পার নি?'

'না। তুমি বুঝেছ?'

'বোধহয় বুঝেছি।' ব্যোমকেশ চুরুটে দীর্ঘ টান দিয়া নিমীলিত নেত্রে কহিল, 'কিন্তু একটা বিষয়ে নিঃসন্দেহভাবে না-জানা পর্যন্ত প্রকাশ করা সমীচীন হবে না।'

'কি বিষয়ে?'

ব্যোমকেশ মুদিতচক্ষে বলিল, 'আগে জানা দরকার নন্দদুলালবাবুর জিভ কোন্ রঙের।'

মনে হইল, ব্যোমকেশ আমাকে পরিহাস করিতেছে। রুষ্ট মুখে বলিলাম, 'ঠাট্টা হচ্ছে বুঝি?'

'ঠাট্টা!' ব্যোমকেশ চোখ খুলিয়া আমার মুখের ভাব দেখিয়া বলিল, 'রাগ করলে? সত্যি বলছি ঠাট্টা নয়। নন্দদুলালবাবুর জিভের রঙের ওপরেই সব নির্ভর করছে। যদি তাঁর জিভের রঙ লাল হয়, তা হ'লে বুঝব আমার অনুমান ঠিক, আর যদি না হয়—। তুমি বোধহয় লক্ষ্য কর নি?'

আমি রাগ করিয়া বলিলাম, 'না, জিভ লক্ষ্য করবার কথা আমার মনে হয়নি।'

ব্যোমকেশ সহাস্যে বলিল, অথচ ঐটেই আগে মনে হওয়া উচিত ছিল। যাহোক, এক কাজ ক'র, ফোন ক'রে নন্দদুলালবাবুর ছেলের কাছ থেকে খবর নাও।

'রসিকতা করছি মনে করবে না তো?'

ব্যোমকেশ হাত নাড়িয়া কাব্যের ভাষায় বলিল, 'ভয় নাই তোর, ভয় নাই ওরে ভয় নাই···কিছু নাই তোর ভাবনা—'

পাশের ঘরে গিয়া নম্বর খুঁজিয়া ফোন করিলাম। মোহন তখনও সেখানে ছিল, সেই উত্তর দিল, 'ও-কথাটা দরকারী ব'লে মনে হয়নি, তাই বলিনি—নন্দদুলালবাবুর জিভের রঙ টকটকে লাল। কারণ তিনি বেশি পান খান—কেন বল দেখি?'

ব্যোমকেশকে ডাকিলাম, ব্যোমকেশ আসিয়া বলিল, 'লাল তো? তবে আর কি—হয়ে গেছে। দেখি।' আমার হাত হইতে ফোন লইয়া বলিল, 'ডাক্তারবাবু? ভালই হ'ল। আপনার ধাঁধার উত্তর পাওয়া গেছে। হ্যাঁ, অজিতই ভেবে বার করেছে—আমি একটু সাহায্য করেছি মাত্র। আমার জালিয়াৎ নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম তাই···হ্যাঁ জালিয়াৎকে ধরেছি।···বিশেষ কিছু করতে হবে না, কেবল নন্দদুলালবাবু ঘর থেকে লাল কালির দোয়াত আর লাল রঙের ফাউন্টেন পেনটা সরিয়ে দেবেন···হ্যাঁ, ঠিক ধরেছেন। কাল একবার আসবেন, তখন সব কথা বলব···আচ্ছা নমস্কার। অজিতকে আপনাদের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাব? বলেছিলুম কিনা যে, ওর বুদ্ধি আজকাল ভীষণ ধারালো হয়ে উঠেছে?' হাসিতে হাসিতে ব্যোমকেশ ফোন রাখিয়া দিল।

বসিবার ঘরে ফিরিয়া আসিয়া লজ্জিত মুখে বলিলাম, 'কতক কতক যেন বুঝতে পারছি; কিন্তু সব কথা পরিষ্কার করে বল। কেমন ক'রে বুঝলে?'

ঘড়ির দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া ব্যোমকেশ বলিল, খাবার সময় হ'ল, এখনি পুঁটিরাম ডাকতে আসবে। আচ্ছা, চটপট ব'লে দিচ্ছি শোন।—প্রথম থেকেই তুমি ভুল পথে যাচ্ছিলে। দেখতে হবে, জিনিসটা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে কি ক'রে। তার নিজের হাত পা নেই, সুতরাং কেউ তাকে নিশ্চয়ই নিয়ে আসে। কে সে? ঘরের মধ্যে পাঁচজন লোক ঢুকতে পায়—ডাক্তার, দুই ছেলে, স্ত্রী এবং আর একজন। প্রথম

চারজন বিষ খাওয়াবে না—এটা নিশ্চিত, অতএব ও পঞ্চম ব্যক্তির কাজ।'

'পঞ্চম ব্যক্তি কে?'

'পঞ্চম ব্যক্তি হচ্ছে পিওন। সে হপ্তায় একবার সই করাবার জন্যে নন্দদুলালবাবুর ঘরে ঢোকে। সুতরাং তার মারফতেই জিনিসটা ঘরে প্রবেশ করে।'

'কিন্তু খামের মধ্যে তো সাদা কাগজ ছাড়া আর কিছু থাকে না।'

'ঐখানেই ফাঁকি। সবাই মনে করে খামের মধ্যে জিনিসটা আছে, তাই পিওনকে কেউ লক্ষ্য করে না। লোকটা হুঁশিয়ার, সে অনায়াসে লাল কালির দোয়াত বদলে দিয়ে চ'লে যায়। রেজেস্ট্রী ক'রে সাদা কাগজ পাঠাবার উদ্দেশ্য হচ্ছে, কোনক্রমে পিওনকে নন্দদুলালবাবুর ঘরে ঢোকবার অবকাশ দেওয়া।'

'তারপর?'

'তুমি আর একটা ভুল করেছিলে; ইহুদী স্ত্রীলোকটাকে টাকা পাঠানো হয়—পেন্‌শনস্বরূপ নয়, ও প্রথা কোথাও প্রচলিত নেই—টাকাটা ওষুধের দাম, ও মাগীই পিয়নের হাতে ওষুধ সরবরাহ করে।'

'তা হ'লে দেখ, ওষুধ নন্দদুলালবাবুর হাতের কাছে এসে পেঁছিল, কেউ জানতে পারল না। কিন্তু অষ্টপ্রহর ধরে লোক থাকে, তিনি খাবেন কি ক'রে? নন্দদুলালবাবু গল্প লিখতে আরম্ভ করলেন। সর্বদাই হাতের কাছে লেখার সরঞ্জাম রয়েছে, তাই উঠে গিয়ে খাবারও দরকার নেই—গল্প লিখছেন, লাল কলম দিয়ে তাতে দাগ দিচ্ছেন এবং একটু ফাঁক পেলেই কলমের নিবটা চুষে নিচ্ছেন। কালি ফুরিয়ে গেলে আবার ফাউন্টেন পেন ভরে নিচ্ছেন। জিভের রঙ লাল কেন এখন বুঝতে পারছ?'

'কিন্তু লালই যে হবে তা বুঝলে কি ক'রে? কালোও তো হতে পারত?'

'হায় হায়, এটা বুঝলে না! কালো কালি যে বেশি খরচ হয়। নন্দদুলালবাবু ঐ অমূল্যনিধি কি বেশি খরচ দিতে পারেন? তাই লাল কালির ব্যবস্থা। তাছাড়া জিভে কালো কালির দাগ লাগলে ধরা পড়বার ভয়ও আছে।'

'বুঝেছি। এত সহজ—'

'সহজ তো বটেই কিন্তু যে লোকের মাথা থেকে এই সহজ বুদ্ধি বেরিয়েছে তার মাথাটা অবহেলার বস্তু নয়। এত সহজ ব'লেই তোমরা ধরতে পারছিলে না।'

'তুমি ধরলে কি ক'রে?'

'খুব সহজে। এই ব্যাপারে দুটো জিনিস সম্পূর্ণ নিরর্থক ব'লে মনে হয়—এক, রেজেস্ট্রী ক'রে সাদা কাগজ আসা; দুই, নন্দদুলালবাবুর গল্প লেখা। এই দুটোর সত্যি কারণ খুঁজতে গিয়েই আসল কথাটি বেরিয়ে পড়ল।'

পাশের ঘরে ঝনঝন করিয়া টেলিফোনের ঘণ্টি বাজিয়া উঠিল, আমরা দুজনেই তাড়াতাড়ি উঠিয়া গেলাম। ব্যোমকেশ ফোন ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কে আপনি? ও ডাক্তারবাবু, কি খবর? · নন্দদুলালবাবু চেঁচামেচি করছেন?···হাত পা ছুঁড়ছেন? তা হোক, তাতে কোন ক্ষতি হবে না।···ভারি অন্যায়—কিন্তু যখন তাঁর মুখ বন্ধ করা যাচ্ছে না, তখন আর উপায় কি?—অজিত ওসব গ্রাহ্য করে না। অবিমিশ্র প্রশংসা যে পৃথিবীতে পাওয়া যায় না তা সে জানে। মধু ও হুল—কমলে কণ্টক ··এই জগতের নিয়ম···আচ্ছা, নমস্কার।'

অগ্নিবাণ

১

খবরের কাগজখানা, হতাশ হস্ত সঞ্চালনে আমার কোলের উপর ফেলিয়া দিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'নাঃ, কোথাও কিছু নেই, একেবারে ফাঁকা। এর চেয়ে কাগজ-ওয়ালারা সাদা কাগজ বের করলেই পারে। তাতে ছাপার খরচটা অন্তত বেঁচে যায়।'

আমি খোঁচা দিয়া বলিলাম, 'বিজ্ঞাপনেও কিছু পেলে না? বল কি? তোমার মতে তো দুনিয়ার যত কিছু খবর সব ওই বিজ্ঞাপন-স্তম্ভের মধ্যেই ঠাসা আছে!'

বিমর্ষ-মুখে চুরুট ধরাইয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'না, বিজ্ঞাপনেও কিছু নেই। একটা লোক বিধবা বিয়ে করতে চায় ব'লে বিজ্ঞাপন দিয়েছে; কুমারী ছেড়ে বিধবা বিয়ে করবার জন্যেই গোঁ ধরেছে কেন, ঠিক বোঝা গেল না। নিশ্চয় কোনও বদ মতলব আছে।'

'তা তো বটেই। আর কিছু?'

'আর একটা বীমা-কোম্পানি মহা ঘটা ক'রে বিজ্ঞাপন দিয়েছে যে, তারা স্বামী-স্ত্রীর জীবন একসঙ্গে বীমা করবে এবং জোড়ার মধ্যে একটাকে কোনও রকমে পটল তোলাতে পারলেই অন্য জন টাকা পাবে। এইসব বীমা-কোম্পানি এমন ক'রে তুলেছে যে, ম'রেও সুখ নেই।'

'কেন, এর মধ্যেও বদ মতলব আছে নাকি?'

'বীমা-কোম্পানীর নিজের স্বার্থ না থাকতে পারে, কিন্তু অন্যের মনে দুর্বুদ্ধি জাগিয়ে তোলাও সৎকার্য নয়।'

'অর্থাৎ?' মানে হ'ল কি?'

ব্যোমকেশ উত্তর দিল না, হৃদয়ভারাক্রান্ত একটি দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়া টেবিলের উপর পা তুলিয়া দিল, তারপর কড়িকাঠের দিকে অনুযোগপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাইয়া নীরবে ধূম উদ্‌গিরণ করিতে লাগিল।

শীতকাল। বড়দিনের ছুটি চলিতেছিল। কলিকাতার লোক বাহিরে গিয়া ও বাহিরের লোক কলিকাতায় আসিয়া মহাসমারোহে ছুটি উদ্‌যাপন করিতেছিল। কয়েক বছর আগেকার কথা, তখন ব্যোমকেশের বিবাহ হয় নাই।

আমরা দুইজনে চিরন্তন অভ্যাসমত সকালে উঠিয়া একত্রে চা-পান ও সংবাদপত্রের ব্যবচ্ছেদ করিতেছিলাম। গত তিনমাস একেবারে বেকার ভাবে বসিয়া থাকিয়া ব্যোমকেশের ধৈর্যের লৌহ-শৃঙ্খলও বোধকরি ছিঁড়িবার উপক্রম করিয়াছিল। দিনের পর দিন সংবাদপত্রের নিষ্প্রাণ ও বৈচিত্র্যহীন পৃষ্ঠা হইতে অপদার্থ খবর সংগ্রহ করিয়া সময় আর কাটিতে চাহিতেছিল না। আমার নিজের মনের অবস্থা যেরূপ শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা হইতেই বুঝিতেছিলাম, ব্যোমকেশের মস্তিষ্কের ক্ষুধা ইন্ধন অভাবে কিরূপ উগ্র ও দুর্বহ হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু তবু সমবেদনা প্রকাশ করিয়া

তাহাকে শান্ত করিবার চেষ্টা করি নাই ; বরঞ্চ এই অনীপ্সিত নৈষ্কর্মের জন্য যেন সেই মূলত দায়ী, এমনিভাবে তাহাকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করিয়াছি।

আজ প্রভাতে তাহার এই হতাশাপূর্ণ ভাব দেখিয়া আমার একটু অনুশোচনা হইল। মস্তিষ্কের খোরাক সহসা বন্ধ হইয়া গেলে সুস্থ বলবান মস্তিষ্কের কিরূপ দুর্দশা হয়, তাহা তো জানিই। উপরন্তু আবার বন্ধুর খোঁচা খাইতে হইলে ব্যাপারটা নিতান্তই নিষ্করুণ হইয়া পড়ে।

আমি আর তাহাকে প্রশ্ন না করিয়া অনুতপ্ত চিত্তে খবরের কাগজখানা খুলিলাম।

এই সময়ে চারিদিকে সভাসমিতি ও অধিবেশনের ধূম পড়িয়া যায়, এবারেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। সংবাদ-ব্যবসায়ীরা সরসতর সংবাদের অভাবে এইসব সভার মামুলি বিবরণ ছাপিয়া পৃষ্ঠা পূর্ণ করিয়াছে। তাহার ফাঁকে ফাঁকে সিনেমা ও থিয়েটার-সার্কাসের বিজ্ঞাপন সচিত্র ও বিচিত্ররূপে আমোদলোলুপ পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করিতেছে।

দেখিলাম, কলিকাতাতেই গোটা পাঁচেক বড় বড় সভা চলিতেছে। তাছাড়া দিল্লীতে নিখিল-ভারতীয় বিজ্ঞান সভার অধিবেশন বসিয়াছে। ভারতের নানা দিগ্‌দেশ হইতে অনেক হোমরাচোমরা বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত একজোট হইয়াছেন এবং বাক্যধূমে বোধকরি দিল্লীর আকাশ বিষাক্ত করিয়া তুলিয়াছেন। সংবাদপত্রের মারফৎ যতটুকু ধূম চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তাহারই ঠেলায় মস্তিষ্ক-কোটরে ঝুল পড়িবার উপক্রম হইয়াছে।

আমি সময় সময় ভাবি আমাদের দেশের বৈজ্ঞানিকরা কাজ না করিয়া এত বাগ্‌বিস্তার করেন কেন? দেখিতে পাই, যিনি যত বড় বৈজ্ঞানিক, তিনি তার চতুর্গুণ বাগ্মী। বেশি কিছু নয়, স্টিম এঞ্জিন বা এরোপ্লেনের মত একটা যন্ত্রও যদি ইঁহারা আবিষ্কার করিতে পারিতেন তাহা হইলেও তাঁহাদের বাচালতা ধৈর্য ধরিয়া শুনিতাম। কিন্তু এসব দূরে থাক্‌, মশা মারিবার একটা বিষও তাঁহারা আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। বুজরুকি আর কাহাকে বলে।

নিরুৎসুকভাবে বিজ্ঞান কংগ্রেসের বিবরণ পড়িতে পড়িতে একটা নাম দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। ইনি কলিকাতার একজন খ্যাতনামা প্রফেসার ও বিজ্ঞান-গবেষক—নাম দেবকুমার সরকার। বিজ্ঞান-সভায় ইনি সুদীর্ঘ বক্তৃতা দিয়াছেন। অবশ্য ইনি ছাড়া অন্য কোনও বাঙালী যে বক্তৃতা দেন নাই, এমন নয় ; অনেকেই দিয়াছেন ; কিন্তু বিশেষ করিয়া দেবকুমারবাবুর নামটা চোখে পড়িবার কারণ, কলিকাতায় তিনি আমাদের প্রতিবেশী, আমাদের বাসায় কয়েকখানা বাড়ির পরে গলির মুখে তাঁহার বাসা। তাঁহার সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ আলাপ ছিল না, কিন্তু তাঁহার পুত্র হাবুলের সম্পর্কে আমরা তাঁহার সহিত নেপথ্য হইতেই ঘনিষ্ঠ হইয়া পড়িয়াছিলাম।

দেবকুমারবাবুর ছেলে হাবুল কিছুদিন ব্যোমকেশের ভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। ছোকরার বয়স আঠারো-উনিশ, কলেজের দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়িত। ভালমানুষ ছেলে, আমাদের সম্মুখে বেশি কথা বলিতে পারিত না, তদ্গতভাবে ব্যোমকেশের মুখের পানে চাহিয়া থাকিত। ব্যোমকেশ মৃদু হাসিয়া এক অস্ফুটবাক ভক্তের পূজা গ্রহণ করিত, কখনও চা খাইবার নিমন্ত্রণ করিত।

হাবুল একেবারে কৃতার্থ হইয়া যাইত।

এই হাবুলের পিতা কিরূপ বক্তৃতা দিয়াছেন, জানিবার জন্য একটু কৌতূহল হইল। পড়িয়া দেখিলাম, দেশী বৈজ্ঞানিকদের অভাব-অসুবিধার সম্বন্ধে ভদ্রলোক যাহা বলিয়াছেন, তাহা নেহাৎ মিথ্যা নয়। ব্যোমকেশকে পড়িয়া শুনাইলে তাহার মনটা বিষয়ান্তরে সঞ্চারিত হইয়া হয়তো প্রফুল্ল হইতে পারে, তাই বলিলাম, 'ওহে, হাবুলের বাবা দেবকুমারবাবু বক্তৃতা দিয়াছেন, শোন।'

ব্যোমকেশ কড়িকাঠ হইতে চক্ষু নামাইল না, বিশেষ ঔৎসুক্যও প্রকাশ করিল না। আমি পড়িতে আরম্ভ করিলাম—'এ কথা সত্য যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাহায্য ব্যতীত কোনও জাতি বড় হইতে পারে নাই। অনেকের ধারণা এইরূপ যে, ভারত-বাসী বৈজ্ঞানিক-গবেষণায় পরাঙ্মুখ এবং তাহাদের উদ্ভাবনী শক্তি নাই—এই জন্যই ভারত পরনির্ভর ও পরাধীন হইয়া আছে। এই ধারণা যে সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক, ভারতের গরিমাময় অতীত তাহার প্রমাণ। নব্য বিজ্ঞানের যাহা বীজমন্ত্র, তাহা যে ভারতেই প্রথম আবিষ্কৃত হইয়াছিল ও পরে কাশপুষ্পের বীজের ন্যায় বায়ুতাড়িত হইয়া দূরে-দূরান্তরে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তাহা এই সুধীসমাজে উল্লেখ করা বাহুল্যমাত্র। গণিত, জ্যোতিষ, নিদান, স্থাপত্য—এই চতুঃস্তম্ভের উপর আধুনিক বিজ্ঞান ও তৎপ্রসূত সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত, অথচ ঐ চারটি বিজ্ঞানেরই জন্মভূমি ভারতবর্ষ।

'কিন্তু এ কথাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, বর্তমানে আমাদের এই অসামান্য উদ্ভাবনী প্রতিভা নিস্তেজ ও ম্রিয়মান হইয়া পড়িয়াছে। ইহার কারণ কি? আমরা কি মানসিক বলে পূর্বাপেক্ষা হীন হইয়া পড়িয়াছি? না, তাহা নহে। আমাদের প্রতিভা অ-ফলপ্রসূ হইবার অন্য কারণ আছে।

'পুরাকালে আচার্য ও ঋষিগণ—যাঁহাদের বর্তমান কালে আমরা savant বলিয়া থাকি—রাজ-অনুগ্রহের আওতায় বসিয়া সাধনা করিতেন। অর্থচিন্তা তাঁহাদের ছিল না, অর্থের প্রয়োজন হইলে রাজা সে অর্থ যোগাইতেন, সাধনার সাফল্যের জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন হইত, রাজকোষের অসীম ঐশ্বর্য তৎক্ষণাৎ তাহা যোগাইয়া দিত। আচার্যগণ অভাবমুক্ত হইয়া কুণ্ঠাহীন চিত্তে সাধনা করিতেন এবং অন্তিমে সিদ্ধিলাভ করিতেন।

'কিন্তু বর্তমানে ভারতীয় বৈজ্ঞানিকের অবস্থা কিরূপ? রাজা বৈজ্ঞানিক গবেষণার পরিপোষক নহেন—ধনী ব্যক্তিরাও জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারের জন্য অর্থব্যয় করিতে কুণ্ঠিত। কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিমিত আয়োজনের উপর নির্ভর করিয়া উঞ্ছবৃত্তির সাহায্যে আমাদের সাধনায় প্রবৃত্ত হইতে হয়; ফলে আমাদের সিদ্ধিও তদুপযুক্ত হইয়া থাকে। মূষিক যেমন প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও হস্তীকে পৃষ্ঠে বহন করিতে পারে না, আমরাও তেমনই বড় বড় আবিষ্ক্রিয়ায় সফল হইতে পারি না; ক্ষুধাক্ষীণ মস্তিষ্ক বৃহতের ধারণা করিতে পারে না।

'তবু আমি গর্ব করিয়া বলিতে পারি, যদি আমরা অর্থের অভাবে পীড়িত না হইয়া অকুণ্ঠ চিত্তে সাধনা করিতে পারিতাম, তাহা হইলে আমরা জগতের কোনও জাতির নিকটেই ন্যূন হইয়া থাকিতাম না। কিন্তু হায়! অর্থ নাই—কমলার কৃপার অভাবে আমাদের বাণীর সাধনা ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে। তবু, এই দৈন্য-নিষ্পিষ্ট অবস্থাতেও আমরা যাহা করিয়াছি, তাহা নিন্দার বিষয় নহে—শ্লাঘার বিষয়।

আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় ল্যাবরেটারিতে যে সকল আবিষ্ক্রিয়া মাঝে মাঝে অতর্কিতে আবির্ভূত হইয়া আবিষ্কর্তাকে বিস্ময়ে অভিভূত করিয়া ফেলিতেছে, কে তাহার সংবাদ রাখে? আবিষ্কারক নিজের গোপন আবিষ্কার সযত্নে বুকে লুকাইয়া নীরবে আরও অধিক জ্ঞানের সন্ধানে ঘুরিতেছে; কিন্তু সে একাকী, তাহাকে সাহায্য করিবার কেহ নাই; বরঞ্চ সর্বদাই ভয়, অন্য কেহ তাহার আবিষ্কার-কণিকার সন্ধান পাইলে তৎক্ষণাৎ তাহা আত্মসাৎ করিবে। লোলুপ পরস্বগৃধ্নু চোরের দল চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

'তাই বলিতেছি—অর্থ চাই, সহানুভূতি চাই, গবেষণা করিবার অবাধ অফুরন্ত উপকরণ চাই, সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিলে নিষ্কণ্টকে যশোলাভের নিশ্চিন্ত সম্ভাবনা চাই। অর্থ চাই—'

'থামো।'

প্রফেসার মহাশয়ের ভাষাটি বেশ গাল-ভরা, তাই শব্দপ্রবাহে গা ভাসাইয়া পড়িয়া চলিয়াছিলাম। হঠাৎ ব্যোমকেশ বলিয়া উঠিল, 'থামো'।

'কি হ'ল?'

'চাই চাই—চাই। আর আস্ফালন ভাল লাগে না। বিষের সঙ্গে খোঁজ নেই, কুলোপানা চক্কর।'

আমি বলিলাম, 'ঐ তো মজা। মানুষ নিজের অক্ষমতার একটা-না-একটা সাফাই সর্বদাই তৈরী ক'রে রাখে। আমাদের দেশের আচার্যরাও যে তার ব্যতিক্রম নয়, দেবকুমারবাবুর লেকচার পড়লেই তা বোঝা যায়।'

ব্যোমকেশের মুখের বিরক্তি ও অবসাদ ভেদ করিয়া একটা ব্যঙ্গ-বঙ্কিম হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে বলিল, 'হাবুল ছোকরা দেখতে হাবাগোবা ভালমানুষ হ'লেও ভেতরে বেশ বুদ্ধিমান। তার বাবা হয়ে দেবকুমারবাবু এমন ইয়ের মত আদি-অন্তহীন বক্তৃতা দিয়ে বেড়ান কেন, এই আশ্চর্য।'

আমি বলিলাম, 'বুদ্ধিমান ছেলের বাবা হ'লেই বুদ্ধিমান হ'তে হবে, এমন কোনও কথা নেই। দেবকুমারবাবুকে তুমি দেখেছ?'

'ঠিক বলতে পারি না। তাঁকে দেখবার দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা কখনও প্রাণে জাগেনি। তবে শুনেছি, তিনি দ্বিতীয় পক্ষ বিবাহ করেছেন। নির্বুদ্ধিতার এর চেয়ে বড় প্রমাণ আর থাকতে পারে?' বলিয়া ব্যোমকেশ ক্লান্তভাবে চক্ষু মুদিল।

ঘড়িতে সাড়ে আটটা বাজিল। বসিয়া বসিয়া আর কি করিব ভাবিয়া না পাইয়া পুঁটিরামকে আর এক দফা চা ফরমাস দিব মনে করিতেছি, এমন সময় ব্যোমকেশ হঠাৎ সোজা উঠিয়া বসিয়া বলিল, 'সিঁড়িতে কার পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে!' কিছুক্ষণ উৎকর্ণ হইয়া থাকিয়া আবার ঠেসান দিয়া বসিয়া বিরস স্বরে বলিল, 'হাবুল। তার আবার কি হ'ল? বড্ড তাড়াতাড়ি আসছে।'

মুহূর্ত পরেই হাবুল সজোরে দরজা ঠেলিয়া ঘরে ঢুকিয়া পড়িল। তাহার চুল উস্কখুস্ক, চোখ দুটো যেন ভয়ে ও অভাবনীয় আকস্মিক দুর্ঘটনার আঘাতে ঠিকরাইয়া বাহির হইয়া আসিতেছে। এমনিতেই তাহার চেহারাখানা খুব সুদর্শন নয়, একটু মোটাসোটা ধরনের গড়ন, মুখ গোলাকার, চিবুক ও গণ্ডে নবজাত দাড়ির অন্ধকার ছায়া—তাহার উপর এই পাগলের মত আবির্ভাব। আমি ধড়মড় করিয়া

উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলাম, 'কি হে, হাবুল। কি হয়েছে?'

হাবুলের পাগলের মত দৃষ্টি কিন্তু ব্যোমকেশের উপর নিবদ্ধ ছিল; আমার প্রশ্ন বোধ করি সে শুনিতেই পাইল না। টলিতে টলিতে ব্যোমকেশের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল, বলিল, 'ব্যোমকেশদা, সর্বনাশ হয়েছে। আমার বোন রেখা হঠাৎ মরে গেছে।' বলিয়া হাউ-হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

২

ব্যোমকেশ হাবুলকে হাত ধরিয়া একটা চেয়ারে বসাইয়া দিল। কিছুক্ষণ তাহাকে শান্ত করা গেল না, সে অসহায়ভাবে কাঁদিতেই লাগিল। বেচারার বয়স বেশি নয়, বালক বলিলেই হয়; তাহার উপর অকস্মাৎ এই দারুণ ঘটনায় একেবারে উদ্‌ভ্রান্ত ও অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল।

হাবুলের যে বোন আছে, এ খবর আমরা জানতাম না। তাহার পারিবারিক খুঁটিনাটি জানিবার কৌতূহল কোনও দিন হয় নাই। শুধু এইটুকু শুনিয়াছিলাম যে, হাবুলের মাতার মৃত্যুর পর দেবকুমারবাবু আবার বিবাহ করিয়াছিলেন। বিমাতাটি সপত্নী-পুত্রকে খুব স্নেহের দৃষ্টিতে দেখেন না, ইহাও আঁচে-আন্দাজে বুঝিয়াছিলাম।

মিনিট পাঁচেক পরে অপেক্ষাকৃত সুস্থির হইয়া হাবুল ব্যাপারটা খুলিয়া বলিল। দেবকুমারবাবু কয়েকদিন হইল দিল্লী গিয়াছেন। বাড়িতে হাবুল, তাহার অনূঢ়া ছোট বোন রেখা ও তাহাদের সৎমা আছেন। আজ সকালে উঠিয়া হাবুল যথারীতি নিজের তেতলার নিভৃত ঘরে পড়িতে বসিয়াছিল; আটটা বাজিয়া যাইবার পর নীচে হঠাৎ সৎমার কণ্ঠে ভীষণ চীৎকার শুনিয়া তাড়াতাড়ি নামিয়া আসিল; দেখিল, সৎমা রান্নাঘরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া উর্ধ্বস্বরে প্রলাপ বকিতেছেন। তাঁহার প্রলাপের কোনও অর্থ বুঝিতে না পারিয়া হাবুল রান্নাঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, তাহার বোন রেখা উনানের সম্মুখে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া আছে। কি হইয়াছে, জানিবার জন্য হাবুল তাহাকে প্রশ্ন করিল, কিন্তু রেখা উত্তর দিল না। তখন তাহার গায়ে হাত দিয়া নাড়া দিতেই হাবুল বুঝিল, রেখা নাই, তাহার গা বরফের মত ঠাণ্ডা, হাত-পা ক্রমশ শক্ত হইয়া আসিতেছে।

এই পর্যন্ত বলিয়া হাবুল আবার কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল, 'আমি এখন কি করব, ব্যোমকেশদা? বাবা বাড়ি নেই, তাই আপনার কাছে ছুটে এলুম। রেখা ম'রে গিয়েছে—উঃ। কি ক'রে এমন হ'ল ব্যোমকেশদা?'

হাবুলের এই শোক-বিহ্বল ব্যাকুলতা দেখিয়া আমার চক্ষুও সজল হইয়া উঠিল। ব্যোমকেশ হাবুলের পিঠে হাত দিয়া বলিল, 'হাবুল, তুমি পুরুষ মানুষ, বিপদে অধীর হ'য়ো না। কি হয়েছিল রেখার, বল দেখি—বুকের ব্যামো ছিল কি?'

'তা তো জানি না।'

'কত বয়স?'

'ষোল বছর, আমার চেয়ে দু বছরের ছোট।'

'সম্প্রতি কোনও অসুখ-বিসুখ হয়েছিল? বেরিবেরি বা ঐরকম কিছু।'

'না।'

ব্যোমকেশ ক্ষণকাল চিন্তা করিল, তারপর বলিল, 'চল তোমার বাড়িতে। নিজের চোখে না দেখলে কিছুই ধারণা করা যাচ্ছে না। তোমার বাবাকে 'তার' করা দরকার,

তিনি এসে পড়ুন। কিন্তু সে দু ঘণ্টা পরে করলেও চলবে। আপাতত একজন ডাক্তার চাই। তোমার বাড়ির কাছেই ডাক্তার রুদ্র থাকেন না? বেশ, এস অজিত।'

কয়েক মিনিট পরে দেবকুমারবাবুর বাড়ির সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। বাড়িখানার সম্মুখভাগ সংকীর্ণ, যেন দুই দিকের বাড়ির চাপে চ্যাপটা হইয়া ঊর্ধ্বদিকে উঠিয়া গিয়াছে। নীচের তলায় কেবল একটি বসিবার ঘর, তা ছাড়া ভিতর দিকে কলঘর, রান্নাঘর ইত্যাদি আছে। আমরা দ্বারে উপস্থিত হইয়া দাঁড়াইতেই সেই অন্দর হইতে একটা তীক্ষ্ম স্ত্রীকণ্ঠের ছেদবিরামহীন আওয়াজ কানে আসিল। কণ্ঠস্বরে উদ্বেগ ও আশঙ্কার চিহ্ন পূর্ণমাত্রায় থাকিলেও শোকের লক্ষণ বিশেষ পাওয়া গেল না। বুঝিলাম, বিমাতা বিলাপ করিতেছেন।

একটা বৃদ্ধগোছের ভৃত্য কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মত বাহিরে দাঁড়াইয়াছিল। ব্যোমকেশ তাহাকে বলিল, 'তুমি এ বাড়ির চাকর? যাও, ঐ বাড়ি থেকে ডাক্তারবাবুকে ডেকে নিয়ে এস।'

চাকরটা কিছু একটা করিবার সুযোগ পাইয়া 'যে আজ্ঞে' বলিয়া দ্রুত প্রস্থান করিল। তখন হাবুলকে অগ্রবর্তী করিয়া আমরা ভিতরে প্রবেশ করিলাম।

যাঁহার কণ্ঠস্বর বাহির হইতে শুনিতে পাইয়াছিলাম, তিনি উপরে উঠিবার সিঁড়ির সম্মুখে দাঁড়াইয়া একাকী অনর্গল বকিয়া চলিয়াছিলেন, আমাদের পদশব্দে তাঁহার চমক ভাঙিল। তিনি উচ্চকিতভাবে আমাদের পানে চাহিলেন। দুইজন অপরিচিত লোককে হাবুলের সঙ্গে দেখিয়া তিনি মাথার উপর আঁচলটা টানিয়া দিয়া ক্ষিপ্রপদে উপরে উঠিয়া গেলেন। আমি মুহূর্তের জন্য তাঁহার মুখখানা দেখিতে পাইয়াছিলাম। আমার মনে হইল তাঁহার আরক্ত চোখের ভিতর একটা ত্রাসমিশ্রিত বিরক্তির ছায়া দেখা দিয়াই অঞ্চলের আড়ালে ঢাকা পড়িয়া গেল।

হাবুল অস্ফুটস্বরে বলিল, 'আমার মা—'

ব্যোমকেশ বলিল, 'বুঝেছি। রান্নাঘর কোন্‌টা?'

হাবুল অঙ্গুলি নির্দেশে দেখাইয়া দিল। অল্পপরিসর চতুষ্কোণ উঠান ঘিরিয়া ছোট ছোট কয়েকটি কক্ষ; তাহার মধ্যে যেটি অপেক্ষাকৃত বড়, সেইটি রান্নাঘর। পাশে একটি জলের কল, তাহা হইতে ক্ষীণ ধারায় জল পড়িয়া দ্বারের সম্মুখভাগ পিচ্ছিল করিয়া রাখিয়াছে।

জুতা খুলিয়া আমরা রান্নাঘরে প্রবেশ করিলাম। ঘরটা প্রায় অন্ধকার, আলোক-প্রবেশের কোনও পথ নাই। হাবুল দরজার পাশে হাত বাড়াইয়া সুইচ টিপিতেই একটা ধোঁয়াটে বৈদ্যুতিক বাল্‌ব্‌ জ্বলিয়া উঠিল। তখন ঘরের অভ্যন্তরভাগ ভাল করিয়া দেখিতে পাইলাম।

দ্বারের অপর দিকে দেয়াল-সংলগ্ন পাশাপাশি দুইটি কয়লার উনান, তাহাতে ভাঙা পাথুরে কয়লা স্তূপীকৃত রহিয়াছে; কিন্তু আগুন নাই। এই অগ্নিহীন চুল্লীর সম্মুখে নতজানু হইয়া একটি মেয়ে বসিয়া আছে, যেন বেদীপ্রান্তে উপাসনারত একটি স্ত্রীমূর্তি। মেয়েটির দেহ সম্মুখ দিকে ঝুঁকিয়া আছে, মাথাও বুকের উপর নামিয়া পড়িয়াছে। হাত দুটি লম্বিত দেখিয়া মনে হয় না যে, সে মৃত। ব্যোমকেশ সন্তর্পণে গিয়া তাহার নাড়ি টিপিল।

তাহার মুখ দেখিয়াই বুঝিলাম, নাড়ী নাই। ব্যোমকেশ হাত ছাড়িয়া দিয়া

ধীরে ধীরে মেয়েটির চিবুক ধরিয়া মুখ তুলিল ; প্রাণহীন দেহে মৃত্যু-কাঠিণ্য দেখা দিতে আরম্ভ করিয়াছে—মুখ অল্প একটু উঠিল।

মেয়েটি বেশ সুশ্রী, হাবুলের মত নয়। রঙ ফরসা, মুখের গড়ন ধারালো, নীচের ঠোঁট অভিমানীর মত স্বভাবতই ঈষৎ স্ফুরিত। ষোলো বছর বয়সের অনুযায়ী দেহসৌষ্ঠবও বেশ পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। মাথায় দীর্ঘ চুলগুলি বোধহয় স্নানের পূর্বে বিনুনি খুলিয়া পিঠে ছড়াইয়া দিয়াছিল, সেইভাবেই ছড়ানো আছে। পরিধানে একটি অর্ধমলিন গঙ্গা যমুনা ডুরে ; অলঙ্কারের মধ্যে হাতে তিনগাছি করিয়া সোনার চুড়ি, কানে মিনা করা হাল্কা ঝুমকা, গলায় একটি সরু হার।

ব্যোমকেশ নিকট হইতে তাহাকে ভাল করিয়া দেখিয়া লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল ; তারপর দূরে হইতে তাহার বসিবার ভঙ্গি ইত্যাদি সমগ্রভাবে দেখিবার জন্য কয়েক পা সরিয়া দাঁড়াইল।

খানিকক্ষণ একাগ্র দৃষ্টিতে মেয়েটির পানে চাহিয়া থাকিয়া সে আবার নিকটে ফিরিয়া আসিল ; মেয়েটির ডান হাতখানা তুলিয়া করতল পরীক্ষা করিয়া দেখিল। করতলে কয়লার কালি লাগিয়া আছে—সে নিজের হাতে উনানে কয়লা দিয়াছে, সহজেই অনুমান করা যায়। অঙ্গুলিগুলি ঈষৎ কুঞ্চিত, তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাব পরস্পর সংলগ্ন হইয়া আছে। ব্যোমকেশ অঙ্গুলি দুটি সাবধানে পৃথক করিতেই একটি ক্ষুদ্র জিনিস খসিয়া মাটিতে পড়িল। ব্যোমকেশ মাটি হইতে তুলিয়া নিজের করতলে রাখিয়া আলোর দিকে তুলিয়া পরীক্ষা করিল। আমিও ঝুঁকিয়া দেখিলাম একটি দেশলাইকাঠির অতি ক্ষুদ্র দগ্ধাবশেষ, দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়া আঙুল পর্যন্ত পেঁছিলে যেটুকু থাকে, সেইটুকু।

গভীর মনোসংযোগে কাঠিটা কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া ব্যোমকেশ সেটা ফেলিয়া দিল, তারপর মেয়েটির বাঁ হাত তুলিয়া দেখিল। বাঁ হাতটি মুষ্টিবদ্ধ ছিল, মুঠি খুলিতেই, একটি দেশলাইয়ের বাক্স দেখা গেল। ব্যোমকেশ বাক্সটি খুলিয়া দেখিল, কয়েকটি কাঠি রহিয়াছে। ভাবিতে ভাবিতে বলিল, 'হুঁ। আমিও তাই প্রত্যাশা করেছিলুম। দেশলাই জেবলে উনুনে আগুন দিতে যাচ্ছিল, এমন সময় মৃত্যু হয়েছে।'

অতঃপর ব্যোমকেশ মৃতদেহ ছাড়িয়া ঘরের চারিদিকে দৃষ্টি ফিরাইল ; মেঝের উপর সিক্ত পদচিহ্ন শুকাইয়া অস্পষ্ট দাগ হইয়াছিল, সেগুলি ভাল করিয়া পরীক্ষা করিল। শেষে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'না, মৃত্যুকালে ঘরে আর কেউ ছিল না। পরে একজন স্ত্রীলোক ঘরে ঢুকেছিলেন, তারপর হাবুল ঢুকেছিল।'

এই সময় বাহিরে শব্দ শোনা গেল। ব্যোমকেশ বলিল, 'বোধ হয় ডাক্তার রুদ্র এলেন! হাবুল, তাঁকে নিয়ে এস।'

হাবুল বাহিরে গেল। আমি এই অবসরে ব্যোমকেশকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'ব্যোমকেশ, কিছু বুঝলে?'

ব্যোমকেশ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া মাথা নাড়িল, 'কিছু না। কেবল এইটুকু বোঝা যাচ্ছে যে, মেয়েটি মৃত্যুর আগের মুহূর্তে পর্যন্ত জানত না যে, মৃত্যু এত নিকট।'

ডাক্তার রুদ্রকে লইয়া হাবুল ফিরিয়া আসিল। ডাক্তার রুদ্র বয়স্ক লোক, কলিকাতার একজন নামজাদা চিকিৎসক। কিন্তু অত্যন্ত রূঢ় ও কটুভাষী বলিয়া

তাঁহার দুর্নাম ছিল। মেজাজ সর্বদাই সপ্তমে চড়িয়া থাকিত; এমন কি মুমূর্ষু রোগীর ঘরেও তিনি এমন ব্যবহার করিতেন যে, তিনি না হইয়া অন্য কোনও ডাক্তার হইলে তাঁহার পেশা চলা কঠিন হইয়া পড়িত। একমাত্র চিকিৎসাশাস্ত্রে অসাধারণ প্রতিভার বলে তিনি পসার প্রতিপত্তি বজায় রাখিয়াছিলেন; এ ছাড়া তাঁহার মধ্যে অন্য কোনও গুণ আজ পর্যন্ত কেহ দেখিতে পায় নাই।

ডাক্তার রুদ্রর চেহারা হইতেও তাঁহার চরিত্রের আভাস পাওয়া যাইত। নিকষকৃষ্ণ গায়ের রঙ, ঘোড়ার মত লম্বা কদাকার মুখে রক্তবর্ণ দুটা চক্ষুর দৃষ্টি দুর্বিনীত আত্মম্ভরিতায় যেন মানুষকে মানুষ বলিয়াই গণ্য করে না। অধরোষ্ঠের গঠনেও সার্বজনীন অবজ্ঞা ফুটিয়া উঠিতেছে। তিনি যখন ঘরে আসিয়া ঢুকিলেন, তখন মনে হইল মূর্তিমান দম্ভ কোট-প্যান্টালুন ও জুতাসুদ্ধ ঘরের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল।

হাবুল নীরবে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া ভগিনীর দেহ দেখাইয়া দিল। ডাক্তার রুদ্র স্বভাবকর্কশ স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি হয়েছে? মারা গেছে?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনিই দেখুন।'

ডাক্তার রুদ্র ব্যোমকেশের দিকে দম্ভকষায় নেত্র তুলিয়া বলিলেন, 'আপনি কে?'

'আমি পারিবারিক বন্ধু।'

'ও!'—ব্যোমকেশকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া ডাক্তার রুদ্র হাবুলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এটি কে– দেবকুমারের মেয়ে?'

হাবুল ঘাড় নাড়িল।

ডাক্তার রুদ্রর উত্থিত ভ্রূ ললাটে ঈষৎ কৌতূহল প্রকাশ পাইল। তিনি মৃতদেহের পানে তাকাইয়া বলিলেন, 'এরই নাম রেখা?'

হাবুল ঘাড় নাড়িল।

'কি হয়েছিল?'

'কিছু না, হঠাৎ—'

ডাক্তার রুদ্র তখন হাঁটু গাড়িয়া রেখার পাশে বসিলেন; মুহূর্তের জন্য একবার নাড়ীতে হাত দিলেন, একবার চোখের পাতা টানিয়া চক্ষুতারকা দেখিলেন। তারপর উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, 'মারা গেছে। প্রায় দু ঘণ্টা আগে মৃত্যু হয়েছে। Rigor mortis set in করেছে।' কথাগুলি তিনি এমন পরিতৃপ্তির সহিত বলিলেন —যেন অত্যন্ত সুসংবাদ, শুনিবামাত্র শ্রোতারা খুশি হইয়া উঠিবে।

ব্যোমকেশ প্রশ্ন করিল, 'কিসে মৃত্যু হয়েছে, বলতে পারেন কি?'

'সেটা অটপ্সি না ক'রে বলা অসম্ভব। আমি চললুম—আমার ভিজিট বত্রিশ টাকা বাড়িতে পাঠিয়ে দিও। আর পুলিশে খবর দেওয়া দরকার, মৃত্যু সন্দেহজনক।' বলিয়া ডাক্তার রুদ্র প্রস্থান করিলেন।

৩

রান্নাঘর হইতে বাহিরে আসিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'পুলিসে খবর পাঠানোই উচিত' নইলে আরও অনেক হাঙ্গামা হতে পারে। আমাদের থানার দারোগা বীরেনবাবুর সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে, আমি তাকে খবর দিচ্ছি।'

এক টুকরো কাগজে তাড়াতাড়ি কয়েক ছত্র লিখিয়া ব্যোমকেশ চাকরের হাতে দিয়া থানায় পাঠাইয়া দিল। তারপর বলিল, 'মৃতদেহ নাড়াচাড়া ক'রে কাজ নেই।

পুলিস এসে যা হয় করবে।' দরজায় শিকল তুলিয়া দিয়া কহিল, 'হাবুল, একবার রেখার ঘরটা দেখতে পেলে ভাল হ'ত।'

ভারী গলায় 'আসুন' বলিয়া হাবুল আমাদিগকে উপরে লইয়া চলিল। প্রথম খানিকটা কান্নাকাটির পর সে কেমন যেন আচ্ছন্নের মত হইয়া পড়িয়াছিল; যে যাহা বলিতেছিল, কলের পুতুলের মত তাহাই পালন করিতেছিল।

দ্বিতলে গোটা তিনেক ঘর, তাহার সর্বশেষেরটি রেখার; বাকি দুইটি বোধ করি দেবকুমারবাবু ও তাঁহার গৃহিণীর শয়নকক্ষ। রেখার ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, ঘরটি আয়তনে ক্ষুদ্র হইলেও পরিপাটীভাবে গোছানো। আসবাব বেশি নাই, যে কয়টি আছে বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। এক ধারে একখানি ছোট খাটের উপর বিছানা; অপর দিকে জানালার ধারে লিখিবার টেবিল। পাশে ক্ষুদ্র শেল্‌ফে দুই সারি বাংলা বই সাজানো। দেয়ালে ব্র্যাকেটের উপর একটি আয়না, তাহার পদমূলে চিরুনি, ফিতা, কাঁটা ইত্যাদি রহিয়াছে। ঘরটির সর্বত্র গৃহকর্মে সুনিপুণা শিক্ষিতা মেয়ের হাতের চিহ্ন যেন আঁকা রহিয়াছে।

ব্যোমকেশ ঘরের এটা-ওটা নাড়িয়া একবার চারিদিক ঘুরিয়া বেড়াইল, ফিতা ও কাঁটা লইয়া পরীক্ষা করিল; তারপর জানালার ধারে গিয়া দাঁড়াইল। জানালাটা ঠিক গলির উপরেই; গলির অপর দিকে একটু পাশে ডাক্তারদের প্রকাণ্ড বাড়ি ও ডাক্তারখানা। বাড়ির খোলা ছাদ জানালা দিয়া স্পষ্ট দেখা যায়। ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ বাহিরের দিকে তাকাইয়া রহিল; তারপর ফিরিয়া টেবিলের দেরাজ ধরিয়া টানিল।

দেরাজে চাবি ছিল না, টান দিতেই খুলিয়া গেল। দেখিলাম, তাহাতে বিশেষ কিছু নাই; দু-একটা খাতা, চিঠি লেখার প্যাড, গন্ধদ্রব্যের শিশি, ছুঁচ-সুতা ইত্যাদি রহিয়াছে। একটা শিশি তুলিয়া লইয়া ব্যোমকেশ দেখিল, ভিতরে সাদা ট্যাবলয়েড রহিয়াছে। ব্যোমকেশ বলিল, 'অ্যাস্‌পিরিন। রেখা কি অ্যাস্‌পিরিন খেত?'

হাবুল বলিল, 'হ্যাঁ, মাঝে মাঝে তার মাথা ধরত—'

শিশি রাখিয়া দিয়া আবার ব্যোমকেশ চিন্তিতভাবে ঘরময় পরিভ্রমণ করিল, শেষে বিছানার সম্মুখে আসিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইল। বিছানায় শয়নের চিহ্ন বিদ্যমান, লেপটা এলোমেলোভাবে পায়ের দিকে পড়িয়া আছে, মাথার বালিশে মাথার চাপের দাগ। কিছুক্ষণের জন্য শ্মশান-বৈরাগ্যের মত একটা ভাব মনকে বিষণ্ণ করিয়া দিল—এই তো মানুষের জীবন, যাহার শয়নের দাগ এখনও শয্যা হইতে মিলাইয়া যায় নাই, সে প্রভাতে উঠিয়াই কোন্ অনন্তের পথে যাত্রা করিয়াছে, তাহার ঠিকানা নাই।

ব্যোমকেশ অন্যমনস্কভাবে মাথার বালিসটা তুলিল; একখণ্ড ফিকা সবুজ রঙের কাগজ বালিশের তলায় চাপা ছিল, বালিস সরাইতেই সেটা প্রকাশ হইয়া পড়িল। ব্যোমকেশ সচকিত কাগজখানা তুলিয়া উল্টাইয়া-পাল্টাইয়া দেখিল, ভাঁজ-করা চিঠির কাগজ। সে একবার একটু ইতস্তত করিল, তারপর চিঠির ভাঁজ খুলিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল।

আমিও গলা বাড়াইয়া চিঠিখানা পড়িলাম। মেয়েলি ছাঁদের অক্ষরে তাহাতে

লেখা ছিল—

'নন্তুদা,

আমাদের বিয়ের সম্বন্ধ ভেঙে গেল। তোমার বাবা দশ হাজার টাকা চান, অত টাকা বাবা দিতে পারবেন না।

আর কাউকে আমি বিয়ে করতে পারব না, এ বোধহয় তুমি জান। কিন্তু এ বাড়িতে আর থাকাও অসহ্য হয়ে উঠেছে। আমাকে একটু বিষ দিতে পার? তোমাদের ডাক্তারখানায় তো অনেক রকম বিষ পাওয়া যায়। দিও, যদি না দাও অন্য যে কোনও উপায়ে আমি মরব। তুমি তো জান, আমার কথায় নড়চড় হয় না।

ইতি—

তোমার 'রেখা'।

চিঠিখানা পড়িয়া ব্যোমকেশ নীরবে হাবুলের হাতে দিল। হাবুল পড়িয়া আবার ঝরঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল, অশ্রু-উদ্‌গলিত কণ্ঠে বলিল, 'আমি জানতুম এই হবে, আত্মহত্যা করবে।'

'নন্তু কে?'

'নন্তুদা ডাক্তার রুদ্রর ছেলে। রেখার সঙ্গে ওর বিয়ের সম্বন্ধও হয়েছিল। নন্তুদা বড় ভাল, কিন্তু ঐ চামারটা দশ হাজার টাকা চেয়ে বাবাকে রাগিয়ে দিলে—'

ব্যোমকেশ নিজের মুখের উপর দিয়া একবার হাত চালাইয়া বলিল, 'কিন্তু যাক।' তারপর হাবুলের হাত ধরিয়া বিছানায় বসাইয়া স্নিগ্ধস্বরে তাহাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিল। হাবুল রুদ্ধস্বরে বলিল, 'ব্যোমকেশদা, নিজের বলতে আমার ঐ বোনটি ছাড়া আর কেউ ছিল না। মা নেই, বাবাও আমাদের কথা ভাববার সময় পান না—' বলিয়া সে মুখে কাপড় দিয়া ফুঁপাইতে লাগিল।

যাহোক, ব্যোমকেশ বলিল, 'চল, এখনই পুলিস আসবে। তার আগে তোমার মাকে কিছু জিজ্ঞাসা করবার আছে।'

হাবুলের বিমাতা নিজের ঘরে ছিলেন। হাবুল গিয়া ব্যোমকেশের আবেদন জানাইলে, তিনি আড়ঘোমটা টানিয়া দ্বারের পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ইতিপূর্বে তাঁহাকে এক-নজরে মাত্র দেখিয়াছিলাম, এখন আরও ভাল করিয়া দেখিলাম।

তাঁহার বয়স বোধহয় সাতাশ-আটাশ বছর; রোগা লম্বা ধরণের চেহারা, রঙ বেশ ফরসা, মুখের গড়নও সুন্দর। কিন্তু তবু তাহাকে দেখিয়া সুন্দরী বলা তো দূরের কথা, চলনসই বলিতেও দ্বিধা হয়। চোখের দৃষ্টিতে একটা স্থায়ী প্রখরতা ভ্রূযুগলের মধ্যে দুইটি ছেদ-রেখা টানিয়া দিয়াছে; পাৎলা সুগঠিত ঠোঁট এমনভাবে ঈষৎ বাঁকা হইয়া আছে, যেন সর্বদাই অন্যের দোষত্রুটি দেখিয়া শ্লেষ করিতেছে। তাঁহার অসন্তোষচিহ্নিত মুখ দেখিয়া আমার মনে হইল, বিবাহের পর হইতে ইনি একদিনের জন্যও সুখী হন নাই। মানসিক উদারতার অভাবে সপত্নী-সন্তানদের কখনও স্নেহের দৃষ্টিতে দেখেন নাই, নিজেরও সন্তান হয় নাই; তাই তাঁহার স্নেহহীন চিত্ত মরুভূমির মত ঊষর ও শুষ্ক রহিয়া গিয়াছে।

আর একটা জিনিস লক্ষ্য করিলাম, তাঁহার বোধহয় শুচিবাই আছে। তিনি যেরূপ ভঙ্গিতে দ্বারের পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন, তাহাতে মনে হইল, তিনি নিজেকে ও নিজের ঘরটিকে সর্বপ্রকার অশুদ্ধি হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেছেন। পাছে

আমরা তাঁহার ঘরে পদার্পণ করিয়া ঘরের নিষ্কলুষ পবিত্রতা নষ্ট করিয়া দিই, তাই তিনি দ্বার আগুলিয়াই দাঁড়াইয়াছেন।

আমরা অবশ্য ঘরে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিলাম না, বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিলাম।

ব্যোমকেশ প্রশ্ন করিল, 'আজ সকালে রেখার সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছিল ?'

প্রত্যুত্তরে মহিলাটি একগাদা কথা বলিয়া গেলেন। দেখিলাম অন্যান্য নারী-সুলভ সদ্‌গুণের মধ্যে বাচলতাও বাদ যায় না—একবার কথা কহিবার অবকাশ পাইলে আর থামিতে পারেন না। ব্যোমকেশের স্বল্পাক্ষর প্রশ্নের উত্তরে তিনি তাঁহার মনের ও সংসারের অধিকাংশ কথাই বলিয়া ফেলিলেন। আজ সকালে ঝি আসে নাই দেখিয়া তিনি রেখাকে রান্নাঘর নিকাইয়া উনানে আগুন দিতে বলিয়াছিলেন। অবশ্য সপত্নী-সন্তানদের তিনি কখনও আঙুল নাড়িয়াও সংসারের কোনও কাজ করিতে বলেন না—নিজের গতর যতদিন আছে নিজেই সব করেন। কিন্তু তবু সংসারের উনকুটি চৌষট্টি কাজ তো আর একা মানুষের দ্বারা সম্ভব নয়, তাই তিনি রেখাকে উনান ধরাইতে বলিয়া স্বয়ং নিজের শয়নকক্ষের জঞ্জাল মুক্ত করিয়া স্নান সারিয়া উপরে চলিয়া আসিয়াছিলেন, রান্নাঘরে কি হইতেছে না হইতেছে দেখেন নাই। তারপর কাপড় ছাড়িয়া চুল মুছিয়া দশবার ইষ্টমন্ত্র জপ করিয়া নীচে গিয়া দেখেন—ঐ কাণ্ড! সপত্নী-সন্তানদের কোন কথায় তিনি থাকেন না, অথচ এমনই তাঁহার দুর্দৈব্য যে, যত ঝঞ্ঝাট তাঁহাকেই পোহাইতে হয়। এমন যে ব্যাপার ঘটিয়াছে, তাহাতে সকলে হয়তো তাঁহাকেই দুষিবে, কর্তা ফিরিয়া আসিয়া যে কি মহামারী কাণ্ড বাধাইবেন, তাহা কল্পনা করাও দুষ্কর। একে তো তিনি কর্তার চক্ষুশূল, তিনি মরিলেই কর্তা বাঁচেন।

বাক্যস্রোতে কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে ব্যোমকেশ ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, 'আজ সকালে আপনি রেখাকে কি কোনও রূঢ় কথা বলেছিলেন ?'

এবার মহিলাটি একেবারে ঝাঁকিয়া উঠিলেন, 'রূঢ় কথা আমার মুখ দিয়ে বেরোয় না, তেমন ভদ্রলোকের মেয়ে নই। এ বাড়িতে ঢুকে অবধি সতীন-পো সতীন ঝি নিয়ে ঘর করছি, কিন্তু কেউ বলুক দেখি যে, একটা কড়া কথা আমার মুখ দিয়ে বেরিয়েছে। তবে আজ সকালে রেখাকে উনুন ধরাতে পাঠালুম, সে রান্নাঘর থেকে ফিরে এসে বললে—দেশলাই খুঁজে পাচ্ছি না। ব'লে ঘরে ঢুকে ব্রাকেটের উপর থেকে দেশলাই নিলে। আমি তখন মেঝে মুছছিলাম, বললুম—বাসি কাপড়ে ঘরে ঢুকলে? এতবড় মেয়ে হয়েছ, এটুকু হুঁশ নেই? দেশলাইয়ের দরকার ছিল, দোকান থেকে একটা আনিয়ে নিলেই পারতে। এইটুকু বলেছি, এ ছাড়া আর একটি কথাও আমার মুখ দিয়ে বেরোয়নি। এতে যদি অপরাধ হয়ে থাকে তো ঘাট মানছি।'

ব্যোমকেশ শান্তভাবে বলিল, 'অপরাধের কথা নয়; কিন্তু দেশলাই নিতে রেখা আপনার ঘরে এল কেন? আপনার ঘরেই কি দেশলাই থাকে?'

গৃহিণী বলিলেন, 'হাঁ। রাত্তিরে আমি অন্ধকারে ঘুমুতে পারি না, তেলের ল্যাম্প জ্বেলে শুই, তাই ঘরে দেশলাই রাখতে হয়। ঐ ব্রাকেটের উপর ল্যাম্প আর দেশলাই থাকে। সবাই জানে, রেখাও জানত।'

ঘরের মধ্যে উঁকি মারিয়া দেখিলাম, খাটের শিয়রের দিকে দেয়ালে একটি ক্ষুদ্র

কাঠের ব্র্যাকেট, তাহার উপর ছোট একটি ল্যাম্প রহিয়াছে। ঘরের অন্যান্য অংশও এই সুযোগে দেখিয়া লইলাম। পরিচ্ছন্নতার আতিশয্যে আসবাবপত্র যেন আড়ষ্ট হইয়া আছে। এমন কি, দেয়ালে লম্বিত মা-কালীর ছবিখানিও যেন ঘরের শুচিতা-ভঙ্গের ভয়ে সন্ত্রস্তভাবে জিভ বাহির করিয়া আছেন।

চিন্তাকুঞ্চিত ললাটে ব্যোমকেশ বলিল, 'ও, তা হ'লে এই সময় রেখাকে আপনি শেষ দেখেন? তারপর আর তাকে জীবিত দেখেননি?'

'না।'—বলিয়া গৃহিণী বোধ করি আবার একপ্রস্থ বক্তৃতা শুরু করিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় নীচে হইতে চাকর জানাইল যে, দারোগাবাবু আসিয়াছেন।

আমরা নীচে নামিয়া গেলাম।

দারোগা বীরেনবাবুর সহিত ব্যোমকেশের ঘনিষ্ঠতা ছিল, দুজনেই দুজনের কদর বুঝিতেন। বীরেনবাবু মধ্যবয়স্ক লোক, হৃষ্টপুষ্ট মজবুত চেহারা—বিচক্ষণ ও চতুর কর্মচারী বলিয়া তাঁহার সুনাম ছিল। বিশেষত তাঁহার মধ্যে পুলিসসুলভ আত্মম্ভরিতা বা অন্যের কৃতিত্ব লঘু করিয়া দেখিবার প্রবৃত্তি ছিল না বলিয়া ব্যোমকেশ তাঁহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিত। কয়েকটি জটিল ব্যাপারে ব্যোমকেশকে তাঁহার সাহায্য লইতেও দেখিয়াছি। শহরের নিম্নশ্রেণীর গাঁটকাটা ও গুণ্ডাদের চালচলন সম্বন্ধে তাঁহার অগাধ অভিজ্ঞতা ছিল।

ব্যোমকেশের সহিত মুখোমুখি হইতেই বীরেনবাবু বলিলেন, 'কি খবর ব্যোমকেশবাবু? গুরুতর কিছু না কি?'

ব্যোমকেশ বলিল, আপনি নিজেই তার বিচার করুন।' বলিয়া তাঁহাকে ভিতরে লইয়া চলিল।

৪

মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদের জন্য রওনা করাইয়া দিয়া, দেবকুমারবাবুকে 'তার' পাঠাইয়া এই শোচনীয় ব্যাপারের যথাসম্ভব সুব্যবস্থা করিতে বেলা দুইটা বাজিয়া গেল। বাসায় ফিরিয়া আমরা যখন আহারাদি সম্পন্ন করিয়া উঠিলাম, তখন শীতের বেলা পড়িয়া আসিতেছে।

ব্যোমকেশ বিমনা ও নীরব হইয়া রহিল। আমিও মনের মধ্যে অনুতাপের মত একটা অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিতে লাগিলাম। মস্তিষ্কের যে খোরাকের জন্য আমরা ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিলাম, তাহা এমন নির্মমভাবে দেখা দিবে, কে ভাবিয়াছিল? বেচারা হাবুলের কথা বার বার মনে পড়িয়া মনটা ব্যথাপীড়িত হইয়া উঠিতে লাগিল।

ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া গেল, ব্যোমকেশ দৃষ্টিহীন চক্ষে জানালার বাহিরে তাকাইয়া নীরব হইয়াই রহিল। তখন আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আত্মহত্যাই তা হ'লে? কি বল?'

ব্যোমকেশ চমকিয়া উঠিল, 'অ্যাঁ! ও, রেখার কথা বলছ? তোমার কি মনে হয়?'

যদিও মন সম্পূর্ণ সংশয়মুক্ত ছিল না, বলিলাম, আত্মহত্যা ছাড়া আর কি হ'তে পারে? চিঠি থেকে তো অভিপ্রায় বেশ বোঝাই যাচ্ছে।'

'তা যাচ্ছে। কি উপায়ে আত্মহত্যা করেছে, তুমি মনে কর?'

'বিষ খেয়ে। সে কথাও তো চিঠিতে—'

'আছে। কিন্তু বিষ পাবার আগেই বিষ খেয়ে আত্মহত্যা কি করে হতে পারে আমি ভেবে পাচ্ছি না। চিঠিতে রেখা বিষ চেয়েছিল, কিন্তু চিঠি যখন যথাস্থানে পৌঁছয়নি, লেখিকার বালিশের তলাতেই থেকে গিয়েছিল, তখন বিষ এল কোত্থেকে?'

আমি বলিলাম, 'চিঠিতে আছে, সে বিষ না পেলে অন্য যে কোনও উপায়ে—'

'কিন্তু চিঠি পাঠাবার আগেই সে অন্য উপায় অবলম্বন করবে, এটা তুমি সম্ভব মনে কর?'

আমি নিরুত্তর রইলাম।

কিয়ৎকাল পরে ব্যোমকেশ বলিল, 'তা'ছাড়া উনুন জ্বালাতে জ্বালাতে কেউ আত্মহত্যা করে না। রেখার মৃত্যু এসেছিল অকস্মাৎ—নির্মেঘ আকাশ থেকে বিদ্যুতের মত। এত ক্ষিপ্র এমন অমোঘ এই মৃত্যুবান যে, সে একটু নড়বার অবকাশ পায়নি, দেশলাইয়ের কাঠি হাতেই পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।'

'কি ক'রে এমন মৃত্যু সম্ভব হ'ল?'

'সেইটেই বুঝতে পারছি না। জানা বিষের মধ্যে এক হাইড্রোসায়েনিক অ্যাসিড ছাড়া এত ভয়ংকর শক্তি আর কারুর নেই। কিন্তু—'

ব্যোমকেশের অসমাপ্ত কথা চিন্তার মধ্যে নির্বাণ লাভ করিল।

আমি একটু সংকুচিতভাবে বলিলাম, 'আমি ডাক্তারি সম্বন্ধে কিছু জানি না, কিন্তু হঠাৎ হার্টফেল ক'রে মৃত্যু সম্ভব হয় কি?'

ব্যোমকেশ ভাবিতে ভাবিতে বলিল, 'ঐ সম্ভাবনাটাই দেখছি ক্রমশ প্রবল হয়ে উঠেছে। রেখা মাথাধরার জন্যে অ্যাসপিরিন খেত, হয়তো ভেতরে ভেতরে হৃদযন্ত্র দুর্বল হয়ে পড়েছিল—কিন্তু না, কোথায় যেন বেধে যাচ্ছে, হার্টফেলের সম্ভানাটা নিশ্চিন্তভাবে গ্রহণ করতে পারছি না, যদিও যুক্তি-প্রমাণ সব ঐ দিকেই নির্দেশ করছে।'

ব্যোমকেশ অপ্রতিভ ভাবে হাসিল—বুদ্ধির সঙ্গে মনের আপোস করতে পারছি না; কেবলই মনে হচ্ছে, মৃত্যুটা সহজ নয়, সাধারণ নয়, কোথায় এর একটা মস্ত গলদ আছে। কিন্তু যাক, এখন মিথো মাথা গরম ক'রে লাভ নেই। কাল ডাক্তারের রিপোর্ট পেলেই সব বোঝা যাবে।'

ঘর অন্ধকার হইয়া গিয়াছিল, ব্যোমকেশ উঠিয়া আলো জ্বালিল। এই সময় বহির্দ্বারে আস্তে আস্তে টোকা মারার শব্দ হইল। সিঁড়িতে পদশব্দ শোনা যায় নাই, ব্যোমকেশ বিস্মিতভাবে ভ্রূ তুলিয়া বলিল, 'কে? ভেতরে এস।'

একটি অপরিচিত যুবক নিঃশব্দে প্রবেশ করিল। স্বাস্থ্যপূর্ণ বলিষ্ঠ দেহ, সুশ্রী চেহারা। কিন্তু শুষ্ক বিবর্ণ মুখে ট্রাজেডির ছায়া পড়িয়াছে। পায়ের রবার সোল জুতা ছিল বলিয়া তাহার পদধ্বনি শুনিতে পাই নাই। সে কয়েক পা অগ্রসর হইয়া অনিশ্চিতভাবে দাঁড়াইয়া বলিল, 'আমার নাম মন্মথনাথ রুদ্র—'

ব্যোমকেশ ক্ষিপ্রদৃষ্টিতে তাহার আপাদমস্তক দেখিয়া লইয়া বলিল, 'আপনিই নন্তুবাবু? আসুন।' বলিয়া একটা চেয়ার দেখাইয়া দিল।

চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া যুবক থামিয়া বলিল, 'আপনি আমাকে চেনেন?'

ব্যোমকেশ টেবিলের সম্মুখে বসিয়া বলিল, 'সম্প্রতি আপনার নাম জানবার সুযোগ হয়েছে। আপনি রেখার মৃত্যু সম্বন্ধে কিছু জানতে চান?'

যুবকের কণ্ঠস্বর ঈষৎ কাঁপিয়া গেল, 'হ্যাঁ। কি ক'রে তার মৃত্যু হ'ল ব্যোমকেশবাবু?'

'তা এখনও জানা যায়নি।'

অস্বাভাবিক উজ্জ্বল চক্ষু ব্যোমকেশের মুখের উপর রাখিয়া মন্মথ বলিল, 'আপনার কি সন্দেহ হয়, আত্মহত্যা করেছে?'

'সম্ভব নয়।'

'তবে কি কেউ তাকে— ?'

'এখনও জোর করে কিছু বলা যায় না।'

দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া মন্মথ কিছুক্ষণ বসিয়া রহিল, তারপর মুখ তুলিয়া অস্পষ্টস্বরে বলিল, 'আপনারা হয়তো শুনেছেন, রেখার সঙ্গে আমার—'

'শুনেছি।'

মন্মথ এতক্ষণ জোর করিয়া সংযম রক্ষা করিতেছিল, এবার ভাঙিয়া পড়িল, অবরুদ্ধকণ্ঠে বলিতে লাগিল, ছেলেবেলা থেকে ভালবাসতুম; যখন রেখার ছ বছর বয়স, আমি ওদের বাড়িতে খেলা করতে যেতুম, তখন থেকে। তার পর যখন বিয়ের সম্বন্ধ হ'ল তখন বাবা এমন শর্ত দিলেন যে, বিয়ে ভেঙে গেল। তবু আমি ঠিক করেছিলুম বাবার মতের বিরুদ্ধে বিয়ে করব। এই নিয়ে বাবার সঙ্গে তুমুল ঝগড়া হয়ে গেল। বাবা বললেন, 'বাড়ি থেকে দূর ক'রে দেবেন। তবু আমি—'

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'বাবার সঙ্গে আপনার কখন ঝগড়া হয়েছিল?'

'কাল দুপুরবেলা আমি বলেছিলুম, রেখাকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করব না। তখন কে জানতো যে রেখা—কিন্তু কেন এমন হ'ল ব্যোমকেশবাবু? রেখাকে প্রাণে মেরে কার কি লাভ হ'ল?'

ব্যোমকেশ একটা পেন্সিল লইয়া টেবিলের উপর হিজিবিজি কাটিতেছিল, মুখ না তুলিয়া বলিল, 'আপনার বাবার কিছু লাভ হতে পারে।'

মন্মথ চমকিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল, 'বাবা! না, না, এ আপনি কি বলছেন? বাবা—'

ত্রাস-বিস্ফারিত নেত্রে শূন্যের পানে কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া, মন্মথ আর কোনও কথা না বলিয়া স্খলিতপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

ব্যোমকেশের দিকে ফিরিয়া দেখিলাম, সে গাঢ় মনসংযোগে টেবিলের উপর হিজিবিজি কাটিতেছে।

৫

পরদিন সকালবেলাটা ডাক্তারের রিপোর্টের প্রতিক্ষায় কাটিয়া গেল। কিন্তু রিপোর্ট আসিল না। ব্যোমকেশ ফোন করিয়া থানায় খবর লইল, কিন্তু সেখানে কোনও খবর পাওয়া গেল না।

বৈকালবেলা আন্দাজ সাড়ে চারটার সময় দেবকুমারবাবু আসিলেন। আলাপ না থাকিলেও তাঁহার সহিত মুখ চেনা ছিল; আমরা খাতির করিয়া তাঁহাকে বসাইলাম। তিনি হাবুলের টেলিগ্রাম পাইবামাত্র দিল্লী ছাড়িয়া রওয়ানা হইয়াছিলেন, আজ দ্বিপ্রহরে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন।

তাঁহার বয়স চল্লিশ কি একচল্লিশ বৎসর। কিন্তু চেহারা দেখিয়া আরও বর্ষীয়ান

মনে হয়। মোটা-সোটা দেহ, মাথায় টাক, চোখে পুরু কাচের চশমা। তিনি স্বভাবত একটু অন্যমনস্ক প্রকৃতির লোক বলিয়া মনে হয়—অর্থাৎ বাহিরের জগতের চেয়ে অন্তর্লোকেই বেশী বাস করেন। তাঁহার গলাবন্ধ কোট ও গোল চশমা পরিহিত পেচকের ন্যায় চেহারা কলিকাতার ছাত্রমহলে কাহারও অপরিচিত ছিল না প্রতিবেশী বলিয়া আমিও পূর্বে কয়েকবার দেখিয়াছি। কিন্তু এখন দেখিলাম তাঁহার চেহারা কেমন যেন শুকাইয়া উঠিয়াছে। চোখের কোলে গভীর কালির দাগ গালের মাংস চুপসাইয়া গিয়াছে; পূর্বের সেই পরিপুষ্ট ভাব আর নাই।

চশমার কাচের ভিতর দিয়া আমার পানে দৃষ্টি প্রেরণ করিয়া তিনি বলিলেন 'আপনিই ব্যোমকেশবাবু?'

আমি ব্যোমকেশকে দেখাইয়া দিলাম। তিনি ব্যোমকেশের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, 'ও!' বলিয়া হাতের মোটা লাঠিটা টেবিলের উপর রাখিলেন।

ব্যোমকেশ অস্ফুটস্বরে মামুলি-দু-একটা সহানুভূতির কথা বলিল; দেবকুমারবাবুর বোধ হয় তাহা শুনিতে পাইলেন না। তাঁহার ক্ষীণদৃষ্টি চক্ষু একবার ঘরের চারিদিক পরিভ্রমণ করিল, তারপর তিনি ক্লান্তি-শিথিল স্বরে বলিলেন, 'কাল বেলা দশটায় দিল্লী থেকে বেরিয়ে আজ আড়াইটায় এসে পৌঁছেছি। প্রায় ত্রিশ ঘণ্টা ট্রেনে—'

আমরা চুপ করিয়া রহিলাম; দৈহিক শ্রান্তির পরিচয় তাঁহার প্রতি অঙ্গে ফুটিয়া উঠিতেছিল।

দেবকুমারবাবু অতঃপর ব্যোমকেশের দিকে চক্ষু ফিরাইয়া বলিলেন, 'হাবুলের মুখে আপনার কথা শুনেছি—বিপদের সময় সাহায্য করেছেন, আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'সে কি কথা, যদি একটু সাহায্য করতে পেরে থাকি, সে তো প্রতিবেশীর কর্তব্য।'

'তা বটে; কিন্তু আপনি কাজের লোক—।' তারপর হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি হয়েছিল মেয়েটার? কিছু বুঝতে পেরেছেন কি? বাড়িতে ভাল করে কেউ বলতে পারলে না।'

ব্যোমকেশ তখন যতখানি দেখিয়েছিল ও বুঝিয়াছিল, দেবকুমারবাবুকে বিবৃত করিল। শুনিতে শুনিতে দেবকুমারবাবু অন্যমনস্কভাবে পকেট হইতে সিগার বাহির করিলেন, সিগার মুখে ধরিয়া তারপর আবার কি মনে করিয়া সেটা টেবিলের উপর রাখিয়া দিলেন। আমি তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়াছিলাম। দেখিলাম, ব্যোমকেশের কথা শুনিতে শুনিতে তিনি এত তন্ময় হইয়া গিয়াছেন যে, স্নায়বিক উত্তেজনার বসে তাঁহার অস্থির হাত দুটো যে কি করিতেছে সে দিকে লক্ষ্য নাই। একবার তিনি চশমা খুলিয়া বড় বড় চোখ দুটো নিষ্পলকভাবে প্রায় দু মিনিট আমার মুখের উপর নিবদ্ধ করিয়া রাখিলেন; তারপর আবার চশমা পরিয়া চক্ষু মুদিত করিয়া রহিলেন।

ব্যোমকেশের বিবরণ শেষ হইলে দেবকুমারবাবু অনেকক্ষণ নীরব হইয়া থাকিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, 'হুঁ, ঐ ডাক্তার রুদ্রটা আমার বাড়িতে ঢুকেছিল। চামার! চণ্ডাল! টাকার জন্য ও পারে না এমন কাজ নেই। একটা জীবন্ত পিশাচ!' উত্তেজনার বশে তিনি লাঠিটা মুঠি করিয়া ধরিয়া একবারে উঠিয়া দাঁড়াইলেন তাঁহার মুখ হঠাৎ ভীষণ হিংস্র ভাব ধারণ করিল।

কয়েক মুহূর্ত পরেই কিন্তু আবার তাঁহার মুখ স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইল। আমাদের চোখে বিস্ময়ের চিহ্ন দেখিয়া বোধ হয় মনে মনে একটু অপ্রতিভ হইলেন। গলা ঝাড়িয়া বলিলেন, 'আমি যাই। ব্যোমকেশবাবু, আর একবার আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।' বলিয়া দ্বারের দিকে অগ্রসর হইলেন।

দ্বার পর্যন্ত গিয়া তিনি থমকিয়া দাঁড়াইলেন, ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কি চিন্তা করিলেন; তারপর ফিরিয়া বলিলেন, 'আমার পয়সা থাকলে এ ব্যাপারের অনুসন্ধানে আপনাকে নিযুক্ত করতুম; কিন্তু আমি গরিব—আমার পয়সা নেই।' ব্যোমকেশ কি একটা বলিতে চাহিলে তিনি লাঠি নাড়িয়া তাহাকে বাধা দিয়া বলিলেন, 'বিনা পারিশ্রমিকে আমি কারুর সাহায্য গ্রহণ করতে পারব না।' বলিয়া কোনও প্রকার অভিবাদন না করিয়া প্রস্থান করিলেন।

এই অদ্ভুত মানুষটি চলিয়া যাইবার পর দীর্ঘকাল আমরা হতবাক হইয়া বসিয়া রহিলাম। শেষে সুদীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'একটা ভ্রম সংশোধন হ'ল। আমার ধারণা হয়েছিল, দেবকুমারবাবু প্রথম পক্ষের ছেলেমেয়েদের ভালবাসেন না—সেটা ভুল। অন্তত মেয়েকে তিনি খুব বেশি ভালবাসেন।'

সিগারটা দেবকুমারবাবু ফেলিয়া গিয়াছিলেন, সেটার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ব্যোমকেশ বলিল, আশ্চর্য অন্যমনস্ক লোক।' বলিয়া ধীরে ধীরে পায়চারি করিতে লাগিল।

আমি বলিলাম, 'ডাক্তার রুদ্রর ওপর ভয়ংকর রাগ দেখলুম।'

ব্যোমকেশ উত্তর দিল না।

সন্ধ্যার পর দারোগা বীরেনবাবু স্বয়ং ডাক্তারের রিপোর্ট লইয়া আসিলেন। বলিলেন, 'রিপোর্ট বড় ডিসাপয়েণ্টিং, বারবার পরীক্ষা করে মৃত্যুর কারণ ধরতে পারা যায়নি।'

রিপোর্ট পড়িয়া দেখিলাম, ডাক্তার লিখিয়াছেন—দেহের কোথাও ক্ষতচিহ্ন নাই; শরীরের অভ্যন্তরেও কোন বিষ পাওয়া যায় নাই। হৃদ্‌যন্ত্র সবল ও স্বাভাবিক, সুতরাং হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ার জন্য মৃত্যু হয় নাই। যতদূর বুঝিতে পারা যায়, অকস্মাৎ স্নায়ুমণ্ডলীর পক্ষাঘাত হওয়ায় মৃত্যু ঘটিয়াছে। কিন্তু কি করিয়া স্নায়ুমণ্ডলীর পক্ষাঘাত ঘটিল তাহা বলিতে ডাক্তার অক্ষম। এরূপ অদ্ভুত লক্ষণহীন মৃত্যু তিনি পূর্বে কখনও দেখেন নাই।

ব্যোমকেশ কাগজখানা হাতে লইয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া চিন্তিতমুখে বসিয়া রহিল।

বীরেনবাবু বলিলেন, 'এ কেস অবশ্য করোনারের কোর্টে যাবে; সেখানে 'অজ্ঞাত কারণে মৃত্যু' রায় বেরুবে। তারপর আমরা—অর্থাৎ পুলিশ—ইচ্ছা করলে অনুসন্ধান চালাতে পারি, আবার না-ও চালাতে পারি। ব্যোমকেশবাবু, আপনি কি বলেন? এই রিপোর্টের পর অনুসন্ধান করলে কোনও ফল হবে কি?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'ফল হবে কি না বলতে পারি না, কিন্তু অনুসন্ধান চালানো উচিত।'

বীরেনবাবু উৎসুকভাবে বলিলেন, 'কেন বলুন দেখি? আপনি কি কাউকে সন্দেহ করেন?'

'ঠিক যে কোনও ব্যক্তি বিশেষকে সন্দেহ করি, তা নয়। তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এর মধ্যে গোলমাল আছে।'

বীরেনবাবু ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, 'আমারও তাই মনে হয়। আচ্ছা, দেবকুমারবাবুর স্ত্রীকে আপনার কি রকম মনে হ'ল ?'

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিল। তারপর ধীরে ধীরে বলিল, 'দেখুন, আমার মনে হয়, ও-পথে গেলে হবে না। এ মৃত্যু রহস্যের জট ছাড়াতে হ'লে সর্বপ্রথম জানতে হবে—কি উপায়ে মৃত্যু হয়েছিল। এটা যতক্ষণ না জানতে পাচ্ছেন, ততক্ষণ একে ওকে সন্দেহ ক'রে কোনও ফল হবে না। অবশ্য এ কথাও স্মরণ রাখতে হবে যে, মেয়েটির মৃত্যুর সময় তার সৎমা আর সহোদর ভাই ছাড়া বাড়িতে আর কেউ ছিল না। কিন্তু তাই ব'লে আসল জিনিসটাকে দৃষ্টির বাইরে যেতে দিলে চলবে না—'

'কিন্তু ডাক্তার যে-কথা বলতে পারছে না—'

'ডাক্তার কেবল শব পরীক্ষা করেছেন, আমরা শব ছাড়া আরও অনেক কিছু দেখেছি। সুতরাং ডাক্তার যা পারেননি আমরাও তা পারব না এমন কোনও কথা নেই।'

দ্বিধাপূর্ণ স্বরে বীরেনবাবু বলিলেন, 'তা বটে—কিন্তু— ; যা হোক, আপনি তো দেবকুমারবাবুর পক্ষ থেকে গোড়া থেকেই আছেন ; শেষ পর্যন্ত নিশ্চয় থাকবেন—দুজনে পরামর্শ ক'রে চলা যাবে।'

মৃদু হাসিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'উহুঁ। এই খানিক আগে দেবকুমারবাবু এসেছিলেন—তিনি আমাকে বরখাস্ত ক'রে গেছেন।'

বিস্মিত বীরেনবাবু বলিলেন, 'সে কি ?'

'হ্যাঁ। আমার অবৈতনিক সাহায্য তিনি চান না, আর টাকা দিয়ে আমাকে নিয়োগ করতে তিনি অক্ষম।'

'বটে! কিন্তু অক্ষম কিসে ? তিনি তো মোটা মাইনের চাকরি করেন, সাত-আটশো টাকা মাইনে পান শুনেছি।

'তা হবে।'

বীরেনবাবুর ললাট মেঘাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল, তিনি বলিলেন, 'হুঁ, দেবকুমারবাবুর আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে খোঁজ নিতে হচ্ছে। কিন্তু আপনার সাহায্য প্রত্যাখ্যান করবার কি কারণ থাকতে পারে? তিনি কাউকে আড়াল করবার চেষ্টা করছেন না তো ?'

আমি হাসিয়া ফেলিলাম। দেবকুমারবাবু অপরাধীকে আড়াল করিবার জন্য কৌশলে ব্যোমকেশের সাহায্য প্রত্যাখান করিয়াছে, এ কথা শুনিতে যেমন অদ্ভূত, তেমনি হাস্যকর।

বীরেনবাবু ঈষৎ তীক্ষ্ণস্বরে বলিলেন, 'হাসছেন যে ?'

আমি অপ্রস্তুত হইয়া বলিলাম, 'আপনি দেবকুমারবাবুকে দেখেছেন ?'

'না।'

'তাঁকে দেখলেই বুঝবেন, কেন হাসছি।'

অতঃপর বীরেনবাবু উঠিলেন। বিদায়কালে ব্যোমকেশ বলিলেন, 'আমি এ ব্যাপারের তল পর্যন্ত অনুসন্ধান ক'রে দেখব, যদি কিনারা করতে পারি। আপনি কিন্তু ছাড়া পাবেন না। দেবকুমারবাবু আপনাকে বরখাস্ত করেছেন বটে, কিন্তু দরকার হ'লে আমি আপনার কাছে আসব, মনে রাখবেন।'

ব্যোমকেশ খুশি হইয়া বলিল, 'সে তো খুব ভাল কথা ; আমার যতদূর সাধ্য আপনাকে সাহায্য করব। হাবুলের সম্পর্কে এ ব্যাপারে আমার একটা ব্যক্তিগত

আকর্ষণও রয়েছে।'

বীরেনবাবু বলিলেন, 'বেশ বেশ। আচ্ছা, উপস্থিত কোন্ পথে চললে ভাল হয়, কিছু ইঙ্গিত দিতে পারেন কি? যা হোক একটা সূত্র ধ'রে কাজ আরম্ভ করতে হবে তো?'

ব্যোমকেশ ঈষৎ চিন্তা করিয়া বলিল, 'ডাক্তার রুদ্রর দিক থেকে কাজ আরম্ভ করুন; এ গোলকধাঁধার সত্যিকার পথ হয়তো ঐ দিকেই আছে।'

বীরেনবাবু চকিতভাবে চাহিলেন। 'ও—আচ্ছা—'

তিনি নতমস্তকে ভাবিতে ভাবিতে প্রস্থান করিলেন।

৬

ইহার পর পাঁচ ছয়দিন একটানা ঘটনাহীনভাবে কাটিয়া গেল। ব্যোমকেশ আবার যেন ঝিমাইয়া পড়িল। সকালে কাগজ পড়া এবং বিকালে টেবিলের উপর পা তুলিয়া দৃষ্টিহীন চক্ষু শূন্যে মেলিয়া থাকা ছাড়া তাহার আর কাজ রহিল না।

বীরেনবাবুও এ কয়দিনের মধ্যে দেখা দিলেন না; তাই তাঁহার তদন্ত কতদূর অগ্রসর হইল জানিতে পারিলাম না। আগন্তুকের মধ্যে কেবল হাবুল একবার করিয়া আসিত। সে আসিলে ব্যোমকেশ নিজের অবসাদ ঝাড়িয়া ফেলিয়া নানাবিধ আলোচনায় তাহাকে প্রফুল্ল করিবার চেষ্টা করিত। কিন্তু হাবুলের মনে যেন একটা বিমর্ষ অবসন্নতা স্থায়ীভাবে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। সে নৈরাশ্যপূর্ণ দীপ্তিহীন চোখে চাহিয়া নীরবে বসিয়া থাকিত, তারপর আস্তে আস্তে উঠিয়া চলিয়া যাইত।

বাড়িতে কি হইতেছে না হইতেছে, জিজ্ঞাসা করিলেও সে ভালরূপ জবাব দিতে পারিত না। বিমাতার রসনা নরম না হইয়া আরও তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিয়াছে, তাহার কথার ভঙ্গিতে ইহার আভাস পাইতাম। শেষদিন সে নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'বাবা আজ রাত্রে পাটনা যাচ্ছেন; সেখানে ইউনিভার্সিটিতে লেকচার দিতে হবে।' বুঝিলাম, শোকের উপর অহর্নিশ কথার কচকচি সহ্য করিতে না পারিয়া তিনি পলায়ন করিতেছেন। এই নির্লিপ্তস্বভাব বৈজ্ঞানিকের পারিবারিক অশান্তির কথা ভাবিয়া দুঃখ হইল।

সেদিন হাবুল প্রস্থান করিবার পর বীরেনবাবু আসিলেন। তাঁহার মুখ দেখিয়া বুঝিলাম, বিশেষ সুবিধা করিতে পারেন নাই। যা হোক ব্যোমকেশ তাঁহাকে সমাদর করিয়া বসাইল।

আমাদের বৈকালিক চায়ের সময় হইয়াছিল, অচিরাৎ চা আসিয়া পৌঁছিল। তখন ব্যোমকেশ বীরেনবাবুকে জিজ্ঞাসা করিল, 'তারপর, খবর কিছু আছে?'

পেয়ালায় চুমুক দিয়া বিমর্ষভাবে বীরেনবাবু বলিলেন, 'কোনও দিকেই কিছু সুবিধা হচ্ছে না। যেদিকেই হাত বাড়াচ্ছি কিছু ধরতে ছুঁতে পারছি না; প্রমাণ পাওয়া তো দূরের কথা, একটা সন্দেহের ইশারা পর্যন্ত পাওয়া যাচ্ছে না। অথচ আমার দৃঢ় ধারণা জন্মেছে যে, এর ভেতর একটা গভীর রহস্য লুকানো রয়েছে; যতই প্রতিপদে ব্যর্থ হচ্ছি ততই এ বিশ্বাস দৃঢ় হচ্ছে।

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'মৃত্যুর কারণ সম্বন্ধে নূতন কিছু জানতে পেরেছেন?'

বীরেনবাবু বলিলেন, 'আমি ডাক্তার সাহেবের সঙ্গে দেখা করেছিলুম। তিনি অবশ্য রিপোর্টের বাইরে যেতে রাজী নন। তবু মনে হ'ল, তাঁর একটা থিয়োরী

আছে। তিনি মনে করেন, কোন অজ্ঞাত বিষের বাষ্প নাকে যাওয়ার ফলেই মৃত্যু হয়েছে। তিনি খুব অস্পষ্ট আবছায়াভাবে কথাটা বললেন বটে, তবু মনে হ'ল, তাঁর ঐ বিশ্বাস।'

ব্যোমকেশ একটু ভাবিয়া বলিল, 'উনুন ধরবার সময় মৃত্যু হয়েছিল এ কথা ডাক্তারকে বলেছিলেন বুঝি?'

'হ্যাঁ।'

আরও কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'যাক। আর এ দিকে? ডাক্তার রুদ্র সম্বন্ধে খোঁজ নিয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ। যতদূর জানতে পারলুম, লোকটা নির্জলা পাষণ্ড আর অর্থ-পিশাচ। কয়েকজন ধনুষ্টঙ্কারের রোগীর উপর নিজের আবিষ্কৃত ইনজেক্‌শান পরীক্ষা করতে গিয়ে তাদের সাবাড় করেছে—এ গুজবও শুনেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বর্তমান ব্যাপারে তাকে খুনের আসামী করা যায় না। দেবকুমারবাবুর মেয়ের সঙ্গে ওর ছেলের সম্বন্ধ হয়েছিল—এ খবর ঠিক। লোকটা দশ হাজার টাকা বরপণ দাবি করেছিল। দেবকুমারবাবুর অত টাকা দেবার ক্ষমতা নেই, কাজেই তাঁকে সম্বন্ধ ভেঙে দিতে হ'ল। ডাক্তার রুদ্রর ছেলেটা কিন্তু ভদ্রলোক, বাপের সঙ্গে এই নিয়ে তার ভীষণ ঝগড়া বেধে গিয়েছিল। ইতিমধ্যে এ বাড়িতে এই কাণ্ড—মেয়েটি হঠাৎ মারা গেল। তারপর ছোকরাটি শুনলাম বাড়ি ছেড়ে কোথায় চ'লে গেছে; তার বিশ্বাস তার বাপই প্রকারান্তরে মেয়েটির মৃত্যুর কারণ।'

মন্মথ যে পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে—এ সংবাদ নূতন বটে, কিন্তু আর সব কথাই আমরা পূর্ব হইতে জানিতাম। তাই পুরাতন কথা, শুনিতে শুনিতে ব্যোমকেশ একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিল—বীরেনবাবু থামিলে সে প্রশ্ন করিল, 'দেবকুমারবাবুর আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করবেন বলেছিলেন, করেছিলেন না কি?'

'করেছিলুম। তাঁর আর্থিক অবস্থা ভাল নয়। ধারকর্জ নেই বটে, কিন্তু মেয়ের বিয়েতে দশ-বারো হাজার টাকা খরচ করা তাঁর অসাধ্য। লোকটি বোধ হয় একটু বেহিসাবী, সাংসারিক বুদ্ধি কম। কলেজ থেকে বর্তমানে তিনি আটশো টাকা মাইনে পান, কিন্তু শুনলে আশ্চর্য হবেন, এই আটশো টাকার অধিকাংশই যায় তাঁর বীমা-কোম্পানির পেটে; পঞ্চাশ হাজার টাকার লাইফ ইন্সিওরেন্স করিয়েছেন, তাও এত বেশি বয়সে যে প্রিমিয়াম দিয়ে হাতে বড় কিছু থাকে না।'

ব্যোমকেশ বিস্মিতভাবে বলিল, 'পঞ্চাশ হাজার টাকার লাইফ ইন্সিওরেন্স নিজের নামে করেছেন?'

'শুধু নিজের নামে নয়—জয়েন্ট পলিসি, নিজের আর স্ত্রীর নামে। মাত্র এক বছর হ'ল পলিসি নিয়েছেন। দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী—তিনি মারা গেলে পাছে বিধবাকে পথে দাঁড়াতে হয়, এইজন্যেই বোধ হয়, দুজনের একসঙ্গে বীমা করিয়েছেন; এ টাকায় উত্তরাধিকারীদের দাবি থাকবে না।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'হুঁ। আর কিছু?'

বীরেনবাবু বলিলেন, 'আর কি? দেবকুমারবাবুর ছেলে হাবুলের পিছনেও লোক লাগিয়েছিলুম—যদি কিছু জানতে পারা যায়। সে ছোকরা কেমন যেন পাগলাটে ধরনের, কলেজে বড় একটা যায় না, রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়, কখনও পার্কে

চুপ ক'রে ব'সে থাকে। আপনার কাছেও রোজ একবার ক'রে আসে, জানতে পেরেছি।'

এই সময় হঠাৎ লক্ষ্য করিলাম, ব্যোমকেশের সে শৈথিল্য আর নাই, সে যেন অন্তরে-বাহিরে জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে। অনেকদিন পরে তাহার চোখে সেই চাপা উত্তেজনার প্রখর দৃষ্টি দেখিতে পাইলাম। কিছু না বুঝিয়াও আমার রক্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল।

ব্যোমকেশ কিন্তু বাহিরে কোনও উত্তেজনা প্রকাশ করিল না, পূর্ববৎ বিরসস্বরে বলিল, 'হাবুলকে বাদ দিতে পারেন। উঠছেন না কি? থানাতেই থাকবেন তো? আচ্ছা, যদি দরকার হয়, ফোনে খবর নেব।'

বীরেনবাবু একটু অবাক হইয়া গাত্রোত্থান করিলেন। তিনি প্রস্থান করিবার পর ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ পিছনে হাত দিয়া ঘরময় পায়চারি করিল; দেখিলাম তাহার চোখে সেই পুরাতন আলো জ্বলিতেছে। বীরেনবাবুকে সে হঠাৎ এমনভাবে বিদায় দিল কেন, জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছি, এমন সময় সে চেয়ারের পিঠ হইতে শালখানা তুলিয়া লইয়া বলিল, 'চল, একটু বেড়িয়ে আসা যাক। বন্ধ ঘরে ব'সে ব'সে মাথাটা গরম বোধ হচ্ছে।'

দুইজনে বাহির হইলাম। অকারণে বাড়ির বাহির হইতে ব্যোমকেশের একটা মজ্জাগত বিমুখতা ছিল; কাজ না থাকিলে সে ঘরের কোণে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে ভালবাসিত। আমিও তাহার সঙ্গদোষে কুনো হইয়া পড়িয়াছিলাম, একাকী কোথাও যাইবার অভ্যাসও ছাড়িয়া গিয়াছিল। তাই আজ তাহার উত্তপ্ত মস্তিষ্ক ফাঁকা জায়গায় বিশুদ্ধ বাতাস কামনা করিতেছে দেখিয়া খুশি হইয়া উঠিলাম।

পথে চলিতে চলিতে কিন্তু খুশির ভাব বেশীক্ষণ স্থায়ী হইল না। জনসঙ্কুল পথে ব্যোমকেশ এমনই বাহ্যজ্ঞানহীন উদ্‌ভ্রান্তভাবে চলিতে লাগিল যে, ভয় হইল, এখনই হয়তো একটা কাণ্ড বাধিয়া যাইবে। আমি তাহাকে সামলাইয়া লইয়া চলিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু সে অপ্রশমিত বেগে ইহাকে উহাকে ধাক্কা দিয়া, একবার এক বৃদ্ধ ভদ্রলোকের পা মাড়াইয়া দিয়া, কয়েক মুহূর্ত পরে পুস্তকহস্তা এক তরুণীকে ঠেলা দিয়া দৃক্‌পাত না করিয়া জগন্নাথের অপ্রতিহত রথের মত অগ্রসর হইয়া চলিল। বাস্তবিক এতটা আত্মবিস্মৃত তাহাকে আর কখনও দেখি নাই। তাহার মন যে অকস্মাৎ শিকারের সন্ধান পাইয়া বাহ্যেন্দ্রিয়ের সহিত সংযোগ হারাইয়া ছুটিয়াছে, তাহা আমি বুঝিতে ছিলাম বটে, তাহার মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন পথচারী তাহা বুঝিবে কেন?

ভর্ৎসনা-ভ্রূকুটির স্রোত পিছনে ফেলিয়া কোনক্রমে কলেজ স্কোয়ার পর্যন্ত আসিয়া পৌঁছিলাম। হাস্য-আলাপরত ছাত্রদের আবর্তমান জনতায় স্থানটি ঘূর্ণি-চক্রের মত পাক খাইতেছে। আমি আর দ্বিধা না করিয়া ব্যোমকেশের হাত শক্ত করিয়া ধরিয়া ভিতরে ঢুকিয়া পড়িলাম। এখানে আর যাহাই হউক, বৃদ্ধ এবং তরুণীকে বিমর্দিত করিবার সম্ভাবনা নাই, সুতরাং অশিষ্টতা যদি কিছু ঘটিয়া যায়, ফাঁড়াটা সহজেই কাটিয়া যাইবে। আমাদের দেশের ছাত্ররা স্বভাবত কলহপ্রিয় নয়।

পুকুরকে কেন্দ্র করিয়া দুইটি জনপ্রবাহ বিপরীত মুখে ঘুরিতেছে। আমরা একটি প্রবাহে মিশিয়া গেলাম, সংঘাতের সম্ভাবনা অনেকটা কমিয়া গেল। ব্যোমকেশ

তখন স্থানকাল সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অচেতন, তাহার ললাট একাগ্রচিন্তার সঙ্কোচনে ভ্রূকুটিবন্ধুর ; কাঁধের শাল মাঝে মাঝে স্খলিত হইয়া পড়িতেছে, কিন্তু সে দিকে তাহার ভ্রূক্ষেপ নাই।

আমি ভাবিতে লাগিলাম, বীরেনবাবুর কথার মধ্যে এমন কি ছিল, যাহা ব্যোমকেশের নিষ্ক্রিয় মনকে অকস্মাৎ পাঞ্জাব মেলের এঞ্জিনের মত সক্রিয় করিয়া তুলিয়াছে ? তবে কি রেখার মৃত্যু-সমস্যার সমাধান আসন্ন ?

সমাধান যে কত আসন্ন, তখনও তাহা বুঝিতে পারি নাই।

আধ ঘণ্টা এইভাবে পরিভ্রমণ করিবার পর ব্যোমকেশের বাহ্য-চেতনা ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসিল ; সে সহজ দৃষ্টিতে আমার পানে তাকাইল। বলিল, 'আজ দেবকুমারবাবু পাটনা যাবেন, না ?'

আমি ঘাড় নাড়িলাম।

'তাঁকে যেতে দেওয়া হবে না—' ব্যোমকেশ সম্মুখ দিকে তাকাইয়া কথা অসমাপ্ত রাখিয়া ক্ষিপ্রচরণে অগ্রসর হইয়া গেল। দেখিলাম, এক কোণে একখানি বেঞ্চি ঘিরিয়া অনেকগুলি ছেলে জড়ো হইয়াছে এবং উত্তেজিতভাবে কথা বলিতেছে। ভিড়ের বাহিরে যাহারা ছিল, তাহারা গলা বাড়াইয়া দেখিবার চেষ্টা করিতেছে। তাদের ভাব দেখিয়া মনে হইল, অসাধারণ কিছু ঘটিয়াছে।

সেখানে উপস্থিত হইয়া ব্যোমকেশ একটি ছেলেকে জিজ্ঞাসা করিল, 'কি হয়েছে ?'

ছেলেটি বলিল, 'ঠিক বুঝতে পারছি না। বোধ হয়, কেউ হঠাৎ বেঞ্চে ব'সে ব'সে মারা গেছে।'

ব্যোমকেশ ভিড় ঠেলিয়া ভিতরে ঢুকিল, আমিও তাহার পশ্চাতে রহিলাম। বেঞ্চির সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, একটি ছোকরা ঠেসান দিয়া বসিয়া আছে যেন বসিয়া বসিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। মাথা বুকের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, পা সম্মুখ দিকে প্রসারিত। অধরোষ্ঠ হইতে একটি সিগারেট ঝুলিতেছে—সিগারেটে অগ্নিসংযোগ হয় নাই। মুষ্টিবদ্ধ বাঁ হাতের মধ্যে একটি দেশলাইয়ের বাক্স।

একটি মেডিক্যাল ছাত্র নাড়ী ধরিয়া দেখিতেছিল, বলিল, 'নাড়ী নেই—মারা গেছে।'

সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছিল, ভিড়ের মধ্যে ভাল দেখা যাইতেছিল না। ব্যোমকেশ চিবুক ধরিয়া মৃতের আনমিত মুখ তুলিয়াই যেন বিদ্যুতাহতের মত ছাড়িয়া দিল।

আমারও বুকে হাতুড়ির মত প্রবল আঘাত লাগিল ; দেখিলাম—আমাদের হাবুল।

৭

পুলিস আসিয়া পৌঁছিতে বিলম্ব হইল না। আমরা দেবকুমারবাবুর ঠিকানা পুলিসকে জানাইয়া বাহির হইয়া আসিলাম।

তখন রাস্তায় গ্যাস জ্বলিয়াছে। দ্রুতপদে বাসার দিকে ফিরিতে ফিরিতে ব্যোমকেশ কয়েকবার যেন ভয়ার্ত শ্বাস-সংহত স্বরে বলিল, 'উঃ। নিয়তির কি নির্মম প্রতিশোধ ? কি নিদারুণ পরিহাস !'

আমার মাথার ভিতর বুদ্ধিবৃত্তি যেন স্তম্ভিত নিশ্চল হইয়া গিয়াছিল, তবু অসীম অনুশোচনার সঙ্গে কেবল এই কথাটাই মনে হইতে লাগিল, পরলোক যদি থাকে, তবে যাহার মৃত্যুতে হাবুল এত কাতর হইয়াছিল সেই পরম স্নেহাস্পদ

ভগিনীর সহিত তাহার এতক্ষণে মিলন হইয়াছে।

বাসায় পেঁছিয়া ব্যোমকেশ নিজের লাইব্রেরি-ঘরে গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল। শুনিতে পাইলাম, সে টেলিফোনে কথা বলিতেছে।

প্রায় এক ঘন্টা পরে সে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া ক্লান্তস্বরে পুঁটিরামকে চা তৈয়ার করিতে বলিল, তারপর বুকে ঘাড় গুঁজিয়া একখানা চেয়ারে বসিয়া পড়িল। যে ট্রাজেডির শেষ অঙ্কের যবনিকা পড়িতে আর দেরি নাই, তাহার সম্বন্ধে বৃথা প্রশ্ন করিয়া আমি আর তাহাকে বিরক্ত করিলাম না।

রাত্রি সাড়ে আটটার সময় বীরেনবাবু আসিলেন। ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'ওয়ারেন্ট এনেছেন?'

বীরেনবাবু ঘাড় নাড়িলেন।

তখন আবার আমরা বাহির হইলাম।

দেবকুমারবাবুর বাসায় আসিতে তিন চার মিনিট লাগিল। দেখিলাম, বাড়ি নিস্তব্ধ, উপরের ঘরগুলির জানালায় আলো নেই, কেবল নীচে বসিবার ঘরে বাতি জ্বলিতেছে।

বীরেনবাবু কড়া নাড়িলেন, কিন্তু ভিতর হইতে সাড়া আসিল না। তখন তিনি দ্বার ঠেলিলেন, ভেজানো দ্বার খুলিয়া গেল। আমরা ভিতরে প্রবেশ করিলাম।

বাহিরের ক্ষুদ্র ঘরটিতে তক্তপোশ পাতা, তাহার উপর দেবকুমারবাবু নিশ্চলভাবে বসিয়া আছেন। আমরা প্রবেশ করিলে তিনি রক্তবর্ণ চক্ষু তুলিয়া আমাদের পানে চাহিলেন। কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিবার পর তাঁহার মুখে একটা তিক্ত হাসি দেখা দিল, তিনি মাথা নাড়িয়া অস্ফুট স্বরে বলিলেন, 'সকলি গরল ভেল—'

বীরেনবাবু অগ্রসর হইয়া বলিলেন, 'দেবকুমারবাবু, আপনার নামে ওয়ারেন্ট আছে।'

দেবকুমারবাবুর যেন চমক ভাঙিল, তিনি দারোগাবাবুর পরিচ্ছেদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, 'আপনারা এসেছেন—ভালই হ'ল। আমি নিজেই থানায় যাচ্ছিলুম।' দুই হাত বাড়াইয়া দিয়া বলিলেন, 'হাতকড়া লাগান।'

বীরেনবাবু বলিলেন, তার দরকার নেই। কোন্ অপরাধে আপনাকে গ্রেপ্তার করা হ'ল শুনুন।' বলিয়া অভিযোগ পড়িয়া শুনাইবার উপক্রম করিলেন।

দেবকুমারবাবু কিন্তু ইতিমধ্যে আবার অন্যমনস্ক হইয়া পড়িলেন; পকেটে হাত দিয়া তিনি যেন কি খুঁজিতে খুঁজিতে নিজ মনে বলিলেন, 'নিয়তি। নইলে হাবুলও ঐ বাক্স থেকেই দেশলাইয়ের কাঠি বার করতে গেল কেন? কি ভেবেছিলুম, কি হ'ল। ভেবেছিলুম, রেখার ভাল বিয়ে দেব, নিজের একটা বড় ল্যাবরেটারি করব, হাবুলকে বিলেত পাঠাব—' পকেট হইতে সিগার বাহির করিয়া তিনি মুখে ধরিলেন।

ব্যোমকেশ নিজের দেশলাই জ্বালিয়া তাঁহার সিগারে অগ্নিসংযোগ করিয়া দিল। তারপর বলিল, 'দেবকুমারবাবু, আপনার দেশলাইটা আমাদের দিতে হবে।'

দেবকুমারবাবুর চোখে আবার সচেতন দৃষ্টি ফিরিয়া আসিল, তিনি বলিলেন, 'ব্যোমকেশবাবু? আপনিও আছেন? ভয় নেই, আত্মহত্যা করব না। ছেলেকে মেরেছি, মেয়েকে, আমি খুনী আসামীর মত ফাঁসিকাঠে ঝুলতে চাই।'

'ব্যোমকেশ বলিল, 'দেশলাইয়ের বাক্সটা তবে দিন।

পকেট হইতে বাক্স বাহির করিয়া দেবকুমারবাবু সম্মুখে ফেলিয়া দিলেন।

বলিলেন, 'নিন, কিন্তু সাবধান, বড় ভয়ানক জিনিস। প্রত্যেকটি কাঠি এক-একটি মৃত্যুবাণ। একবার জ্বালালে আর রক্ষে নেই।' ব্যোমকেশ দেশলাইয়ের বাক্সটা বীরেনবাবুর হাতে দিল, তিনি সন্তর্পণে সেটা পকেটে রাখিলেন। দেবকুমারবাবু বলিয়া চলিলেন, 'কি অদ্ভুত আবিষ্কারই করেছিলুম ; পলকের মধ্যে মৃত্যু হবে, কিন্তু কোথাও এতটুকু চিহ্ন থাকবে না। আধুনিক যুদ্ধ নীতির আমূল পরিবর্তন হয়ে যেত। বিষ নয়—এ মহামারী। কিন্তু সকলি গরল ভেল—' তিনি বুকভাঙা গভীর নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

বীরেনবাবু মৃদুস্বরে বলিলেন, 'দেবকুমারবাবু, এবার যাবার সময় হয়েছে।'

'চলুন!'—তিনি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

ব্যোমকেশ একটু কুণ্ঠিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনার স্ত্রী কি বাড়িতেই আছেন'

'স্ত্রী।'—দেবকুমারবাবুর চোখ পাগলের চোখের মত ঘোলা হইয়া গেল, তিনি হা-হা করিয়া অট্টহাস্য করিয়া উঠিলেন ; বলিলেন, 'স্ত্রী। আমার ফাঁসির পর ইন্সিওরেন্সের সব টাকা সে-ই পাবে। প্রকৃতির পরিহাস নয় ? চলুন।'

একটা ট্যাক্সি ডাকা হইল। ব্যোমকেশ হাত ধরিয়া দেবকুমারবাবুকে তাহাতে তুলিয়া দিল ; বীরেনবাবু তাঁহার পাশে বসিলেন। দুইজন কন্স্টেবল ইতিমধ্যে কোথা হইতে আবির্ভূত হইয়াছিল, তাহারাও ট্যাক্সিতে চাপিয়া বসিল।

দেবকুমারবাবু গাড়ির ভিতর হইতে বলিলেন, 'ব্যোমকেশবাবু আপনি আমার রেখার মৃত্যুর কিনারা করতে চেয়েছিলেন, আপনাকে ধন্যবাদ—'

আমরা ফুটপাথে দাঁড়াইয়া রহিলাম, ট্যাক্সি চলিয়া গেল।

* * * *

দিন দুই ব্যোমকেশ এ বিষয়ে কোনও কথা কহিল না। তাহার মনের অবস্থা বুঝিয়া আমিও পীড়াপীড়ি করিলাম না।

'তৃতীয় দিন বৈকালে সে নিজেই বলিতে আরম্ভ করিল ; এলোমেলো ভাবে কতকটা যেন নিজ মনেই বলিতে লাগিল—

'ইংরেজীতে একটা কথা আছে—vengence coming home to roost, দেবকুমারবাবুর হয়েছিল তাই। নিজের স্ত্রীকে তিনি মারতে চেয়েছিলেন, কিন্তু এমনই অদৃষ্টের খেলা, দুবার তিনি তাঁর অমোঘ অগ্নিবাণ নিক্ষেপ করলেন, দুবারই সে অগ্নিবাণ লাগল গিয়ে তাঁর প্রাণাধিক প্রিয় পুত্র-কন্যার বুকে।

'দেবকুমারবাবু অপ্রত্যাশিত ভাবে এক আবিষ্কার ক'রে ফেলেছিলেন। কিন্তু টাকার অভাবে সে আবিষ্কারের সদ্ব্যবহার করতে পারছিলেন না। এ এমনই আবিষ্কার যে, তার পেটেন্ট নেওয়া চলে না ; কারণ, সাধারণ ব্যবসাজগতে এর ব্যবহার নেই। কিন্তু ঘুণাক্ষরে এর ফরমুলা জানতে পারলে জাপান জার্মানি ফ্রান্স প্রভৃতি যুদ্ধোদ্যত রাজ্যলোলুপ জাতি নিজেদের কারখানায় এই প্রাণঘাতী বিষ তৈরি করতে আরম্ভ ক'রে দেবে। আবিষ্কর্তা কিছুই করতে পারবেন না, এতবড় আবিষ্কার থেকে তাঁর এক কপর্দকও লাভ হবে না।

'সুতরাং আবিষ্কারের কথা দেবকুমারবাবু চেপে গেলেন। প্রথমে টাকা চাই, কারণ এ বিষ কি ক'রে ব্যবহার করা যেতে পারে, সে বিষয়ে আরও অনেক এক্সপেরি-মেন্ট করা দরকার। কিন্তু টাকা কোথায় ? এতবড় এক্সপেরিমেন্ট গোপনে চালাতে

গেলে নিজের ল্যাবরেটরি চাই, তাতে অনেক টাকার দরকার। কিন্তু টাকা আসে কোথা থেকে ?

'এ দিকে বাড়িতে দেবকুমারবাবুর স্ত্রী তাঁর জীবন দুর্বহ ক'রে তুলেছিল ; মানসিক পরিশ্রম যারা করে তারা চায় সাংসারিক ব্যাপারে শান্তি, অথচ তাঁর জীবনে ঐ জিনিসটির একান্ত অভাব হয়ে উঠেছিল। এক শুচিবায়ুগ্রস্ত মুখরা স্নেহহীনা স্ত্রীর নিত্য সাহচর্য তাঁকে পাগলের মত ক'রে তুলেছিল। এটা অনুমানে বুঝতে পারি ; দেবকুমারবাবু স্বভাবত নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক নন, শান্তিতে নিজের বৈজ্ঞানিক চিন্তায় মগ্ন হয়ে থাকতে পারলে তিনি আর কিছু চান না। তাঁর মনটি যে খুব স্নেহপ্রবণ, তাঁর ছেলেমেয়ের প্রতি ভালবাসা দেখেই আন্দাজ করা যায়। দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীও চেষ্টা করলে এই স্নেহের অংশ পেতে পারতেন ; কিন্তু স্বভাবদোষে তিনি তা পেলেন না ; বরঞ্চ দেবকুমারবাবু তাঁকে বিষবৎ ঘৃণা করতে আরম্ভ করলেন।

'নিজের স্ত্রীকে হত্যা করবার ইচ্ছা মানুষের স্বাভাবিক নয় ; যখন এ প্রবৃত্তি তার হয়, তখন বুঝতে হবে—সহ্যের সীমা অতিক্রম করেছে। দেবকুমারবাবুরও সহ্যের সীমা অতিক্রান্ত হয়েছিল। তারপর তিনি যখন এই ভয়ংকর বিষ আবিষ্কার করলেন, তখন বোধ হয়, প্রথমেই তাঁর মনে হ'ল স্ত্রীর কথা। তিনি মনে মনে আগুন নিয়ে খেলা আরম্ভ করলেন।

'তারপর তাঁর সব সংশয়ের সমাধান ক'রে বীমা কোম্পানীর যুগ্ম জীবন পলিসির বিজ্ঞাপন চোখে পড়ল—স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে জীবন বীমা করতে পারে, একজন মরলে অন্যজন টাকা পাবে। এমন সুযোগ তিনি আর কোথায় পাবেন ? যদি এইভাবে জীবন বীমা ক'রে তাঁর আবিষ্কৃত বিষ দিয়ে স্ত্রীকে মারতে পারেন—এক ঢিলে দুই পাখি মরবে ; তিনি তাঁর বাঞ্ছিত টাকা পাবেন, স্ত্রীও মরবে এমন ভাবে যে কেউ বুঝতে পারবে না, কি ক'রে মৃত্যু হ'ল।'

'দেবকুমারবাবু একেবারে পঞ্চাশ হাজার টাকার জীবন বীমা করালেন, তারপর অসীম ধৈর্য সহকারে অপেক্ষা করতে লাগলেন। তাড়াতাড়ি করলে চলবে না, বীমা-কোম্পানির সন্দেহ হতে পারে। এইভাবে এক বছর কেটে গেল। তিনি মনে স্থির করলেন, এই বড়দিনের ছুটিতে তাঁর মৃত্যুবাণ নিক্ষেপ করবেন।

'তাঁর আবিষ্কৃত বিষের প্রকৃতি অনেকটা বিস্ফোরক বারুদের মত ; এমনিতে সে অতি নিরীহ, কিন্তু একবার আগুনের সংস্পর্শে এলে তার ভয়ংকর শক্তি বাষ্পরূপ ধরে বেরিয়ে আসে। সে বাষ্প কারুর নাকে কণামাত্র গেলেই আর রক্ষে নেই, তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হবে।'

'দেবকুমারবাবু তাঁর স্ত্রীর উপর এই বিষ প্রয়োগ করবার এক চমৎকার উপায় বার করলেন। বৈজ্ঞানিকের মাথা ছাড়া এমন বুদ্ধি বেরোয় না। তিনি কতকগুলি দেশলাইয়ের কাঠির বারুদের সঙ্গে এই বিষ মাখিয়ে দিলেন। কি উপায়ে মাখালেন বলতে পারি না, কিন্তু ফল দাঁড়াল—যিনি এই কাঠি জ্বালবেন তাঁকেই মরতে হবে। এইভাবে বিষাক্ত দেশলাইয়ের কাঠি তৈরী ক'রে তিনি দিল্লীতে বিজ্ঞান-সভার অধিবেশনে যোগ দেবার জন্যে প্রস্তুত হতে লাগলেন। ক্রমে দিল্লী যাবার সময় উপস্থিত হ'ল ; তখন তিনি সময় বুঝে তাঁর স্ত্রীর দেশলাইয়ের বাক্সতে একটি কাঠি রেখে দিয়ে দিল্লী যাত্রা করলেন। তিনি জানতেন, তাঁর স্ত্রী রোজ রাত্রিতে শোবার আগে ঐ দেশলাই দিয়ে ল্যাম্প জ্বালেন—এ দেশলাইয়ের বাক্স অন্যত্র ব্যবহার হয়

না। আজ হোক, কাল হোক গৃহিণী সেই কাঠিটি জ্বালবেন। দেবকুমারবাবু থাকবেন তখন ন শো মাইল দূরে—এ যে তাঁর কাজ, এ কথা কেউ মনেও আনতে পারবে না।

'সবই ঠিক হয়েছিল, কিন্তু রাম উল্টো বুঝলেন। স্ত্রীর বদলে রেখা উনুন ধরাতে গিয়ে সেই কাঠিটি জ্বাললে।

'দিল্লী থেকে দেবকুমারবাবু ফিরে এলেন। এই বিপর্যয়ে তাঁর মন স্ত্রীর বিরুদ্ধে আরও বিষিয়ে উঠল। তাঁর জিদ চ'ড়ে গেল, মেয়ে যখন গিয়েছে, তখন ওকেও তিনি শেষ ক'রে ছাড়বেন। কয়েকদিন কেটে গেল, তারপর আবার তিনি স্ত্রীর দেশলাইয়ের বাক্সে একটি কাঠি রেখে পাটনা যাবার জন্য তৈরি হলেন।'

'কিন্তু এবার আর তাঁকে যেতে হ'ল না। হাবুল সিগারেট খেত; বোধ হয়, তার দেশলাইয়ের বাক্সটা খালি হয়ে গিয়েছিল, তাই সে সংমার ঘরের দেশলাইয়ের বাক্স থেকে কয়েকটি কাঠি নিজের বাক্সে পুরে নিয়ে বেড়াতে চ'লে গেল। তারপর—

'কি ভয়ঙ্কর সর্বনাশা কালকূট যে দেবকুমারবাবু বিজ্ঞানসাগর মন্থন ক'রে তুলেছিলেন, তাঁর জীবনে—সকলি গরল ভেল।'

ব্যোমকেশ একটা নিশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিল।

কিয়ৎকাল পরে আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আচ্ছা, দেবকুমারবাবু যে অপরাধী, এটা তুমি প্রথম বুঝলে কখন?'

ব্যোমকেশ বলিল, যে মুহূর্তে শুনলুম যে, দেবকুমারবাবু পঞ্চাশ হাজার টাকার জীবন-বীমা করিয়াছেন, সেই মুহূর্তে। তার আগে রেখাকে হত্যা করবার একটা সন্তোষজনক উদ্দেশ্যই পাওয়া যাচ্ছিল না। কে তাকে মেরে লাভবান হ'ল, কার স্বার্থে সে ব্যাঘাত দিচ্ছিল—এ কথাটার ভাল রকম জবাব পাওয়া যাচ্ছিল না। রেখা যে হত্যাকারীর লক্ষ্য নয়, তা তো আমরা জানতুম না।

'কিন্তু আর এক দিক থেকে একটি ছোট্ট সূত্র হাতে এসেছিল। রেখার দেহ-পরীক্ষায় যখন বিষ পাওয়া গেল না, তখন কেবল একটা সম্ভাবনাই গ্রহণযোগ্য রইল—অর্থাৎ যে বিষে তার মৃত্যু হয়েছে, সে বিষ বৈজ্ঞানিক অপরিচিত। মানে নূতন আবিষ্কার। মনে আছে—দিল্লীতে দেবকুমারবাবুর বক্তৃতা? আমরা তখন সেটা অক্ষমের বাহ্বাস্ফোট বলে উড়িয়ে দিয়েছিলুম। কে জানত, তিনি সত্যই এক অদ্ভুত আবিষ্কার ক'রে ব'সে আছেন! আর তারই চাপা ইঙ্গিত তার বক্তৃতায় ফুটে বেরুচ্ছে।

'সে যা হোক, কথা দাঁড়াল—এই নূতন আবিষ্কার কোথা থেকে এল? দুজন বৈজ্ঞানিক হাতের কাছে রয়েছে—এক ডাক্তার রুদ্র, দ্বিতীয় দেবকুমারবাবু। এঁদের দুজনের মধ্যে একজন এই অজ্ঞাত বিষের আবিষ্কর্তা। কিন্তু ডাক্তার রুদ্রর উপর সন্দেহটা বেশি হয়, কারণ তিনি ডাক্তার, বিষ নিয়ে নাড়াচাড়া তাঁরই বেশি। তা ছাড়া দেবকুমারবাবু বিশেষ আবিষ্কর্তা হ'লে তিনি কি নিজের মেয়ের উপর সে বিষ প্রয়োগ করবেন?'

'কাজেই সব সন্দেহ পড়ল গিয়ে ডাক্তার রুদ্রর উপর। কিন্তু তবু আমার মন খুঁত-খুঁত করতে লাগল। ডাক্তার রুদ্র লোকটা অতি পাজি, কিন্তু তাই ব'লে সে এত সামান্য কারণে একটি মেয়েকে খুন করবে? আর যদিই বা সে তা করতে চায়, রেখার নাগাল পাবে কি ক'রে? কোন্ উপায়ে আর একজনের বাড়িতে বিষ পাঠাবে?

রেখার সঙ্গে মন্মথর ছাদের উপর থেকে দেখাদেখি চিঠি-ফেলাফেলি চলত ; কিন্তু রুদ্রর সঙ্গে তো সে রকম কিছু ছিল না।

'কোনও বিষাক্ত বাষ্পই যে মৃত্যুর কারণ, এ চিন্তাটা গোড়া থেকে আমার মাথার মধ্যে ধোঁয়ার মত ঘুরে বেড়াচ্ছিল। মনে ক'রে দেখ, রেখার একহাতে পোড়া দেশলাইয়ের কাঠি, আর এক হাতে বাক্স ছিল ; অর্থাৎ দেশলাই জ্বালার পরই মৃত্যু হয়েছে। সংযোগটা সম্পূর্ণ আকস্মিক হতে পারে, আবার কার্য-কারণ সম্বন্ধও থাকতে পারে। দেবকুমারবাবু কিন্তু বড় চালাকি করেছিলেন, বাক্সে একটি বই বিষাক্ত কাঠি দেননি—যাতে বাক্সের অন্যান্য কাঠি পরীক্ষা ক'রে কোনও হদিস পাওয়া না যায়। আমি সে বাক্সটা এনেছিলুম, পরীক্ষাও করেছিলুম, কিন্তু কিছু পাইনি। হাবুলের বেলাতেও বাক্সে একটি বিষাক্ত কাঠিই ছিল, কিন্তু এমনই দুর্দৈব যে, সেইটেই হাবুল পকেটে ক'রে নিয়ে এল—আর প্রথমেই জ্বললো।

'অজিত, তুমি তো লেখক, দেবকুমারবাবুর এই ব্যাপারের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড রূপক দেখতে পাচ্ছ না? মানুষ যেদিন প্রথম অন্যকে হত্যা করবার অস্ত্র আবিষ্কার করেছিল, সেদিন সে নিজেরই মৃত্যুবাণ নির্মাণ করেছিল ; আর আজ সারা পৃথিবী জুড়ে গোপনে গোপনে এই যে হিংসার কুটিল বিষ তৈরী হচ্ছে, এও মানুষ জাতটাকে একদিন নিঃশেষে ধ্বংস ক'রে ফেলবে—ব্রহ্মার ধ্যান-উদ্ভূত দৈত্যের মত সে স্রষ্টাকেও রেয়াৎ করবে না। মনে হয় নাকি?'

ঘর অন্ধকার হইয়া গিয়াছিল, ব্যোমকেশকে ভাল দেখা যাইতেছিল না। আমার মনে হইল, তাহার শেষ কথাগুলা কেবল জল্পনা নয়—ভবিষ্যদ্‌বাণী।

অমিতাভ

যত অসম্ভব কথাই বলি না কেন, যদি একজন বড় পণ্ডিতের নাম সেই সঙ্গে জুড়িয়া দিতে পারি, তবে আর কথাটা কেহ অবিশ্বাস করে না। আমি যদি বলি, আজ রাত্রিতে অন্ধকার পথে একেলা আসিতে আসিতে একটা ভূত দেখিয়াছি, সকলে তৎক্ষণাৎ তাহা হাসিয়া উড়াইয়া দিবে ; বলিবে,—"বেটা গাঁজাখোর, ভেবেছে আমরাও গাঁজা খাই।" কিন্তু সার্ অলিভার লজ যখন কাগজে-কলমে লিখিলেন, একটা নয়, লক্ষ-লক্ষ কোটি-কোটি ভূত দিবারাত্রি পৃথিবীময় কিলবিল করিয়া বেড়াইতেছে, তখন সকলেই সেটা খুব আগ্রহ সহকারে পড়িল এবং গাঁজার কথাটা একবারও উচ্চারণ করিল না।

এটা অবিশ্বাসের যুগ—অথচ মানুষকে একটা কথা বিশ্বাস করানো কত না সহজ? শুধু একটি পণ্ডিতের নাম—একটি বড়-সড় আধুনিক পাশ্চাত্য পণ্ডিত—সেকেলে হইলে চলিবে না এবং দেশী হইলে তো সবই মাটি।

তাই ভাবিতেছি, আমি যে জাতিস্মর এ কথা কেমন করিয়া বিশ্বাস করাইব? কোন্ বিদেশী বৈজ্ঞানিকের নাম করিয়া সন্দেহ-দ্বিধা ভঞ্জন করিব? আমি রেলের কেরানি, বিদ্যা এন্ট্রান্স পর্যন্ত। তের বৎসর একাদিক্রমে চাকরি করিবার পর আজ ছিয়াত্তর টাকা মাসিক বেতন পাইতেছি। আমি জাতিস্মর। হাসির কথা নয়?

রেলের পাশ লইয়া সে বৎসর আমি রাজগৃহে ভগ্নাবশেষ দেখিতে যাই—ঘন জঙ্গলের মধ্যে প্রাচীন ইষ্টকস্তূপের উপর দাঁড়াইয়া সেদিন প্রথম আমার চক্ষুর

সম্মুখ হইতে কালের যবনিকা সরিয়া গিয়াছিল। যে দৃশ্য দেখিয়াছিলাম তাহা কত দিনের কথা? দু'হাজার বৎসর না তিন হাজার বৎসর? ঠিক জানি না। কিন্তু মনে হয়, পৃথিবী তখন আরও তরুণ ছিল, আকাশ আরও নীল ছিল, শষ্প আরও শ্যাম ছিলো।

আমি জাতিস্মর। ছিয়াত্তর টাকা মাহিনার রেলের কেরানী জাতিস্মর! উপহাসের কথা—অবিশ্বাসের কথা। কিন্তু তবু আমি বারবার—বোধহয় বহু শতবার—এই ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। কখনও দাস হইয়া জন্মিয়াছি, কখনও সম্রাট হইয়া সসাগরা পৃথ্বী শাসন করিয়াছি। শত মহিষী, সহস্র বন্দিনী আমার সেবা করিয়াছে। বিদ্যুৎশিখার মতো, জ্বলন্ত বহ্নির মতো রূপ লইয়া আজ সেই নারীকুল কোথায় গেল? সে রূপ পৃথিবীতে আর নাই—সে নারীজাতিও আর নাই, ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। এখন যাহারা আছে, তাহারা তেলাপোকার মতো অন্ধকারে বাঁচিয়া আছে। তখন নারী ছিল অহির মতো তীব্র দুর্জেয়। অরণ্য অশ্বিনীর মতো তাহাদিগকে বশ করিতে হইত।

আর পুরুষ? আর্শিতে নিজের মুখ দেখি আর হাসি পায়। সেই আমি—শূরসেনরাজের দুই কন্যাকে দুই বাহুতে লইয়া দুর্গ-প্রাচীর হইতে পরিখার জলে লাফাইয়া পড়িয়া সন্তরণে যমুনা পার হইয়াছিলাম। তারপর কিন্তু—যাক্ সেকথা। কেহ বিশ্বাস করিবে না, কেবল হাসিবে। আমিও হাসি—আফিসে কলম পিষিতে পিষিতে হঠাৎ অট্টহাসি হাসিয়া উঠি।

কিন্তু কথাটা সত্য। এমন বহুবার ঘটিয়াছে। রাজগীরের ধ্বংসস্তূপের উপর দাঁড়াইয়া মনে হইয়াছিল, এ স্থান আমার চিরপরিচিত, একবার নহে—শত সহস্রবার আমি এইখানে দাঁড়াইয়াছি। কিন্তু তখন এ-স্থান জঙ্গল ও ইষ্টকস্তূপে সমাহিত ছিল না। ঠিক যেখানে আমি দাঁড়াইয়া আছি, তাহার বাঁ দিক দিয়া এক সংকীর্ণ দীর্ঘ পথ গিয়াছিল। পথের দুই পাশে ব্যবহারীদের গৃহ ছিল। দূরে ঐ স্থানে মহাধনিক সুবর্ণ দত্তের দারু-নির্মিত প্রাসাদ ছিল। যেদিন রাজগৃহে আগুন লাগে, সেদিন সুবর্ণদত্ত আসবপানে বিবশ হইয়া কক্ষদ্বার রুদ্ধ করিয়া ঘুমাইতেছিল। তাহার সঙ্গে ছিল চারিজন রূপাজীবা নগরকামিনী। নগর ভস্মীভূত হইবার পর পৌরজন তাহাদের মৃতদেহ কক্ষ হইতে বাহির করিল। দেখা গেল শ্রেষ্ঠী মরিয়াছে বটে, কিন্তু তাহার দেহ দগ্ধ হয় নাই—সুসিদ্ধ হইয়াছে মাত্র। কিছুকাল পূর্বে কে বলিদ্বীপ হইতে এক অষ্টোত্তর-সহস্রনাল ইন্দ্রচ্ছন্দা মালা আনিয়াছিল। সেরূপ মুক্তাহার মগধে আর ছিল না। সকলে দেখিল, ধণিকের কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া আছে সেই ইন্দ্রচ্ছন্দার মুক্তাভস্ম।

কিন্তু ক্রমেই আমি অসংযত হইয়া পড়িতেছি। শূরসেনের সহিত মগধ অগ্নিদাহের সহিত রাজকন্যা হরণ মিশাইয়া ফেলিতেছি। এমন করিলে তো চলিবে না।

আসল কথাটা আর একবার বলিয়াই লই—আমি জাতিস্মর। মিউজিয়ামে রক্ষিত এক শিলাশিল্প দেখিয়া আমার বুকের ভিতরটা আলোড়িত হইয়া উঠে, কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হইয়া যায়। এ শিল্প তো আমার রচনা। আসমুদ্রকরগ্রাহী সম্রাট কনিষ্কের সময় যখন সদ্ধর্মের পুনরুত্থান হইয়াছিল, তখন বিহারের গাত্রশোভার জন্য এ নবপত্রিকা আমি গড়িয়াছিলাম। তখন আমার নাম ছিল পুণ্ডরীক। আমি ছিলাম প্রধান শিল্পী…রাজভাস্কর। সেই পুণ্ডরীক-জীবনের প্রত্যেক ঘটনা

যে আমার স্মরণে মুদ্রিত আছে ; এই যে নব-পত্রিকার মধ্যবর্তী বিনগ্না যক্ষিণী-মূর্তি দেখিতেছেন, তাহার আদর্শ কে ছিল জানেন? সিতাংশুকে...তক্ষশিলার সর্বপ্রধানা রূপোপজীবিনী, রাজমুখ্যা। সকলেই জানিত, সিতাংশুকা রাজ-ঔরসজাতা। সেই সিতাংশুকাকে নিরংশুকা করিয়া, সম্মুখে দাঁড় করাইয়া, বজ্রসূচী দিয়া পাষাণ কাটিয়া এই যক্ষিণী মূর্তি গড়িয়াছিলাম। পুণ্ডরীক ভিন্ন এ মূর্তি আর কে গড়িতে পারিত? কিন্তু তবু মনে হয়, সে অপার্থিব লাবণ্য কঠিন প্রস্তরে ফুটে নাই। আজও, এই কেরানি জীবনেও সেই অলৌকিক রূপৈশ্বর্য আমার মস্তিষ্কের মধ্যে অঙ্কিত আছে।

আবার কেমন করিয়া বিষ-ধূম দিয়া সিতাংশুকা আমার প্রাণসংহার করিল, সে কথাও ভুলি নাই। সুরম্য কক্ষ, চতুষ্কোণে স্ফটিক-গোলকের মধ্যে পুন্নাগচম্পক-তৈলের সুগন্ধি দ্বীপ জ্বলিতেছে, কেন্দ্রস্থলে বিচিত্র চীনাংশুকে আবৃত পালঙ্ক শয্যা, শিয়রে ধূপ জ্বলিতেছে—সেই ধূপশলাকার গন্ধে ধীরে ধীরে দেহ অবশ হইয়া আসিতেছে। বহুদূর হইতে বাদ্যের করুণ নিক্কণ ইন্দ্রিয়সকলকে তন্দ্রাচ্ছন্ন করিয়া আনিতেছে ; তারপর মোহনিদ্রা—সে নিদ্রা সে জন্মে আর ভাঙিল না।

এমনই কত জীবনের কত বিচ্ছিন্ন ঘটনা, কত অসমাপ্ত কাহিনী স্মৃতির মধ্যে পুঞ্জীভূত হইয়া আছে। সেই সুদূর অতীতে এমন অনেক জিনিস ছিল—যাহা সেকালের সম্পূর্ণ নিজস্ব, একালের সহিত তাহার সম্বন্ধমাত্র নাই। অতিকায় হস্তীর মতো তাহারা সব লোপ পাইয়াছে। মনে হয় যেন, তখন মানুষ বেশি নিষ্ঠুর ছিল, জীবনের বড় একটা মূল্য ছিল না। অতি তুচ্ছ কারণে একজন আর একজনকে হত্যা করিত এবং সেই জন্যই বোধ করি, মানুষের প্রাণের ভয়ও কম ছিল। আবার মানুষের মধ্যে ক্রূরতা, চাতুরী, কুটিলতা ছিল বটে, কিন্তু ক্ষুদ্রতা ছিল না। একালের মানুষ যেন সব দিক দিয়াই ছোট হইয়া গিয়াছে। দেহের, মনের, হৃদয়ধর্মের সে প্রসার আর নাই। যেন মানুষ তখন তরুণ ছিল, এখন বৃদ্ধ হইয়া গিয়াছে।

আর একটা কথা, এ কালের মতো স্বাধীনতা কথাটাকে তখন কেহ এত বড় করিয়া দেখিত না। মাছ যেমন জলে বাস করে, মানুষ তেমনই স্বাধীনতার আব-হাওয়ায় বাস করিত। স্বাধীনতায় ব্যাঘাত পড়িলে লড়াই করিত, মরিত ; বাঘের মতো পিঞ্জরাবদ্ধ হইয়াও পোষ মানিত না। যুগান্তরব্যাপী অধীনতার শৃঙ্খল তখনও মানুষের পায়ে কাটিয়া বসে নাই, মনের দাসবৃত্তি ছিল না। রাজা ও প্রজার মধ্যে প্রভেদও এত বেশি ছিল না। নির্ভয়ে দীন প্রজা চক্রবর্তী সম্রাটের নিকট আপনার নালিশ জানাইত, অধিকার দাবী করিতে ভয় করিত না।

ঘরের কোণে বসিয়া লিখিতেছি, আর ধূম-কুণ্ডলীর মতো বর্তমান জগৎ আমার সম্মুখ হইতে মিলাইয়া যাইতেছে। আর একটি মায়াময় জগৎ ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিতেছে। আড়াই হাজার বৎসর পূর্বের এক স্বপ্ন দেখিতেছি। এক পুরুষ—ভারত আজ তাঁহাকে ভুলিয়া গিয়াছে—তাঁহার কোটিচন্দ্রস্নিগ্ধ মুখপ্রভা এই দুই নশ্বর নয়নে দেখিতেছি, আর অন্তরের অন্তস্থল হইতে আপনি উৎসারিত হইতেছে—

"অসতো মা সদ্গময়
তমসো মা জ্যোতির্গময়—"

সেই জ্যোতির্ময় পুরুষকে একদিন দুই চক্ষু ভরিয়া দেখিয়াছিলাম—তাঁহার কণ্ঠস্বর শুনিয়াছিলাম—আজ সেই কথা জন্মান্তরের স্মৃতি হইতে উদ্ধৃত করিব।

উত্তরে মাতুলবংশ লিচ্ছবি ও পশ্চিমে মাতুলবংশ কোশল মগধেশ্বর পরমবৈষ্ণব শ্রীমন্মহারাজ অজাতশত্রুকে বড়ই বিব্রত করিয়া তুলিয়াছে। পূর্বতন মহারাজ বিম্বিসার শান্তিপ্রিয় লোক ছিলেন, তাই লিচ্ছবি ও কোশলের সহিত বিবাদ না করিয়া তাহাদের কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন। অজাতশত্রু কিন্তু সে ধাতুর লোক নহেন—বিবাহ করা অপেক্ষা যুদ্ধ করাকে তিনি বেশি পছন্দ করেন। তাছাড়া, ইচ্ছা থাকিলেও মাতুলবংশে বিবাহ করা সম্ভব নহে। তাই অজাতশত্রু পিতার অপঘাত মৃত্যুর পর প্রফুল্ল মনে যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিলেন।

কিন্তু অসুবিধা এই যে শত্রু দুই দিকে—উত্তরে এবং পশ্চিমে। উত্তরের শত্রু তাড়াইতে গেলে পশ্চিমের শত্রু রাজ্যের মধ্যে ঢুকিয়া পড়ে; কোশলকে কাশীর পরপারে খেদাইয়া দিয়া ফিরিবার পথে দেখেন, লিচ্ছবিরা রাজগৃহে ঢুকিবার বন্দোবস্ত করিতেছে। মগধ রাজ্যে অন্তপাল সামন্তরাজারা সীমানা রক্ষা করিতে না পারিয়া কেহ রাজধানীতে পলাইয়া আসিতেছে, কেহ বা শত্রুর সহিত মিলিয়া যাইতেছে। রাজ্যে অশান্তির শেষ নাই। প্রজারা কেহই অজাতশত্রুর উপর সন্তুষ্ট নহে; তাহাদের মতে রাজা বীর বটে, কিন্তু বুদ্ধিশুদ্ধি অধিক নাই, শীঘ্র ইহাকে সিংহাসন হইতে না সরাইলে রাজ্য ছারেখারে যাইবে।

প্রজারা কিন্তু ভুল বুঝিয়াছিল। অজাতশত্রু নির্বোধ মোটেই ছিলেন না। তাঁহার অসির এবং বুদ্ধির ধার প্রায় সমান তীক্ষ্ন ছিল।

একদিন বর্ষাকালের আরম্ভে যুদ্ধ স্থগিত আছে—অজাতশত্রু রাজ্যের মহামাত্য বর্ষকারকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। নগরের নির্জন স্থানে বেণুবন নামে এক উদ্যান আছে; বিম্বিসার ইহা বুদ্ধদেবকে দান করিয়াছিলেন, কিন্তু অজাতশত্রু আবার উহা কাড়িয়া লন। সেই উদ্যানে প্রাচীন মন্ত্রী ও নবীন মহারাজের মধ্যে অতি গোপনে কি কথাবার্তা হইল। সে সময় গুপ্তচরের ভয় বড় বেশি; সন্ন্যাসী, ভিক্ষুক, জ্যোতিষী, বারবনিতা, নট কুশীলব ইহাদের মধ্যে কে গুপ্তচর কে নহে, অনুমান করা অতিশয় কঠিন। সম্প্রতি নগরে বৈশালী হইতে জঘনচপলা নাম্নী এক বারাঙ্গনা আসিয়াছে। তাহাকে দেখিয়া সমস্ত নাগরিক তো ভুলিয়াছেই, এমন কি স্বয়ং রাজা পর্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন। কিন্তু জঘনচপলা কোশল কিংবা বৃজির গুপ্তচর কি না, নিশ্চয়রূপে না-জানা পর্যন্ত নিজেকে কঠিন শাসনে রাখিয়াছেন। এইরূপ চর সর্বত্রই ঘুরিতেছে; তাই গূঢ়তম মন্ত্রণা খুব সাবধান হইয়াই করিতে হয়। এমন কি সকল সময় অন্যান্য আমাত্যদের পর্যন্ত সকল কথা জানানো হয় না।

নিভৃতে বহুক্ষণ আলাপের পর মহামন্ত্রী গৃহে ফিরিয়া গেলেন। উদ্যানের প্রতিহারী দেখিল, বৃদ্ধের শুষ্ক নীরস মুখে হাসি এবং নির্বাপিত চক্ষুতে জ্যোতি ফুটিয়াছে।

প্রহর রাত্রি অতীত হইবার পর আহারান্তে শয়ন করিয়াছিলাম, ঈষৎ নিদ্রাকর্ষণও হইয়াছিল। এমন সময় দাসী আসিয়া সংবাদ দিল, "পরিব্রাজিকা সাক্ষাৎ চান।"

তন্দ্রা ছুটিয়া গেল। চকিতে শয্যায় উঠিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "পরিব্রাজিকা? এত রাত্রে?"

এই রাজ-সম্মানিতা মহাশক্তিশালিনী নারী কি প্রয়োজনে এরূপ সময়ে আমার সাক্ষাৎপ্রার্থিনী, জানিবার জন্য ত্বরিতপদে দ্বারে উপস্থিত হইলাম। সসম্ভ্রমে তাঁহাকে গৃহের ভিতর আনিয়া আসনে বসাইয়া দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করিয়া বলিলাম, "দেবী,

কি, জন্য দাসের প্রতি কৃপা হইয়াছে ?"

পরিব্রাজিকার যৌবন উত্তীর্ণ হইয়াছে, কিন্তু মুখশ্রী এখনও সুন্দর ও সম্ভ্রম উৎপাদক। তাঁহার পরিধানে পট্টবস্ত্র, ললাটে কুঙ্কুমতিলক, হস্তে একটি সনাল পদ্ম-কোরক। সহাস্যে বলিলেন, "বৎস, আজ সন্ধ্যার পর কমলকোরক দিয়া কুমারী পূজা করিতেছিলাম, সহসা এই কোরকটি কুমারীর চরণ হইতে আমার ক্রোড়ে পতিত হইল।"

কথার উদ্দেশ্য কিছুই বুঝিতে না পারিয়া আমি শুধু বলিলাম, "তারপর ;"

পরিব্রাজিকা বলিলেন, "কুমারীর আদেশ বুঝিতে না পারিয়া ধ্যানস্থ হইলাম। তখন দেবী আমার কর্ণে বলিলেন, "এই নির্মাল্য শ্রেণীনায়ক কুমারদত্তকে দিবে। ইহার বলে সে সর্বত্র গতিলাভ করিবে।"

আমি হতবুদ্ধির মতো পরিব্রাজিকার মুখের পানে তাকাইয়া রহিলাম। তিনি কক্ষের চতুর্দিকে ক্ষিপ্র দৃষ্টিপাত করিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিলেন, "এই কোরক লও, ইহাতেই উপদেশ আছে। কার্যসিদ্ধি হইলে ইহার বিনাশ করিও। মনে রাখিও, ইহার বলে, রাজমন্দিরেও তোমার গতি অব্যাহত হইবে।"

এই বলিয়া পদ্মকলিটি আমার হস্তে দিয়া পরিব্রাজিকা বিদায় [illegible] নির্বোধের মতো বসিয়া রহিলাম, তাঁহাকে প্রণাম করিতেও ভুলিয়া গেলাম।

আমি সামান্য ব্যক্তি, কুলী-মজুর খাটাইয়া খাই, রাজগৃহের স্থপতি-সূত্রধর-সম্প্রদায়ের শ্রেণীনায়ক। আমার উপর রাজ-রাজড়ার দৃষ্টি পড়িল কেন ? যদি বা পড়িল, তবে এমন রহস্যময়ভাবে পড়িল কেন ? রাজ-অবরোধের পরিব্রাজিকা আমার মত দীনের কুটিরে পদধূলি দিলেন কি জন্য ? কুমারী কুমারদত্তের উপর সদয় হইয়া তাহার সর্বত্র গতিবিধির ব্যবস্থাই বা করিয়া দিলেন কেন ? এখন এই পদ্মকলি লইয়া কি করিব ? কার্যসিদ্ধি হইলে ইহাকে বিনষ্ট করিতেই বা হইবে কেন ? আমি পূর্বে কখনও রাজকীয় ব্যাপারে লিপ্ত হয় নাই, তাই নানা চিন্তায় মন একেবারে দিশেহারা হইয়া গেল।

দ্বিপ্রহর রাত্রি প্রায় উত্তীর্ণ হইতে চলিল। দাসী দ্বারের কাছে অপেক্ষা করিয়া আছে। তাহার বোধ করি, আজ কোথাও অভিসার আছে, কারণ বেশভূষায় একটু শিল্পচাতুর্য রহিয়াছে। কবরীতে জাতিপুষ্পের শোভা, কঞ্চুলী দৃঢ়বদ্ধ। দাসী দেখিতে মন্দ নহে, চোখ দুটি বড় বড়, মুখে মিষ্ট হাসি, তার উপর ভরা যৌবন। আমি তাহাকে বলিলাম, "বনলতিকে, তুমি গৃহে যাও, রাত্রি অধিক হইয়াছে।" সে হাসিমুখে প্রণাম করিয়া বিদায় হইল।

পদ্মকোরক হস্তে শয়ন-মন্দিরে গেলাম ; বর্তিকার সম্মুখে ধরিয়া বহুক্ষণ নিরীক্ষণ করিলাম। কোরকটি মুদিত হইয়া আছে, ধীরে ধীরে পলাশগুলি উন্মোচন করিয়া দেখিতে লাগিলাম। দেখিতে দেখিতে নাভীর সমীপবর্তী কোমল পল্লবে অস্পষ্ট চিহ্ন সকল চোখে পড়িল। সযত্নে পল্লবটি ছিঁড়িয়া দেখিলাম, কজ্জলমসী দিয়া লিখিত লিপি—'অদ্য মধ্যরাত্রে একাকী মহামন্ত্রীর দ্বারে উপস্থিত হইবে। সংকেত-মন্ত্র—কুট্যাল'। লিপির নিম্নে মগধেশ্বরের মুদ্রা।

এতক্ষণে ব্যাপারটা পরিষ্কার হইল। পরিব্রাজিকার নিগূঢ় কথাবার্তা, কুমারীর পূজা সমস্তই স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম। গোপনে মহামাত্যের নিকট আমার তলব হইয়াছে। কিন্তু প্রকাশ্যভাবে ডাকিয়া পাঠাইলেই তো হইত। আকাশ-পাতাল

ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। আমি একজন অতি সামান্য নাগরিক, আমাকে লইয়া রাজ্যের মহামাত্য কি করিবেন? বুড়া অত্যন্ত খিটখিটে, কি জানি যদি না জানিয়া কোনও অপরাধ করিয়া থাকি তবে হয়তো শূলে চড়াইয়া দিবে। কিংবা কে বলিতে পারে, হয়তো গোপনে কোথাও রত্নাগার নির্মাণ করিতে হইবে, তাই এই সতর্ক আহ্বান।

উদ্বেগ, আশঙ্কা এবং উত্তেজনায় আরও কিছুক্ষণ কাটিয়া গেল। কিন্তু রাজাদেশ উপেক্ষা করিবার উপায় নাই,—স্বেচ্ছায় না যাইলে হয়তো বাঁধিয়া লওয়া যাইবে। তাই অবশেষে উত্তরীয় লইয়া পথে বাহির হইলাম।

আমার গৃহ নগরের উত্তরে, মহামন্ত্রীর প্রাসাদ নগরের কেন্দ্রস্থলে। পথ জনহীন, পথের উভয়পার্শ্বস্থ গৃহগুলিও নির্বাপিত দীপ, নিদ্রিত। দূরে দূরে সংকীর্ণ পরিপার্শ্বে পাষাণ বনদেবীর হস্তে স্ফটিকের দীপ জ্বলিতেছে। তাহাতে মধ্যরাত্রের গাঢ় অন্ধকার ঈষৎ আলোকিত।

মহামাত্যের বৃহৎ প্রাসাদ-সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। বাহিরে অন্ধকার, প্রহরীও নাই; কিন্তু বহির্দ্বার উন্মুক্ত। একটু ইতস্ততঃ করিয়া, সাহসে ভর করিয়া প্রবেশ করিতে গেলাম—অমনি তীক্ষ্ণ ভল্লের অগ্রভাগ কণ্ঠে ফুটিল; অন্ধকারে অদৃশ্য থাকিয়া ভল্লের অন্যপ্রান্ত হইতে কে নিম্নস্বরে প্রশ্ন করিল, "তুমি কে?"

অকস্মাৎ এরূপভাবে আক্রান্ত হইয়া বাগ্‌রোধ হইয়া গেল; বর্শার ফলা কণ্ঠ স্পর্শ করিয়া আছে, একটু চাপ দিলেই সর্বনাশ। আমি মূর্তির মতো ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া থাকিয়া শেষে সেই সনাল পদ্মকলি তুলিয়া ধরিয়া দেখাইলাম।

আততায়ী জিজ্ঞাসা করিল, "উহা কি নাম বল।"

বলিলাম, "সনাল উৎপল।"

সন্দিগ্ধ কণ্ঠে পুনরায় প্রশ্ন হইল, "কি নাম বলিলে?"

বুঝিলাম, এ প্রহরী। লিপিতে যে সংকেত-মন্ত্র ছিল তাহা স্মরণ হইল, বলিলাম, "কুট্মল।"

বর্শা কণ্ঠ হইতে অপসৃত হইল। অন্ধকারে প্রহরী আমার হাত ধরিয়া প্রাসাদের মধ্যে লইয়া চলিল।

সূচীভেদ্য অন্ধকারে কিছু দূর পর্যন্ত সে আমাকে লইয়া গেল। তারপর আর একজন আসিয়া হাত ধরিল। সে আরও কিছুদূরে লইয়া গিয়া অন্য এক হস্তে সমর্পণ করিল। এইরূপে পাঁচ ছয়জন দ্বারী, প্রহরী, প্রতিহারীর হস্ত হইতে হস্তান্তরিত হইয়া অবশেষে এক আলোকিত ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে উপস্থিত হইলাম।

সেই কক্ষের মধ্যস্থলে অজিনাসনে বসিয়া একস্তূপ ভূর্জপত্র-তালপত্র সম্মুখে লইয়া বৃদ্ধ মহামন্ত্রী নিবিষ্ট-মনে পাঠ করিতেছেন। কক্ষে দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই।

সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলাম। মহামাত্য সম্মুখে আসন নির্দেশ করিয়া বলিলেন, "উপবিষ্ট হও।"

আমি উপবেশন করিলাম।

মহামাত্য জিজ্ঞাসা করিলেন, "পরিব্রাজিকার হস্তে যে লিপি পাইয়াছিলে, উহা কোথায়?"

পদ্মদল বাহির করিয়া মহামাত্যকে দিলাম। তিনি সেটার উপর একবার চক্ষু বুলাইয়া আমাকে ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন, "ভক্ষণ কর।"

কিছুই বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার মুখের প্রতি মূঢ়বৎ তাকাইয়া রহিলাম। ভক্ষণ করিব আবার কি?

মহামন্ত্রী আবার বলিলেন, "এই লিপি ভক্ষণ কর।"

মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। রাত্রি দ্বিপ্রহরে ডাকাইয়া পাঠাইয়া তারপর অকারণে লিপি ভক্ষণ করিতে বলা, এ কিরূপ ব্যবহার? হউন না তিনি রাজমন্ত্রী—তাই বলিয়া—

মন্ত্রীর ওষ্ঠপ্রান্তে ঈষৎ কুঞ্চন দেখা গেল। আবার অনুচ্চ কণ্ঠে কহিলেন, "চারিদিকে গুপ্তচর ঘুরিতেছে—তাই এ সতর্কতা! লিপি সুস্বাদু বলিয়া তোমাকে উহা খাইতে বলি নাই।"

তখন ব্যাপার বুঝিয়া সেই কোমল পদ্মপল্লবটি খাইয়া ফেলিলাম।

তারপর কিছুক্ষণ সমস্ত নীরব। মহামাত্যের শীর্ণ মুখ ভাবলেশহীন। প্রদীপের শিখা নিষ্কম্পভাবে জ্বলিতেছে। আমি উদ্‌গ্রীব প্রতীক্ষায় বসিয়া আছি, এবার কি হইবে?

হঠাৎ প্রশ্ন হইল, "তুমি জঘনচপলার গৃহে যাতায়াত কর?"

অতর্কিত প্রশ্নে ক্ষণকালের জন্য বিমূঢ় হইয়া গেলাম। জঘনচপলা বেশ্যা, তাহার গৃহে যাই কি না সে সংবাদে রাজমন্ত্রীর কি প্রয়োজন? কিন্তু অস্বীকার করিবার উপায় নেই, বুড়ো খোঁজ না লইয়া জিজ্ঞাসা করিবার পাত্র নহে। কুণ্ঠিত স্বরে কহিলাম, "একবার মাত্র গিয়াছিলাম। কিন্তু সে স্থান আমার মতো ক্ষুদ্র ব্যক্তির নয়। তাই আর যাই নাই।"

মন্ত্রী বলিলেন, "ভালো করিয়াছ। সে লিচ্ছবির গুপ্তচর।"

আবার কিছুক্ষণ সমস্ত নিস্তব্ধ। মহামাত্য ধ্যানমগ্নের মতো বসিয়া আছেন; আমি আর-একটি প্রশ্নের বজ্রঘাত প্রতীক্ষা করিতেছি।

"তোমার অধীনে কত কর্মিক আছে?"

"সর্বশুদ্ধ প্রায় দশ সহস্র।"

"স্থপতি কত?"

"ছয় হাজার।"

"সূত্রধর?"

"তিন হাজারের কিছু উপর।"

"তক্ষক ও ভাস্কর?"

"তক্ষক-ভাস্করের সংখ্যা কম—পাঁচশতের অধিক নহে।"

দেখিতে দেখিতে মহামন্ত্রীর নির্জীব শুষ্ক দেহ যেন মন্ত্রবলে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল। নিষ্প্রভ চক্ষুতে যৌবনের জ্যোতি সঞ্চারিত হইল; তিনি আমার দিকে তর্জনী তুলিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন, "শুন, এখন বর্ষাকাল। শরৎকাল আসিলে পথঘাট শুকাইলে আবার যুদ্ধ আরম্ভ হইবে। দুই দিক হইতে শত্রুর আক্রমণে দেশ বিধ্বস্ত হইয়া উঠিয়াছে। অতএব এবার যুদ্ধ আরম্ভের পূর্বে ভাগীরথী ও হিরণ্যবাহুর সঙ্গমে এক উদক দুর্গ নির্মাণ করিতে হইবে। এমন দুর্গ নির্মাণ করিতে হইবে—যাহাতে পঞ্চাশ হাজার যোদ্ধা নিত্য বাস করিতে পারে। মধ্যে মাত্র তিন মাস সময়। এই তিন মাসের মধ্যে দুর্গ সম্পূর্ণ হওয়া চাই। এবার শরৎকালে কৌশল ও বৃজি যখন নদী পার হইতে আসিবে, তখন সম্মুখে যেন মগধের

গগনলেহী দুর্গচূড়া দেখিতে পায়।"

জলের মৎস্য ধীবরের জাল হইতে জলে ফিরিয়া আসিলে যেরূপ আনন্দিত হয়, আমারও সেইরূপ আনন্দ হইল। এই সকল কথা আমি বুঝি। বলিলাম, "দশ হাজার লোক দিয়া তিন মাসের মধ্যে এরূপ দুর্গ তৈয়ার করিয়া দিতে পারি। কিন্তু এই বর্ষাকালে পথ অতিশয় দুর্গম ; মালমশলা সংগ্রহ হইবে না।"

মন্ত্রী বলিলেন, "সে ভার তোমার নয়। তুমি শুধু দুর্গ তৈয়ার করিয়া দিবে। উপাদান সংগ্রহ আমি করিব। রাজ্যের সমস্ত রণহস্তী পাষাণাদি বহন করিয়া দিবে। সে জন্য তোমার চিন্তা নাই।"

আমি বলিলাম, "তবে তিন মাসের মধ্যে দুর্গ তৈয়ার করিয়া দিব।"

মন্ত্রী বলিলেন, "যদি না পার ?"

"আমার মুণ্ড শর্ত রহিল। কবে কার্য আরম্ভ করিব ?"

মন্ত্রী ঈষৎ চিন্তা করিয়া বলিলেন, "এখনও রবি স্থির রাশিতে আছেন। আজ চতুর্থ দিবসে গুরুবাসরে চন্দ্রও স্বাতীনক্ষত্রে গমন করিবেন। অতএব সেইদিনই কার্যের পত্তন হওয়া চাই।"

"যথা আজ্ঞা, তাহাই হইবে।"

কিছুক্ষণ স্থির থাকিয়া মহামাত্য বলিতে লাগিলেন, "এখন যাহা বলিতেছি, মনোযোগ দিয়া শুন। তোমার উপর অত্যন্ত গূঢ় কার্যের ভার অর্পিত হইতেছে! সর্বদা স্মরণ রাখিও যে শত্রুরাজ্যে দুর্গ নির্মাণের সংবাদ পৌঁছিলে তাহারা কিছুতেই দুর্গ নির্মাণ করিতে দিবে না, পদে পদে বাধা দিবে। চারিদিকে গুপ্তচর ঘুরিতেছে, তাহারা যদি একবার মগধের উদ্দেশ্য জানিতে পারে, সপ্তাহকাল মধ্যে কোশলের মহারাজ ও লিচ্ছবির কুলপতিগণ এ সংবাদ বিদিত হইবে। সুতরাং নিরতিশয় সতর্কতার প্রয়োজন। তুমি তোমার দশ সহস্র কর্মিক লইয়া গঙ্গা-শোণ সংগমে যাত্রা করিবে। এমনভাবে যাত্রা করিবে—যাহাতে কাহারও সন্দেহ উদ্রিক্ত না হয়। একবার যথাস্থানে পৌঁছিতে পারিলে আর কোনও ভয় নাই। কারণ, সে স্থান জঙ্গলপূর্ণ, প্রায় জনহীন। কিন্তু তাৎপূর্বে পথে যদি কোনও ব্যক্তিকে গুপ্তচর বলিয়া সন্দেহ হয়, তবে তৎক্ষণাৎ তাহাকে হত্যা করিতে দ্বিধা করিবে না। কার্যস্থলে উপস্থিত হইয়া মগধের মুদ্রাঙ্কিত পত্রের প্রতীক্ষা করিবে। সেই পত্রে দুর্গ নির্মাণের নির্দেশ ও চিত্র লিপিবন্ধ থাকিবে। যথা সময়ে চিত্রানুরূপ দুর্গের শুভারম্ভ করিবে। স্মরণ রাখিও তুমি এ কার্যের নিয়ামক, কোন বিঘ্ন ঘটিলে দায়িত্ব সম্পূর্ণ তোমার।।"

আমি বলিলাম, "যথা আজ্ঞা। কিন্তু এই দশ সহস্র লোকের আহার্য কোথায় পাইব ?"

মন্ত্রী বলিলেন, "গঙ্গা-শোণ-সংগমের নিকট পাটলি নামে এক ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। এক সন্ধ্যার জন্য সেই গ্রামে আতিথ্য স্বীকার করিবে। দ্বিতীয় দিনে আমি তোমাদের উপযুক্ত আহার্য পাঠাইব।"

তারপর উষাকালে সমাগত দেখিয়া মহামাত্য আমাকে বিদায় দিলেন। বিদায়-কালে বলিলেন, "শুনিয়া থাকিবে, সম্প্রতি বৌদ্ধ নামে এক নাস্তিক সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছে। এই বৌদ্ধগণ অতি চতুর ও ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের বিরোধী। শাক্যবংশের এক রাজ্যভ্রষ্ট যুবরাজ ইহাদের নায়ক। এই যুবরাজ অতিশয় ধূর্ত, কপটী ও পরস্ব-

শত্রু। মায়াজাল বিস্তার করিয়া গতাসু মগধেশ্বর বিম্বিসারকে বশীভূত করিয়া মগধে স্বীয় প্রভাব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়াছিল। অধুনা অজাতশত্রু কর্তৃক মগধ হইতে বিতাড়িত হইয়াছে। এই বৌদ্ধদিগকে কদাচ বিশ্বাস করিবে না, ইহারা মগধের ঘোর শত্রু। দুর্গসান্নিধানে যদি ইহাদের দেখিতে পাও, নির্দয়ভাবে হত্যা করিও।"

* * * *

তাই ভাবি কালের কি কুটিল গতি! আড়াই হাজার বৎসর পরে আজ পাটলিপুত্র রচয়িতা মগধের পরাক্রান্ত মহামন্ত্রী বর্ষাকারের নাম কেহ শুনিয়াছে কি? কিন্তু শাক্যবংশের সেই রাজ্যভ্রষ্ট যুবরাজ? আজ অর্ধেক এশিয়া তাঁহার নাম করিতেছে। সসাগরা পৃথিবীকে যাহারা বারবনিতার ন্যায় উপভোগ করিয়াছিল, তাহাদের নাম সেই ভুক্তা ধরিত্রীর ধূলিকণার সহিত মিশাইয়া গিয়াছে; আর যে নিঃসম্বল রাজভিখারীর একমাত্র সম্পদ ছিল নির্বাণ, সেই শাক্যসিংহের নাম অনির্বাণ শিখার ন্যায় তমসান্ধ মানবকে জ্যোতির পথ নির্দেশ করিতেছে।

বর্ষাকালে স্থপতি-সূত্রধর-সম্প্রদায় প্রায়শঃ বসিয়া থাকে। তাই আমার শ্রেণীভুক্ত শ্রমিকদিগকে সংগ্রহ করিতে বড় বিলম্ব হইল না। যথাসময় আমার দশ হাজার শিল্পী নগরের ভিন্ন ভিন্ন তোরণ দিয়া বাহির হইয়া গেল। কোনও পথে দুই শত, কোন পথে চারি শত বাহির হইল—যাহাতে নাগরিক সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ না করে। বেলা প্রায় তিন প্রহরকালে নগরের উত্তরে তিন ক্রোশ দূরে সকলে সমবেত হইল।

এখান হইতে গঙ্গা-শোণ-সংগম প্রায় পঞ্চদশ ক্রোশ, ন্যূনাধিক একদিনের পথ। পরামর্শের পর স্থির হইল যে সন্ধ্যা পর্যন্ত যতদূর সম্ভব যাইব, তারপর পথিপার্শ্বে রাত্রি কাটাইয়া পরাহে অতিপ্রত্যূষে আবার গন্তব্যস্থানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিব। তাহা হইলে মধ্যাহ্নের পূর্বে পাটলিগ্রামে পৌঁছিতে পারা যাইবে।

তখন সকলে যুদ্ধগামী পদাতিক সৈন্যের মতো শ্রেণীবদ্ধভাবে চলিতে আরম্ভ করিল। আকাশে প্রবল মেঘাড়ম্বর, শীতল বায়ু খরভাবে বহিতেছে; রাত্রিতে নিশ্চয় বৃষ্টি হইবে। কিন্তু সেজন্য কাহারও উদ্বেগ নাই। আসন্ন কর্মের উল্লাসে সকলে মহানন্দে গান গাহিতে গাহিতে চলিল।

মগধরাজ্যের স্থানীয় বলিয়া তখন রাজগৃহ হইতে উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম চতুর্দিকে বিভিন্ন রাজ্যে যাইবার পথ ছিল। তদ্ভিন্ন নগর হইতে নগরান্তরে যাইবার পথও ছিল। রাজকোষ হইতে পথের জন্য প্রভূত অর্থ ব্যয় করা হইত। আবশ্যক হিসাবে পথের উপর প্রস্তরখণ্ড বিছাইয়া পথ পাকা করা হইত, পথিকের সুবিধার জন্য পথের ধারে কূপ খনন করানো হইত, ছায়া করিবার জন্য দুই ধারে বট, অশ্বত্থ, শাল্মলী বৃক্ষ রোপিত হইত। মধ্যে নদী পড়িলে সেতু বা খেয়া বন্দোবস্ত থাকিত।

এই সকল পথে দলবদ্ধ বৈদেশিক বণিকগণ অশ্ব গর্দভ ও উষ্ট্রপৃষ্ঠে মহার্ঘ্য পণ্যভার বহন করিয়া নগরে নগরে ক্রয়-বিক্রয় করিয়া বেড়াইত; নট কুশীলব সম্প্রদায় আপন আপন কলানৈপুণ্য দেখাইয়া ফিরিত। রাজদূত দ্রুতগামী অশ্বে চড়িয়া গোপন বার্তা বহন করিয়া রাজসমীপে উপস্থিত হইত। কদাচ রাত্রিকালে এই সকল পথে দস্যু-তস্করের ভয়ও শুনা যাইত। বন্য আটবিক জাতিরা এইরূপ উৎপাত করিত। কিন্তু তাহা কচিৎ, কালেভদ্রে। পথের পাশে সৈনিকের গুল্ম থাকায় তস্করগণ অধিক অত্যাচার করিতে সাহসী হইত না। রাজপথ যথাসম্ভব নিরাপদ ছিল।

উত্তরে ভাগীরথীর তীর পর্যন্ত মগধের সীমা—সেই পর্যন্ত পথ গিয়াছে। আমরা সেই পথ ধরিয়া চলিলাম। ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া আসিল, বায়ু স্তব্ধ এবং আকাশে মেঘপুঞ্জ বর্ষণোন্মুখ হইয়া রহিল। আমরা রাত্রির মতো পথসন্নিকটে এক বিস্তীর্ণ প্রান্তরে আশ্রয় লইলাম।

প্রত্যেকের সহিত এক সন্ধ্যার আহার্য ছিল। কিন্তু বর্ষাকালে উন্মুক্ত প্রান্তরে রন্ধনের সুবিধা নাই। কষ্টে যদি বা অগ্নি জ্বালা যায়, বৃষ্টি পড়িলেই নিবিয়া যাইবার সম্ভাবনা। তথাপি অনেকে একটা মৃত বৃক্ষ হইতে কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া যব-গোধূমচূর্ণ ও শক্ত শানিয়া পিষ্টক-পুরোডাশ্ তৈয়ার করিতে লাগিল। আবার যাহারা অতটা পরিশ্রম স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক, তাহারা চিপিটক জলে সিক্ত করিয়া দধি-শর্করা সহযোগে ভোজনের আয়োজন করিতে লাগিল।

চারিদিক হইতে দশ হাজার লোকের কলরব, গুঞ্জন, গান চীৎকার, গালিগালাজ আসিতেছে। দূরে দূরে ধুনীর ন্যায় অগ্নি জ্বলিতেছে। অন্ধকারে তাহারই আশেপাশে মানুষের ছায়ামূর্তি ঘুরিতেছে। ক্বচিৎ অগ্নিতে তৈল বা ঘৃত প্রদানের ফলে অগ্নি অত্যুজ্জ্বল শিখা তুলিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছে। সেই আলোকে চতুষ্পার্শ্বে উপবিষ্ট মানুষের মুখ ক্ষণকালের জন্য স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। এ যেন সহসা বিজন প্রান্তর মধ্যে এক ভৌতিক উৎসব আরম্ভ হইয়া গিয়াছে।

আমার সহিত কদলী, কপিত্থ, রসাল ইত্যাদি ফল, কিঞ্চিৎ মৃগমাংস এবং এক দ্রোণ লোধ্ররেণু চিত্রকাদির দ্বারা সুরভিত হিঙ্গুল-বর্ণ অতি উৎকৃষ্ট আসব ছিল। আমি তদ্দ্বারা আমার নৈশ আহার সুসম্পন্ন করিলাম।

ক্রমে রাত্রি গভীর হইতে চলিল। এক বৃহৎ বৃক্ষতলে মৃত্তিকার উপর আস্তরণ পাতিয়া আমি শয়নের উপক্রম করিতেছি, এমন সময় অন্ধকারে দুইজন লোক আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। জিজ্ঞাসা করিলাম, "কে?"

একজন উত্তর দিল, "নায়ক, আমি এই ছাউনির রক্ষী। অপরিচিত এক ব্যক্তি কূপের নিকট বসিয়াছিল, তাই আদেশমত ধরিয়া আনিয়াছি।"

আমি বলিলাম, "মশাল জ্বাল।"

মশাল জ্বলিলে দেখিলাম, প্রহরীর সঙ্গে এক দীর্ঘাকৃতি নগ্নপ্রায় অতিশয় শ্মশ্রুগুম্ফজটাবহুল পুরুষ। শুকচঞ্চুর ন্যায় বক্র নাসা, চক্ষু অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি কূপ-সন্নিকটে কি করিতেছিলে?"

সে ব্যক্তি স্থির নেত্রে আমার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, "তুমি রাষ্ট্রপতি হইবে; তোমার ললাটে রাজদণ্ড দেখিতেছি।"

কৈতববাদে ভুলিবার বয়স আমার নাই। উপরন্তু মহামাত্য যে সন্দেহ আমার মনের মধ্যে সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছিলেন, এই অপরিচিত জটিল সন্ন্যাসীকে দেখিবামাত্র তাহা জাগরূক হইয়া উঠিল। বলিলাম, "আপনি দেখিতেছি জ্যোতির্বিদ। আসন পরিগ্রহ করুন।"

আসন গ্রহণ করিয়া জটাধারী কহিলেন, "আমি শৈব সন্ন্যাসী। রুদ্রের কৃপায় আমার তৃতীয় নয়ন উন্মীলিত হইয়াছে। ত্রিকাল আমার নখ দর্পণে প্রকট হয়। আমি দেখিতেছি, তুমি অদূর-ভবিষ্যতে মহালোকপালরূপে রাজদণ্ড ধারণ করিবে। তোমার যশোদীপ্তিতে ভূতপূর্ব রাজন্যগণের কীর্তিপ্রভা ম্লান হইয়া যাইবে।"

সন্ন্যাসীকে বুঝিয়া লইলাম। অত্যন্ত শ্রদ্ধাপ্লুত কণ্ঠে কহিলাম, "আপনি

মহাজ্ঞানী। আমি অতি দুষ্কর কার্যে যাইতেছি ; কার্যে সফল হইব কি না, আজ্ঞা করুন।"

ত্রিকালদর্শী ভ্রূকুটি করিয়া কিছুক্ষণ নিমীলিতনেত্রে রহিলেন, তারপর জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় যাইতেছ ?"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "আপনিই বলুন ?"

সন্ন্যাসী তখন মৃত্তিকার উপর একখণ্ড প্রস্তর দিয়া রাশিচক্র আঁকিলেন। আমি মৃদু হাস্যে প্রশ্ন করিলাম, "এ কি, আপনার নখদর্পণ কোথায় গেল ?"

সন্ন্যাসী আমার প্রতি সন্দেহপ্রখর এক দৃষ্টি হানিয়া কহিলেন, "সূক্ষ্ম গণনা নখদর্পণে হয় না। তুমি জ্যোতিষ শাস্ত্রে অনভিজ্ঞ, এ সকল বুঝিবে না।"

আমি বিনীতভাবে নীরব রহিলাম। সন্ন্যাসী গভীর মনঃসংযোগে রাশিচক্রে আঁক কষিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ অঙ্কপাত করিবার পর মুখ তুলিয়া কহিলেন, "তুমি কোনও গুপ্ত রাজকার্যে পররাজ্যে যাইতেছ। শনি ও মঙ্গল দৃষ্টি-বিনিময় করিতেছে, এজন্য মনে হয় তুমি যুদ্ধ-সংক্রান্ত কোনও গূঢ় কার্যে ব্যাপৃত আছ।" এই বলিয়া সপ্রশ্ননেত্রে আমার প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

আমি চমৎকৃত হইয়া বলিলাম, "আপনি সত্যই ভবিষ্যদ্দর্শী, আপনার অগোচর কিছুই নাই। আমি রাজানুজ্ঞায় লিচ্ছবি দেশে যাইতেছি, কি উদ্দেশ্যে যাইতেছি তাহা অবশ্যই আপনার ন্যায় জ্ঞানীর অবিদিত নাই। এখন কৃপা করিয়া আমার এক সুহৃদের ভাগ্য গণনা করিয়া দিতে হইবে। প্রহরী, কুলিক মিহিরমিত্র জম্বু-বৃক্ষতলে আশ্রয় লইয়াছেন তাঁহাকে ডাক।"

কুলিক মিহিরমিত্র আমার অধীনে প্রধান শিল্পী এবং আমার প্রাণোপম বন্ধু। ভাস্কর্যে তাহার যেরূপ অধিকার, জ্যোতিষশাস্ত্রে সেইরূপ পারদর্শিতা। ভৃগু পরাশর, জৈমিনি তাহার কণ্ঠাগ্রে।

মিহিরমিত্র আসিয়া উপবিষ্ট হইলে আমি সন্ন্যাসীকে নির্দেশ করিয়া কহিলাম, ইনি ''জ্যোতিষশাস্ত্রে মহাপণ্ডিত, তোমার ভাগ্য গণনা করিবেন।''

মিহিরমিত্র সন্ন্যাসীর দিকে ফিরিয়া বসিল। তাঁহার আপাদমস্তক একবার নিরীক্ষণ করিয়া নিজ করতল প্রসারিত করিয়া বলিল, ''কোন্ লগ্নে আমার জন্ম ?''

সন্ন্যাসীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গে ঈষৎ চাঞ্চল্য ও উৎকণ্ঠার লক্ষণ দেখা দিল। সে করতলের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়াই বলিল, "তোমার অকালমৃত্যু ঘটিবে।"

মিহিরমিত্র বলিল, "ঘটুক, কোন্ লগ্নে আমার জন্ম ?"

সন্ন্যাসী ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "বৃষ লগ্নে।"

"বৃষ লগ্নে ?" মিহিরমিত্র হাসিল, "উত্তম। চন্দ্র কোথায় ?"

"তুলা রাশিতে।"

"তুলা রাশিতে ? ভালো। কোন্ নক্ষত্রে ?"

সন্ন্যাসী নীরব। ব্যাকুল-নেত্রে একবার চারিদিকে নিরীক্ষণ করিল, কিন্তু পলায়নের পথ নাই। জ্যোতিষীর নাম শুনিয়া উৎসুক কর্মিকগণ একে একে আসিয়া চারিদিকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে।

মিহিরমিত্র কঠোর কণ্ঠে আবার প্রশ্ন করিল, "চন্দ্র কোন্ নক্ষত্রে ?"

জিহ্বা দ্বারা শুষ্ক ওষ্ঠাধর লেহন করিয়া স্খলিতকণ্ঠে সন্ন্যাসী কহিল, "চন্দ্র মৃগশিরা নক্ষত্রে।"

মিহিরমিত্র আমার দিকে ফিরিয়া অল্প হাস্য করিয়া বলিল, "এ ব্যক্তি শঠ। জ্যোতিষ শাস্ত্রের কিছুই জানে না।"

তখন সন্ন্যাসী দ্রুত উঠিয়া সেই শ্রমিক ব্যূহ ভেদ করিয়া পলায়নের চেষ্টা করিল। সন্ন্যাসী অসাধারণ বলিষ্ঠ—কিন্তু বিশজনের বিরুদ্ধে একা কি করিবে? অল্পকালের মধ্যেই সকলে ধরিয়া তাহাকে ভূমিতে নিপাতিত করিল। রজ্জু দ্বারা তাহার হস্তপদ বাঁধিয়া ফেলিবার পর সন্ন্যাসী বলিল, "মহাশয়, আমাকে বৃথা বন্ধন করিতেছেন। আমি দীন ভিক্ষুক মাত্র, জ্যোতিষীর ভাণ করিয়া কিছু বেশি উপার্জনের চেষ্টা করিয়াছিলাম; কিন্তু আপনারা জ্ঞানী—আমার কপটতা ধরিয়া ফেলিয়াছেন। এখন দয়া করিয়া আমাকে ছাড়িয়া দিন, আমার যথেষ্ট দণ্ডভোগ হইয়াছে।"

আমি বলিলাম, "ভণ্ড সন্ন্যাসী, তুমি কোশল অথবা বৃজির গুপ্তচর। আমাকে ভুলাইয়া কথা বাহির করিবার চেষ্টা করিতেছিলে।"

সন্ন্যাসী ভয়ে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, "কুমারীর শপথ, জয়ন্তের শপথ, আমি গুপ্তচর নহি। আমি ভিক্ষুক। আমাকে ছাড়িয়া দিন, আমি আর কখনও এমন কাজ করিব না···উঃ, আমি বড় তৃষ্ণার্ত—একটু জল···" এই পর্যন্ত বলিয়া হঠাৎ থামিয়া গেল।

আমি একজন প্রহরীকে আদেশ করিলাম, "কূপ হইতে একপাত্র জল আনিয়া ইহাকে দাও।"

জল আনীত হইলে সন্ন্যাসীর মুখের কাছে জলপাত্র ধরা হইল। কিন্তু সন্ন্যাসী নিশ্চেষ্ট, জলপানের কোনও আগ্রহ নাই।

প্রহরী বলিল, "জল আনিয়াছি—পান কর।"

সন্ন্যাসী নীরব নিস্পন্দভাবে পড়িয়া রহিল, কথা কহিল না। আমি তখন তাহার নিকটে গিয়া বলিলাম, "তৃষ্ণার্ত বলিতেছিলে, জলপান করিতেছ না কেন?"

সন্ন্যাসী তখন ক্ষীণস্বরে কহিল, "আমি জলপান করিব না।"

সহসা যে প্রহরী জল আনিয়াছিল, সে জলপাত্র ফেলিয়া দিয়া কাতরোক্তি করিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। 'কি হইল, কি হইল'—বলিয়া সকলে তাহাকে ধরিয়া তুলিল। দেখা গেল, এই অল্পকালের মধ্যে তাহার মুখের অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটিয়াছে। মুখ তাম্রবর্ণ ধারণ করিয়াছে, চক্ষু অস্বাভাবিক উজ্জ্বল, সর্বাঙ্গ থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। ক্রমে সৃক্কনী বহিয়া ফেন নির্গত হইতে লাগিল। বাক্য একেবারে রোধ হইয়া গিয়াছে। 'কি হইয়াছে?' 'কেন এরূপ করিতেছে?'—এই প্রকার বহু প্রশ্নের উত্তরে সে কেবল ভূপতিত জলপাত্রটি অঙ্গুলি সংকেতে দেখাইতে লাগিল।

তারপর অর্ধদণ্ডের মধ্যে দারুণ যন্ত্রণায় হস্তপদ উৎক্ষিপ্ত করিতে করিতে উৎকট মুখভঙ্গী করিয়া প্রহরী ইহলোক ত্যাগ করিল। তাহার বিষ-বিধ্বস্ত দেহ মৃত্যুর করস্পর্শে শান্ত হইলে পর, সমবেত সকলের দৃষ্টি সেই ভণ্ড সন্ন্যাসীর উপর গিয়া পড়িল। ক্রোধান্ধ জনতার সেই জিঘাংসানিষ্ঠুর দৃষ্টির অগ্নিতে সন্ন্যাসী পুড়িয়া কুঁকড়াইয়া গেল।

আর এক মুহূর্ত বিলম্ব হইলে বোধ করি সেই ক্ষিপ্ত কর্মিদল সন্ন্যাসী দেহ শতখণ্ডে ছিঁড়িয়া ফেলিত, কিন্তু সেই মুহূর্তে শ্রমিকব্যূহ ঠেলিয়া কার্মিক-জ্যেষ্ঠ বিশালকায় দিঙনাথ সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। ভূশায়িত সন্ন্যাসীর জটা ধরিয়া

টানিয়া দাঁড় করাইয়া সকলের দিকে ফিরিয়া প্রুষকণ্ঠে কহিল, "ভাই সব, এই ভণ্ড তপস্বী শত্রুর চর। আমাদের প্রাণনাশের জন্য কূপের জল বিষমিশ্রিত করিয়াছে। ইহার একমাত্র উচিত শাস্তি,...মৃত্যু ; অতএব সে শাস্তি আমরা ইহাকে দিব। কিন্তু এখন নয়। তোমরা সকলেই জান, যে কার্যে আমরা যাইতেছি, তাহাতে নরবলির প্রয়োজন। ভৈরবের তুষ্টি সাধন না করিলে আমাদের কার্য সুসম্পন্ন হইবে না। সুতরাং এখন কেহ ইহার অঙ্গে হস্তক্ষেপ করিও না। যথাসময় গঙ্গার উপকূলে আমরা ইহাকে জীবন্ত সমাধি দিব। এই পাপাত্মার প্রেতমূর্তি অনন্তকাল ধরিয়া আমাদের দুর্গ পাহারা দিবে।"

দিঙ্‌নাগের কথায় সকলে ক্ষান্ত হইল। তারপর মৃত প্রহরীর দেহ সকলে মিলিয়া কূপ-সন্নিকটে এক বৃক্ষতলে সমাধিস্থ করিল এবং সন্ন্যাসীকে সেই বৃক্ষশাখায় হস্তপদ বাঁধিয়া ভাণ্ডবৎ ঝুলাইয়া রাখিল।

পরদিন প্রত্যুষে যাত্রা করিয়া আমরা প্রায় বেলা তৃতীয় প্রহরে পাটলিগ্রামে উপস্থিত হইলাম। গঙ্গার উপকূলে জঙ্গলে পরিবৃত অতি ক্ষুদ্র একটি জনপদ—সর্বসাকুল্যে বোধকরি পঞ্চাশটি দরিদ্র পরিবারের বাস। গ্রামবাসীরা অধিকাংশই নিষাদ কিংবা জালিক—বনে পশু শিকার করিয়া এবং নদীতে মৎস্য ধরিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করে। মাঝে মাঝে বৃহৎ অরণ্যের মধ্যে বৃক্ষাদি কাটিয়া, ক্ষেত্র সমতল করিয়া, যব গোধূম চনক ইত্যাদিও উৎপন্ন করে। আমরা সদলবলে উপস্থিত হইলে গ্রামিকেরা আমাদের আততায়ী মনে করিয়া গ্রাম ছাড়িয়া অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করিল। আমরা অনেক আশ্বাস দিলাম, কিন্তু কেহ শুনিল না, কিরাতভীত মধ্যযূথের মতো গভীর বনমধ্যে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

তখন আমরা অনাহূত যেখানে যাহা পাইলাম, তাহাই গ্রহণ করিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিলাম। গ্রামের সংবৎসরের সঞ্চিত খাদ্য এক সন্ধ্যায় আহারে প্রায় নিঃশেষ হইয়া গেল।

সেদিন আর কোনও কাজ হইল না। শ্রান্ত কর্মিদল যে যেখানে পারিল ঘুমাইয়া রাত্রি কাটাইয়া দিল।

পরদিন প্রভাতে কাজের হুড়াহুড়ি পড়িয়া গেল। রণহস্তীর পৃষ্ঠে স্তূপীকৃত খাদ্য বস্ত্রাবাস প্রভৃতি যাবতীয় আবশ্যক বস্তু আসিয়া পৌঁছিতে লাগিল। ছাউনি ফেলিতে, প্রস্তরাদি যথাস্থানে সন্নিবেসিত করিতে সমস্ত দিন কাহারও নিঃশ্বাস ফেলিবার অবকাশ রহিল না।

দূতহস্তে মহামন্ত্রী দুর্গের নক্সা পাঠাইয়াছেন, তাহা লইয়া মিহিরমিত্র ও দিঙ্‌নাগকে সঙ্গে করিয়া আমি দুর্গের স্থান-নির্ণয়ের জন্য নদীসংগমে গেলাম। বর্ষায় কূলপ্লাবী দুই মহানদী স্ফীত তরঙ্গায়িত হইয়া ঘোররবে ছুটিয়াছে। গঙ্গা ধূসর, শোণ স্বর্ণাভ। দুই স্রোত যেখানে মিলিত হইয়াছে, সেখানে আবর্তিত জলরাশি ফেনপুঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে।

এই সংগমের দক্ষিণ উপকূলে দাঁড়াইয়া আমরা দেখিলাম যে শোণ এবং সংযুক্ত প্রবাহের সন্ধিস্থলে এক বিশাল ত্রিভুজের সৃষ্টি হইয়াছে—মনে হয় যেন, দুই নদী বাহু বিস্তার করিয়া দক্ষিণের তটভূমিকে আলিঙ্গন করিবার প্রয়াস করিতেছে। বহু পর্য্যবেক্ষণ ও বিচারের পর স্থির করিলাম যে, এই ত্রিভুজের মধ্যেই দুর্গ নির্মাণ করিতে হইবে। কারণ তাহা হইলে দুর্গের দুই দিক নদীর দ্বারা বেষ্টিত থাকিবে,

পরিখা-খননের প্রয়োজন হইবে না।

তারপর সেই স্থানের জঙ্গল পরিষ্কৃত করিবার জন্য লোক লাগিয়া গেল। বড় বড় পুরাতন বৃক্ষ কাটিয়া ভূমি সমতল করা হইতে লাগিল। হস্তী সকল ভূপতিত বৃক্ষকাণ্ড টানিয়া বাহিরে লইয়া ফেলিতে লাগিল। বৃক্ষপতনের মড়মড় শব্দে, মানুষের কোলাহলে হস্তী ও অশ্বের নিনাদে দিক্‌প্রান্ত প্রকম্পিত হইয়া উঠিল! যেন বহুযুগব্যাপী নিদ্রার পর অরণ্যানী কোন দৈত্যের বিজয়নাদে চমকিয়া উঠিল।

সমস্ত দিন এইরূপ পরিশ্রমের পর রাত্রিতে আহারাদি শেষ করিয়া বিশ্রামের উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময় দিঙ্‌নাগ আসিয়া উপস্থিত হইল। বলিল, "নায়ক রাত্রি দ্বিপ্রহর সমাগত; আজ দুর্গারম্ভের পূর্বে দৈবকার্য করিতে হইবে।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কিরূপ দৈবকার্য ?"

দিঙ্‌নাগ বলিল, "ইহারই মধ্যে ভুলিয়া গেলেন? সেই ভণ্ড তপস্বী—আজ তাহাকে জীবন্ত পুঁতিয়া ফেলিতে হইবে।

তখন সকল কথা স্মরণ হইল। বলিলাম, "ঠিক কথা, তাহাকে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। তা বেশ, তাহাকে যখন বধ করিতেই হইবে, তখন এক কার্যে দুই ফল হউক। শত্রুনিপাত ও দেবতুষ্টি একসঙ্গেই হইবে। কিন্তু এই সকল দৈবকার্যের কি কি অনুষ্ঠান তাহা কি তোমাদের জানা আছে ?"

দিঙ্‌নাগ বলিল, "অনুষ্ঠান কিছুই নহে। বলিকে সুরাপান করাইয়া যখন সে অচৈতন্য হইয়া পড়িবে, তখন তাহার কানে কানে বলিতে হইবে, 'তুমি চিরদিন প্রেতদেহে এই দুর্গ রক্ষা করিতে থাক।'—এই বলিয়া তাহাকে জীবন্ত অবস্থায় পুঁতিয়া ফেলিতে হইবে।"

আমি ঈষৎ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি এত বিধি-ব্যবস্থা জানিলে কোথা হইতে?"

দিঙ্‌নাগ হাসিয়া বলিল, "এ কার্য আমি পূর্বে করিয়াছি। ধনশ্রী শ্রেষ্ঠী যখন গুপ্ত রত্নাগার মাটির নিচে তৈয়ার করে, তখন আমিই কুলিক ছিলাম। সেই সময় অরণ্য হইতে এক শবর ধরিয়া আনিয়া শ্রেষ্ঠী এই নরবলি সম্পন্ন করে। আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম।"

আমি বলিলাম, "তবে এ কার্য তুমিই কর।"

দিঙ্‌নাগ বলিল, "করিব। কিন্তু নায়ক, কার্যকালে আপনাকেও উপস্থিত থাকিতে হইবে। ইহাই বিধি।"

"বেশ, থাকিব।"

দিঙ্‌নাগ চলিয়া যাইবার পর নানা চিন্তায় মগ্ন হইয়া বসিয়া আছি, এমন সময় সে ছুটিতে ছুটিতে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "নায়ক, সর্বনাশ! সন্ন্যাসী আমাদের ফাঁকি দিয়াছে।"

"ফাঁকি দিয়াছে?"

"বিষপান করিয়াছে। তাহার কবচের মধ্যে বিষ লুকানো ছিল, জীবন্ত সমাধির ভয়ে তাহাই খাইয়া মরিয়াছে। এখন উপায় ?"

"কিসের উপায় ?"

"মানস করিয়াছি, বলি না দিলে যে সর্বনাশ হইবে! রুদ্র কুপিত হইবেন।" দিঙ্‌নাগ মাটিতে বসিয়া পড়িল।

চিন্তার কথা বটে। নির্বোধ সন্ন্যাসীটা আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিতে পারিল না। পাছে আমাদের একটু উপকার হয় তাই তাড়াতাড়ি বিষপান করিয়া বসিল। এদিকে আমন্ত্রিত দেবতা প্রতীক্ষা করিয়া আছেন। অন্য বলি কোথায় পাওয়া যায়?

বিশেষ ভাবিত হইয়া পড়িয়াছি, এরূপ সময় শিবিরের প্রহরী আসিয়া সংবাদ দিল, "কতকগুলা মুণ্ডিত-মস্তক ভিখারী ছাউনিতে আশ্রয় খুঁজিতেছিল, ধরিয়া রাখিয়াছি ' আজ্ঞা হয় তো লইয়া আসি।"

দিঙ্‌নাগ লাফাইয়া উঠিয়া মহানন্দে চীৎকার করিয়া কহিল, "জয় রুদ্রেশ্বর, জয় ভৈরব!...নায়ক, দেবতা স্বয়ং বলি পাঠাইয়াছেন!"

এত সহজে যে বলি সমস্যার মীমাংসা হইয়া যাইবে তাহা ভাবি নাই। ভিখারী অপেক্ষা উত্তম বলি আর কোথায় পাওয়া যাইবে? দিঙনাগ ঠিকই বলিয়াছে, দেবতা স্বয়ং বলি পাঠাইয়াছেন।

* * * *

সর্বশুদ্ধ পাঁচটি ভিখারী—পরিধানে কৌপীন, সংঘাটি ও উত্তরীয়, হস্তে ভিক্ষা-পাত্র,—আমার সম্মুখে আনীত হইল। ভিক্ষুকগণ সকলেই বয়স্থ—কেবল একটি বৃদ্ধ—বয়স বোধ করি সত্তর অতিক্রম করিয়াছে।

বৃদ্ধ স্মিত হাস্যে বলিলেন, "মঙ্গল হউক!"

এই বৃদ্ধের মুখের দিকে চাহিয়া সহসা আমার সমস্ত অন্তরাত্মা যেন তড়িৎ স্পৃষ্ঠ হইয়া জাগিয়া উঠিল। আমি কে, কোথায় আছি, এক মুহূর্তে সমস্ত ভুলিয়া গেলাম। কেবল বুকের মধ্যে এক অদম্য বাষ্পোচ্ছ্বাস আলোড়িত হইয়া উঠিল। কে ইনি? এত সুন্দর, এত মধুর, এত করুণাসিক্ত মুখকান্তি তো মানুষের কখনও দেখি নাই। দেবতার মুখে যে জ্যোতির্মণ্ডল কল্পনা করিয়াছি, আজ এই বৃদ্ধের মুখে তাহা প্রথম প্রত্যক্ষ করিলাম। এই জ্যোতির স্ফুরণ বাহিরে অতি অল্প, কিন্তু চক্ষুর মধ্যে দৃষ্টিপাত করিলেই মনে হয়, ভিতরে অমিতদ্যুতি-স্থির-সৌদামিনী জ্বলিতেছে। কিন্তু সে সৌদামিনীতে জ্বালা নাই, তাহা অতি স্নিগ্ধ, অতি শীতল, যেন হিম-নির্ঝরিণীর শীকর-নিষিক্ত!

সে মূর্তির দিকে তাকাইয়া তাকাইয়া আমার প্রাণের মধ্যে একটি শব্দ কেবল রণিত হইতে লাগিল,—'অমিতাভ! অমিতাভ!'

আমি বাগ্‌রহিত হইয়া বসিয়া আছি দেখিয়া তিনি আবার হাসিলেন। অপূর্ব প্রভায় সে মুখ আবার সমুদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। বলিলেন, "বৎস, আমরা যাযাবর ভিক্ষু, কুশীনগর যাইবার অভিপ্রায় করিয়াছি। অদ্য রাত্রির জন্য তোমার আশ্রয় ভিক্ষা করি।"

অবরুদ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কে?"

তাঁহার একজন সহচর উত্তর করিলেন, "শাক্যসিংহ গৌতমের নাম কখনও শুন নাই?"

শাক্যসিংহ? ইনিই তবে সেই শাক্যবংশের রাজ্যভ্রষ্ট যুবরাজ। মহামন্ত্রী বর্ষকারের কথা মনে পড়িল। ইঁহার উদ্দেশ্যে তিনি বলিয়াছেন,—ধূর্ত, কপটী, পরস্বলুব্ধ। মরি মরি, কে ধূর্ত কপটী? মনে হইল, মানুষ তো অনেক দেখিয়াছি, কিন্তু আজ এই প্রথম মানুষ দেখিলাম। হায় মহামন্ত্রী বর্ষকার, তুমি এই পুরুষ-সিংহকে দেখ নাই, কিংবা দেখিয়াও আত্মাভিমানে অন্ধ ছিলে। নহিলে এমন কথা

মুখে উচ্চারণ করিতে পারিতে না।

বুকের মধ্যে প্রবল রোদনের উচ্ছ্বাস সমস্ত দেহকে কম্পিত করিতে লাগিল। আমার অতিবাহিত জীবনের অপরিমেয় শূন্যতা, অশেষ দৈন্য, যেন এককালে মূর্তি ধরিয়া আমার সম্মুখে দেখা দিল। কি পাইয়া এতদিন ভুলিয়া ছিলাম।

আমি উঠিয়া তাঁহার পদপ্রান্তে পতিত হইয়া বলিলাম, "অমিতাভ, আমি অন্ধ, আমাকে চক্ষু দাও, আমাকে আলোকের পথ দেখাইয়া দাও।"

অমিতাভ আমাকে ধরিয়া তুলিলেন। মস্তকে করার্পণ করিয়া বলিলেন, "পুত্র, আশীর্বাদ করিতেছি, তোমার অন্তরের দিব্যচক্ষু উন্মীলিত হইবে, আপনিই আলোকের পথ দেখিতে পাইবে।"

আমি আবার তাঁহার চরণ ধারণ করিয়া বলিলাম, "না শ্রীমন্, আমার হৃদয় অন্ধকার। আজ প্রথম তোমার মুখে দিব্যজ্যোতি দেখিয়াছি। ঐ জ্যোতির কণামাত্র আমাকে দান কর।"

একজন ভিক্ষু বলিলেন, "শাস্তা, আপনি ইহাকে ত্রিশরণ দান করুন।"

শাক্যসিংহ কহিলেন, "আনন্দ, তাহাই হউক।" আমার মস্তকে হস্ত রাখিয়া বলিলেন, "পুত্র, তুমি ত্রিশরণ গ্রহণ করিয়া গৃহস্থের অষ্টশীল পালন কর। আশীর্বাদ করি, যেন বাসনামুক্ত হইতে পার।"

তখন বুদ্ধের চরণতলে বসিয়া তদ্গতকণ্ঠে তিনবার ত্রিশরণ মন্ত্র উচ্চারণ করিলাম।

অদূরে দাঁড়াইয়া দিঙ্নাগ—দুর্ধর্ষ, নিষ্করুণ, অসুরপ্রকৃতি দিঙ্নাগ—গলদশ্রু হইয়া কাঁদিতে লাগিল। তাহার বিকৃত কণ্ঠ হইতে কি কথা বাহির হইতে লাগিল বুঝা গেল না।

এ যেন কয়েক পলের মধ্যে এক মহা ভূমিকম্পে আমাদের অতীত জীবন ধূলিসাৎ হইয়া গেল। কীট ছিলাম, এক মুহূর্তে মানুষ হইয়া গেলাম।

পরদিন উষাকালে তথাগত কুশীনগর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। হিরণ্য বাহুর সুবর্ণ-সৈকতে দাঁড়াইয়া আমার হস্তধারণ করিয়া তিনি কহিলেন, "পুত্র, আমি চলিলাম। হিংসায় হিংসার ক্ষয় হয় না, বৃদ্ধি হয় স্মরণ রাখিও।"

বাষ্পাকুল-স্বরে কহিলাম, "শাস্তা, আবার কতদিনে সাক্ষাৎ পাইব?"

সেই হিমবিদ্যুতের ন্যায় হাসি তাঁহার ওষ্ঠাধরে খেলিয়া গেল, বলিলেন, "আমি কুশীনগর যাইতেছি, আর ফিরিব না।"

তারপর বহুক্ষণ স্থিরদৃষ্টিতে গঙ্গা-শোণ-সংগমে দুর্গভূমির প্রতি তাকাইয়া রহিলেন। শেষে স্বপ্নাবিষ্ট কণ্ঠে কহিলেন, আমি দেখিতেছি তোমার এই কীর্তি বহু-সহস্রবর্ষ স্থায়ী হইবে। এই ক্ষুদ্র পাটলিগ্রাম ও তোমার নির্মিত এই দুর্গ এক মহীয়সী নগরীতে পরিণত হইবে। বাণিজ্যে, ঐশ্বর্যে, শিল্পে, কারুকলায়, জ্ঞানে বিজ্ঞানে পৃথিবীতে অদ্বিতীয় স্থান অধিকার করিবে। সদ্ধর্ম এইস্থানে দৃঢ়প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে। তোমার কীর্তি অবিনশ্বর হউক।"

এই বলিয়া, পুনর্বার আশীর্বাদ করিয়া, দিব্যদর্শী পরিনির্বাণের পথে যাত্রা করিলেন।
